বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে মৃত্যুচিন্তার ইতিহাসঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৭৭২-১৯২০)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার ইতিহাস বিভাগে

পিএইচ. ডি. উপাধি লাভের জন্য উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

অনির্বাণ দাস

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ JU/PHD/History/A00HI1101016

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৩

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে মৃত্যুচিন্তার ইতিহাসঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৭৭২-১৯২০)

BANGLAR SOMAJ O SONSKRITITE MRITYUCHINTAR ITIHAS: EKTI OITIHASIK PORJALOCHONA (1772-1920)

A THESIS SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF HISTORY OF JADAVPUR UNIVERSITY FOR THE 'DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY' (IN ARTS)

By
Anirban Das
Department of History
Jadavpur University
Registration No: AOOHI1101016

Under the Supervision of
Prof. Mahua Sarkar
Department of History, Jadavpur University
Kolkata 700032

Department of History
Jadavpur University
Kolkata—700032

2023

Certificate

Certified that the Thesis entitled "**বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে মৃত্যুচিন্তার ইতিহাসঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৭৭২-১৯২০)**" [BANGLAR SOMAJ O SONSKRITITE MRITYUCHINTAR ITIHAS: EKTI OITIHASIK PORJALOCHONA (1772-1920)] submitted by me for the Award of 'Doctor of Philosophy in Arts' at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Professor Mahua Sarkar, Department of History, Jadavpur University; And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree/diploma anywhere/elsewhere .

Countersigned by the Supervisor

Candidate

(**Dr. Mahua Sarkar**)
Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata 700032

(**Anirban Das**)
PhD Scholar
Department of History
Jadavpur University
Kolkata 700032

Dated

অধ্যায় সূচি

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	১ - ৫
প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা	৬ - ৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মৃত্যু সম্পর্কে দেশজ ভাবনা	৩৬ - ৮৬
তৃতীয় অধ্যায়ঃ মহামারী ও মৃত্যু - একটি পর্যালোচনা	৮৭ - ১৩৯
চতুর্থ অধ্যায়ঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় মৃত্যুর সামাজিক ইতিহাস	১৪০ - ২০৫
পঞ্চম অধ্যায়ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্মশান	২০৬ – ২৬৪
উপসংহার	২৬৫ - ২৭১
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী	২৭২ - ২৮১

মুখবন্ধ

আমাদের পড়াশোনার গণ্ডিতে 'মৃত্যু' বিষয়ক আলোচনার নীরবতা বিস্ময়কর, অথচ উপনিবেশবাদ ও ঐতিহাসিকতার বৌদ্ধিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রশ্ন ঐতিহাসিকদের মধ্যে সহজেই উঠতে পারত; কীভাবে আমাদের ইতিহাসে মৃত্যুর প্রত্নতাত্ত্বিক ও সামাজিক চেতনার সাক্ষ্য লুকিয়ে আছে; কী প্রক্রিয়ায় নানা সামাজিক অভ্যাস, কথাবার্তা, লেখালিখির মধ্যে মৃত্যু চিন্তার গর্ভে 'জীবনের' প্রদর্শন গড়ে উঠেছে, আবার কীভাবে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিতে 'মৃত্যু' তার নিজস্ব অর্থময় জগৎ তৈরি করে চলেছে? অথবা ধর্ম, ফ্যান্টাসী, রহস্য এইসব শব্দগুলি 'মৃত্যুর গল্পগুলিকে' কিভাবে 'অর্থময়' (meaningful) করে তোলে ইতিহাসের সামাজিক প্রেক্ষাপটে? মৃত্যু চিন্তার বিশ্লেষণী তত্ত্বে মৃত্যু নিজ মাহাত্ম্যেই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রতিচ্ছেদে তৈরি হয় তার ক্ষেত্র। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমার প্রস্তাবিত গবেষণায় জ্ঞানচর্চার প্রেক্ষিতে যা আলোচনা করেছি ও প্রশ্ন উত্তরের সংলাপের দ্বন্দ্বে যেখানে পৌঁছাতে চেয়েছি তা শুধুমাত্র মৃত্যুর ইতিহাস নয়; বরং প্রশ্ন ওঠে 'মৃত্যু' আমাদের সমাজকে কতটা সামাজিকতা দেয়? এই প্রশ্নটির মাত্রায় 'মৃত্যু' ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশের মৃত্যুচিন্তার সাংস্কৃতিক বর্গটিকে বহুমাত্রিক বয়ানে বিচার করা হয়েছে। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে বুঝতে চেয়েছি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে দার্শনিকতা তা কি ইতিহাসের বিশেষত ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চার পদ্ধতিকে ইতিবাচক বা অন্যরূপে প্রভাবিত করেছিল? মৃত্যু কি?/ মৃত্যুর সংজ্ঞাই বা কি? মৃত্যু পরবর্তী বা মৃত্যুপূর্ব অনুভূতি কেমন হয় – এই সমস্ত প্রশ্নগুলিকে ঘিরেই অনেকগুলি দার্শনিকতার প্রত্যয় মৃত্যুকে বৃহৎ জ্ঞানতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। সেখানে মৃত্যু শুধুমাত্র সাল, তারিখ, তথ্যের ইতিহাসের মধ্যে আটকে থাকে না; বরং সাল, তারিখ, তথ্যের ইতিহাসের কার্যকারণ পদ্ধতিকে প্রশ্ন করে, একইসঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বয়ানকেও আরো স্পষ্ট করে তোলে। আর মৃত্যু কী বা কাকে বলে - এর

ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝতে গেলে 'Meaning' এর সংজ্ঞাটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, তা না হলে মৃত্যু চিন্তার ঐতিহাসিকতা ধর্মীয় কুসংস্কারের যুক্তিহীনতার কাছে গৌণ হয়ে যেতে পারে। তাই 'Meaning' এর বর্গটির উৎস কোথায় এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা আগে প্রয়োজন। মৃত্যু তখনই তাৎপর্য বহন করে যখন তা 'Meaning'এর মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক চিহ্নকে নির্দেশিত করে। সেই নির্দেশনা কী ঐতিহাসিক 'সত্যকে' নতুন কোন মাত্রা দেয়? না কী মাত্রাহীন করে দেয়? ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কী সামাজিকতাকে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে 'ভাল মৃত্যু' বা 'মন্দ মৃত্যু' বলে কোন দার্শনিক নীতি আরোপ করেছিল? যদি তা করে থাকে তাহলে সেটি কি ধরণের নীতি? তা কী আমাদের প্রাক্-উপনিবেশিক সমাজের দার্শনিকতার যুক্তির প্রত্যয়গুলিকে নৈতিকভাবে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে? এ প্রসঙ্গে Ernest Becker (1972) 'The birth and death of meaning.' এবং Norbert Elias (1985), 'Harmonds Worth ও The loneliness of dying' গ্রন্থে মনুষ্য চেতনার বহুস্তরে কি ধরণের চেতনা মৃত্যু চেতনাকে প্রভাবিত করে, সেই চেতনা কী ধর্মীয় চেতনা থেকে পৃথক নাকি ধর্মীয় চেতনা মৃত্যু চেতনাকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে তার্কিক আলোচনা করেছেন। আবার Goodwin এবং Bronfen সম্পাদিত 'Death and representations' গ্রন্থে মৃত্যুর তাত্ত্বিক উপস্থাপনা করেছেন। সেখানে তাঁরা বলেছেন 'Death is thus necessarily constructed by a culture, it grounds the many ways a culture stabilizes and represent itself, and yet it always does so as a signifier with an incessantly receding, ungraspable signified, always pointing to other signifiers other means of representing what finally is absent'।

এখানে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন যে বাংলায় মৃত্যুর কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নেই। কেন নেই তা নিয়ে অনেকগুলি গবেষণাধর্মী প্রশ্ন হতে পারে। সামান্য কিছু প্রবন্ধ ও বই আছে যেখানে মূলত ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আচার বিচার

নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এব্যাপারে একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন সেটা হল- Christopher Justice-এর 'Dying the good death: the pilgrimage to Die in India's Holy City' (1997) গ্রন্থ। এখানে লেখক তীর্থস্থানে মৃত্যু ও তার আত্মার পূর্ণতাকে ধর্মচর্চার নৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন। C. A. Bayly 'From Ritual to Ceremony: Death Ritual and Society in Hindu North India since 1600' প্রবন্ধে উত্তরভারতে উচ্চবর্ণীয় মানুষের মৃত্যুর সাংস্কৃতিক কাঠামোটিকে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর ঐতিহাসিকতার প্রশ্নের কাঠামোটি মূলত ধর্ম চেতনাকে অনুধাবন করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তিনি হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহাসিকতাকে অতিক্রম করতে পারেননি। তাই আমার গবেষণায় আমি উপরোক্ত অচর্চিত, অনালোকিত দিকগুলিকে বিস্তারিতভাবে তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি এই গবেষণায়। এছাড়া সমগ্র গবেষণায় আমি মৃত্যু সম্পর্কিত বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব্যবহার করেছি যা থেকে উনিশ শতকের হিন্দু মৃত্যুর নানা খণ্ডিত চিত্র পাওয়া যায়।

আমার এই গবেষণা সন্দর্ভটি রূপায়ণের জন্য যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রথমেই বলতে চাই এই গবেষণায় আমার শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা মহুয়া সরকারের কথা। তিনি আমাকে এমন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং একইসঙ্গে এই বিষয়ে গবেষণা করার যে ভয়-ভীতি ছিল তাতে সাহস জুগিয়েছেন, তার জন্য অধ্যাপিকা মহুয়া সরকারের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বর্তমান গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইতিহাসের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, লেখ্যাগার, প্রতিষ্ঠানে যেতে হয়েছে। সেগুলি হল- জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা); পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী; রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার লাইব্রেরী; উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ

লাইব্রেরী; চন্দননগর নিত্যগোপাল স্মৃতি পাঠাগার; চন্দননগর কমল চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পাঠাগার; হুগলি জেলা লাইব্রেরী; প্রবর্তক সংঘ লাইব্রেরী; লোকসংস্কৃতি ভবন লাইব্রেরী; চন্দননগর শব সমিতি লাইব্রেরী; চন্দনগর মর্গ; বোড়াইচন্ডীতলা শ্মশান, চন্দননগর; কেওড়াতলা মহাশ্মশান, কলকাতা; নিমতলা মহাশ্মশান, কলকাতা; ত্রিবেনী মহাশ্মশান, হুগলী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের কর্মকর্তা, গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের গ্রন্থ, অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন বিবরণ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাঁদের প্রতিও রইল কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক নুপূর দাশগুপ্ত, রঞ্জন চক্রবর্তী, রূপকুমার বর্মণ, কৌশিক রায়, সুদেষ্ণা ব্যানার্জী প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দকে। এইসঙ্গে স্মরণ করতে চাই প্রয়াত অধ্যাপক শুভাশিস বিশ্বাসকে, গবেষণা শুরুর অবস্থায় তাঁর পরামর্শ আমার গবেষণা কাজকে অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে। একইসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের আন্তরিক সহযোগিতার কথা।

এই গবেষণা কর্মকে সফল করার জন্য যাদের সহযোগিতা ও সুপরামর্শ আমার গবেষণা কাজকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁরা হলেন – ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র, যিনি তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণার রূপরেখা তৈরী করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া এই গবেষণা কাজে যাদের বৌদ্ধিক ও মানসিক সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন আমার বন্ধু অধ্যাপক প্রসেনজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক সুব্রত সুর, অধ্যাপক মুক্তি গাঙ্গুলি প্রমুখদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। একইসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অমিয় কুমার বাউল, শুভঙ্কর দে, শুভদীপ দাস, পূজা ব্যানার্জী, সোমা নস্কর, দেবলীনা বিশ্বাস, অলোক কোরা, প্রমুখ সকলেই

আমার গবেষণার খোঁজখবর রেখে আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। তাদের সকলের জন্য রইল আমার গভীর ভালোবাসা।

সবশেষে যাঁর কথা বলতে চাই তিনি হলেন আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা নবনীতা মুখার্জীর কথা। যিনি সর্বদা গবেষণা কাজের নানান পরিস্থিতিতে পাশে থেকে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছেন। তাঁর প্রতি রইলো আমার গভীর ভালোবাসা। এবারে আমি যাঁদের কথা উল্লেখ করবো তারা এই ধরায় আমাকে এনে আলোর দিশা দেখিয়েছেন। তাঁরা আর কেউ নন, আমার মা ও বাবা। এই দুজনের মধ্যে আমার উচ্চ শিক্ষায় তথা পিএইচ. ডি. করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ও আনন্দিত হয়েছিলেন আমার 'মা'। কিন্তু এই মৃত্যু নিয়ে গবেষণা কাজের সমাপ্তির আগেই আমার মায়ের 'অকালমৃত্যু' ঘটে। আমার মনে হয়েছে মায়ের জীবনের শেষ সাধ হয়তো পূরণ করতে পারলাম না। আবার এই কাজ করতে গিয়ে কখনো কখনো এমন অনুভূতিও হয়েছে যেন মা আমার এই গবেষণা কাজের অন্তরালে থেকে সাহস জুগিয়েছেন আর বলেছেন 'বাবা আমি আছি তুমি কাজ শেষ করো'! তাই বলতে চাই মা তুমি সর্বদা আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো। তোমায় জানাই আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা।

কলকাতা

২০২৩

অনির্বাণ দাস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে মৃত্যু এবং মৃত্যুর ইতিহাস এই দুটি বিষয়কে আমার গবেষণায় আলোচনা করেছি। ইতিহাসে বিষয় হিসেবে কিভাবে মৃত্যুকে সংজ্ঞায়িত করব বা উপস্থাপন করব তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবধর্মী বিষয়। আলোচনার শুরুতে মৃত্যু এবং ইতিহাস দুটি বিষয় ও শব্দকে 'এবং' দিয়ে সংযুক্ত করেছি। এখানে 'এবং' দিয়ে মৃত্যু ও ইতিহাস দুটি শব্দকে সংযুক্তির মাধ্যমে মৃত্যুর বিষয় ও বিষয়ীকে দেখবার প্রচেষ্টা। কারণ মৃত্যু ও ইতিহাস এই দুই সম্পর্কের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। মৃত্যু বিষয় হিসেবে ইতিহাস বিদ্যাকেই আধুনিক করে তোলে যা একটি চলমান ইতিহাসবোধকেই নির্দেশিত করে। প্রাথমিকভাবে ইতিহাস হল অতীত সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, যা আবার বিশেষত ইতিহাসবিদ্যা থেকে আলাদা। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু এবং ইতিহাস আলোচনা করার সময় ঐতিহাসিকভাবে মৃত্যু সংক্রান্ত গবেষণার যে ফলাফল ছিল তার সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ এর দশকে নির্মিত নতুন ইতিহাসবিদ্যার তাৎপর্য মেলে না। প্রচলিত ঐতিহাসিক গবেষণায় ফলাফল হিসেবে যা উঠে আসে তাকে ফ্যাক্ট বা তথ্য বলা হয় যা অনেক ঐতিহাসিকের কাছে একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। ফ্রান্সিস বেকন নবম অর্গান পরীক্ষণীয় ঘটনাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। অস্টেনসিভ ফ্যাক্ট (নিশ্চিত সত্য) আর ক্লাঁদেস্টিন ফ্যাক্ট (সংশয়ী সত্য)। বিজ্ঞান নির্ভর প্রথাগত ঐতিহাসিকতায় এই দুই ধরনের ফ্যাক্টকে যথাসম্ভব ইন্দ্রিয় গোচরতার গণ্ডির মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছেন। ইন্দ্রিয় দ্বারা সমীক্ষাকে পরীক্ষার বিষয়ভূত না হলে যেন কিছু ঘটনা বা তথ্য পদবাচ্য হতে পারেনা এটাই ছিল ঐতিহাসিকদের দাবী। সম্মোহন, পশুর চৌম্বকত্ব, টেলিপ্যাথি ইত্যাদি ঘটনা অষ্টাদশ

শতাব্দীর বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা প্রায়ই এগুলিকে ঘটনা বলে স্বীকার করেননি। উনবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্ত ঘটনার কিছু কিছু বিষয় মানসিক বা সাইকোলজিক্যাল ও ব্রেন সাইন্সের বিষয় হতে পারে - তা এখন অনেকেই স্বীকার করেন। বিংশ শতাব্দীতে অন্তত হিপ্নোটিসিং তথ্য হিসেবে মূলধারার ইতিহাস চর্চায় খুব একটা সংশয় নিয়ে অবস্থিত ছিল না। এমনকি ফার্দিনান্দ ব্রোদেল ১৯৪৪ সালে শ্রেণীর অধীনতার বাইরেও ইতিহাসে অন্য বর্গ যেমন ভূগোলের সন্ধান দিলেন। অ্যানাল স্কুলের ঐতিহাসিকেরাও প্রথাগত ইতিহাস চর্চার বাইরে গিয়ে মনেরও যে ইতিহাস থাকতে পারে তার সন্ধান দিলেন। পিটার ব্রুক তার ‘What is Cultural History’ বইতে দেখিয়েছেন কিভাবে সাধারণ জনপ্রিয় সংস্কৃতির মধ্যেও ইতিহাসে ঐতিহ্য কখনও সরাসরি কখনও শাসকের সংস্কৃতির মধ্যেই ক্ষমতার শর্তগুলি লালিত পালিত হয়।[১] Keith Jenkins তাঁর ‘Rethinking History’ বইতে ঐতিহাসিক সংস্কৃতি ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির মাধ্যমে কিভাবে অভিজ্ঞতাবাদী ইতিহাস চেতনার বাইরেও এক বিকল্প চেতনার অস্তিত্ব বজায় থাকে তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।[২] বিংশ শতাব্দীতে অন্তত সম্মোহন বিদ্যা তথ্য হিসেবে মূল ধারার ইতিহাস চর্চায় খুব একটা সংশয় নিয়ে অবস্থিত ছিল না। এমনকি Spiritodial phenomena বা প্রেতাত্মার আবির্ভাব সংক্রান্ত ঘটনাগুলিও Criptodial phenomena বা রহস্য ঘটনা বলে স্বীকার হচ্ছে, যা প্রকৃতির নিয়ম রাজ্যের বাইরে নয়; এ সকলের কার্যকারণ হয়তো আমরা জানিনা অথবা হয়তো আমাদের পরিজ্ঞাত নিয়মের অতর্কিত প্রয়োগের ফলে এসব ঘটনা ঘটছে। তবে

---

১ Peter Burke, *What is Cultural History*, Polity, 2008, p. 28
২ Keith Jenkins, *Rethinking History*, Routhledge, London, 2003, p. 9

প্রকৃতি কথাটির ব্যপ্তি অযথা সংকীর্ণ করলে বা একটা গন্ডি টানলে সমস্যা তৈরি হয়। আমাদের সাংখ্য দর্শনের আচার্যরা প্রকৃতির লক্ষণকে এত বড় করেছিলেন যে শুদ্ধ চিত্ত ছাড়া তার বাইরে আর কিছুই নেই বলে মনে করতেন। কার্যকারণ ধারাক্রম যেটি ক্রিয়মান সেটিই প্রকৃতি। কাজেই ঘটনা ও ঘটনার কারণ বা ফলাফল এই এলাকার বাইরে কিছু যেতে পারেনা। যেটি নির্বিকার নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ সেটি কারোর কার্যও নয় কারণও নয়। তার অবশ্য আলাদা কোনো ঘটনা হতে পারে না। সূক্ষ্ম বা রহস্য ঘটনা মিরাকেল বা অতিপ্রাকৃতিক নয়। তা আসলে আলোক চৌম্বক তাড়িত শক্তির মতো আমাদের অধুনা অতর্কিত নিয়মের বলেই ঘটছে- এটাকেই অস্বীকার করার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা অতিপ্রাকৃতিক, চতুর্থ মাত্রা, ইত্যাদি সব সূক্ষ্ম অসাধারণ তথ্য বিতথ্যগুলোকে নির্বিচারে আবর্জনা স্তূপে ছুড়ে ফেলেছেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষার্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকায়নকে যখন নতুন করে প্রশ্ন করা হল তখন উত্তর কাঠামোবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে সূক্ষ্ম চেতনা, অনুভূতি ইত্যাদি বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় অনুভব প্রভৃতি চেতনার বর্গগুলি তাঁদের গবেষণায় নতুনভাবে প্রাধান্য পেতে শুরু করল। যেটা আলোচনা করতে চাইছি তা হল মৃত্যু কিভাবে ঐতিহাসিকতার বিষয় হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। মানুষ মরণশীল কিন্তু কোন মানুষই নিজের মৃত্যুর অনুভূতি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। সেই কারণেই অপরের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজের মৃত্যু সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারে। মৃত্যু তাদের জন্য একটি সমস্যা বা প্রশ্ন যা সব সময় ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ অজ্ঞাত স্মৃতি যা তার বর্তমান সত্তাকে সবসময়ই বহমানতার দিকে নিয়ে যায়।

বর্তমান গবেষণায় মৃত্যুর ইতিহাস ও তার দার্শনিকতার নানা দিককে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হয়েছে। ইউরোপীয় দার্শনিকরা মৃত্যু নিয়ে যে প্রকরণ নির্মাণ করেছেন তা ভারতীয় প্রেক্ষিতে আমার গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় তাত্ত্বিকদেরও মৃত্যু সম্পর্কে যে চিন্তন তা দেখানো হয়েছে। এছাড়া নতুন নতুন অনালোচিত, অচর্চিত, নানাদিক নিয়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি এই গবেষণায়। একইসঙ্গে এখানে বেশকিছু গবেষণা প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন –

১. উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলায় মৃত্যুর দর্শন আর ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মধ্যে কি ধরণের সম্পর্ক নির্মিত হচ্ছিল?

২. বাংলায় ভালো মৃত্যু বা মন্দ মৃত্যু সম্পর্কে ব্রিটিশেরা যে শ্রেণীবিভাগ করেছিল – তা নিয়ে বাংলার সনাতন সমাজের ধারণা কি ছিল?

৩. নবজাগরণের বৃত্তে থাকা বুদ্ধিজীবীদের মৃত্যুভাবনা কেমন ছিল?

৪. হিন্দু সৎকার রীতির সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকারের যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক তার প্রকৃতি কেমন ছিল?

৫. ঔপনিবেশিক বাংলায় থ্যানাটো পলিটিক্স ও বায়ো পলিটিক্স এর যে সম্পর্ক তা নবজাগরণের যে আলোকায়ন তাকে কতটা নির্দেশিত করেছিল?

ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৃত্যু, মৃত্যু ভাবনা বা চিন্তা বিশেষভাবে সমব্যাপ্ত। মৃত্যুর ইতিহাস ও মৃত্যু চেতনার ইতিহাস একই মাত্রায় আলোচনা করা বা তাকে বিষয়গত করা খুব কঠিন কাজ। আবার অপরদিকে এও সত্যি যে চেতনা ছাড়া মৃত্যুর ইতিহাস নির্মাণ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ

চেতনা বিশেষত, ভাষা দর্শন ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে অনুষঙ্গগুলির জন্ম নেয় যেমন- শোক, দুঃখ, বেদনা এগুলির সবগুলি চেতনারই বিশেষ বিশেষ বর্গে অবস্থান করে। মৃত্যুর ইতিহাসে একধরনের সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক দিক উঠে আসে। আবার গভীর জ্ঞানের দার্শনিক কামনা, বাসনা, ইচ্ছা এই বিমূর্ত অনুভূতিগুলো মৃত্যু, মৃতদেহের ইতিহাস বা সমষ্টিগত মৃত্যুর ইতিহাস থেকেই উঠে আসে। মৃত্যুর ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চেতনার অন্তরালে মৃত্যুর বহুমাত্রিকতার যে দার্শনিক প্রকল্প তা বারে বারে আমাদের চিন্তায় সংযোগ ও বিয়োগ এনেছে। সেখানে একটি প্রশ্ন প্রথমেই উঠে আসে তা হল মৃত্যু কি? এটিতো শুধুমাত্র একটি প্রশ্ন নয়, বরং এর সাথে জড়িয়ে পড়ে অনেকগুলি প্রশ্নের আশ্রয়। সাধারণভাবে কিছু গতে বাঁধা ঐতিহাসিক কালিকতা, কার্যকারণ তত্ত্ব, বোধগম্য ছাঁচের সাথে খাপ খায় না। 'মৃত্যু কি?' এটি শুধুমাত্র একটি প্রশ্ন নয়, একটি বাক্য হিসেবে ভাবা যেতেই পারে। আর এই প্রশ্ন করলে সেইসঙ্গে তার উত্তরের সন্ধান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যদি উত্তর পাওয়ার বদলে আরও নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়, তাহলে, প্রশ্ন-উত্তর এর যে আধুনিক কাঠামো, তা দিয়ে মৃত্যুর সম্পর্কিত অনুষঙ্গগুলিকে সম্পুর্ণ ভাবে বোঝা সম্ভব নয়। এই আলোচনা প্রসঙ্গে চলে আসে মিথ, ভৌতিক গল্প, পুরাণ, আত্মা ও শোকযাপনের ইতিহাস। উইটগেইন্সটাইন এর মতে, মৃত্যু কি এ প্রশ্নের উত্তর সরাসরি ভাষার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং জীবনযাপনের মধ্যে দিয়েই বুঝতে হবে মৃত্যুর ধারণা। কারণ, মৃত্যু কি একটি মৌলিক বচন বা 'Elementary Proposition'। মৃত্যু চিন্তা ও তার চেতনা আলোচনা করতে হলে তার আগে 'জীবন' বলতে কি বোঝায় এবং তার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও বিজ্ঞান চেতনাকেও বুঝতে হবে। কারণ দেহের শেষ মানেই কি মৃত্যু অথবা দেহের যান্ত্রিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বন্ধ হলেই কি মৃত্যু ঘোষণা করা যেতে পারে, নাকি দেহ একটি মিডিয়াম। মৃত্যুর পরেও মৃত মানুষের স্মৃতি সমাজের কাছে, ব্যক্তির কাছে বা তার

অশরীরী উপস্থিতি এবং তার অস্তিত্বের থাকা বা না থাকার প্রমাণ দেয় না। রবীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে মীরা দেবীর পুত্র নীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জার্মানিতে মারা গেলেন, এক চিঠিতে তিনি তাঁর কন্যাকে জানিয়েছিলেন, 'মৃত্যুই তো সব শেষ নয়, যদি সব শেষ হত তাহলে ভালবাসা থেকে যায় কেন?' অর্থাৎ মৃত্যু জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি। এই পরিণতি ব্যক্তিকে আরও ব্যক্তিগত করে তোলে, সমাজকে আরো সামাজিক অনুভূতির দিকে ঠেলে দেয়। দার্শনিক দেরিদাও মৃত্যু এবং শোক সম্পর্কে বলেছিলেন যে, মৃত ব্যক্তি জীবিত সদস্যদের চেতনার অনুভূতিকে আরও বৃহৎ করে দেয়। জীবিত কালের স্মৃতি মৃত্যুর পর আরও ব্যাপ্তি পায়। বিচ্ছেদই যেন এই স্মৃতিকে আরও গভীর থেকে গভীরতর করে তোলে। জার্মান দার্শনিক উইটগেইন্সটাইন এর মতে, মৃত্যু অভিজ্ঞতা প্রতীয়মান হয় না বলে, তা জীবনের কোন ঘটনা নয়। সুতরাং জীবন অভিজ্ঞতারই সমষ্টি। মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'My experiment with truth' গ্রন্থে বলেছেন- "I live and move and have my being in pursuit of this goal (moksha). All that I do by way of speaking and writing and all my ventures in the political field are directed to this end. I live and move and have my being in pursuit of this goal".[৩] এই মোক্ষ গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করেছিল। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মৃত্যু একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে সতীদাহ প্রথা থেকে শুরু করে বিংশ শতকের মধ্যবর্তী পর্যায় পর্যন্ত বিপ্লবীদের আত্মবলিদান শহিদ ও অমরত্ব ঔপনিবেশিক রাজনীতির দমন পীড়নকে এক আত্মাভিমানের পর্যায় নিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ রামমোহন থেকে গান্ধী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে মৃত্যু, মৃতদেহ ও শ্মশান ব্যবস্থা, শহিদ

৩ Mahatma Gandhi, *My Experiment with Truth*, p.17

ফলক এই জড় উপাদানগুলিও এক সাংস্কৃতিক চিহ্ন ও প্রতীকের মধ্যে দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চা মানসিক দ্বন্দ্বের পটভূমিকা তৈরি করেছিল। বিশেষত বিপ্লবীদের আত্মবলিদান ভারতীয় ধর্ম চেতনার মধ্য দিয়ে যে অমরত্বের সন্ধান তা উপনিবেশিক শাসকদের যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছিল। আমার গবেষণার প্রকল্পে চারটি অধ্যায় বিন্যাসের মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করেছি, মৃত্যু বা মৃত মানুষের ইতিহাস কিভাবে ইতিহাস বিষয়টিকেই অর্থময় করে তোলে। মৃত্যু ও তার পরিণতি, শোক, দেহ থেকে রাজনীতি প্রভৃতি দার্শনিক বর্গগুলিকে মৃত্যু সবিকল্প জ্ঞানতত্ত্বের আঙিনায় নিয়ে আসে। গবেষণার সময়সীমা ১৭৭২ থেকে ১৯২০ দশক অবধি সীমাবদ্ধ রেখেছি। ১৭৭২ সময়সীমা থেকে গবেষণা শুরু করার উদ্দেশ্য হল রাজা রামমোহন রায় ও তার সতীদাহ প্রথা রোধ করার মাধ্যমে অসংখ্য নারী মৃত্যুর যে ঘটনা ও তার তৎকালীন দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মল্লভূমিতে যে জড় ও অ-জড় চেতনার বাগ বিতণ্ডা শুরু হয়েছিল তা ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতের সীমানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আর এখানেই আমার গবেষণার মূল প্রকল্পকে আমি ধরবার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও সতীদাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক কর্ম কাণ্ড গড়ে উঠেছিল তাও আমার গবেষণার অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। ১৯২০ এর দশকে গবেষণা শেষ করেছি মূলত গান্ধীজীর আবির্ভাব ও ভারতের রাজনৈতিক দর্শন ও তার প্রেক্ষাপট বদল। ১৯২০ এর দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আগমনের ফলে মৃত্যু চেতনাতেও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গান্ধীয় দর্শনে মৃত্যু চেতনার পরিবর্ত বিকল্প রূপ হল অহিংসা ও মোক্ষের ধারণার জন্ম লাভ করা। সেই জন্য চেষ্টা করেছি ১৯২০ এর মধ্যে গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখার। তবু একথা সত্যি আমার গবেষণার আলোচনা প্রসঙ্গে সবসময় ঐতিহাসিক কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারিনি। গবেষণার প্রয়োজনে কখনও প্রাচীন ভারত কখনও বা পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, আবার কখনও প্রাচীন বিশ্বের ইতিহাস এবং কখনও মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদি

বিষয়গুলিতে ফিরে যেতে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সতীদাহ প্রথা আলোচনা করতে গেলে প্রসঙ্গক্রমে সহমরণ, অনুমরণ, শাস্ত্র, মনুস্মৃতি এ বিষয়গুলি চলে আসে। আবার মৃত্যু চেতনার ইতিহাস বলতে গিয়ে রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, কেশব চন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখদের মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা যেমন অপরিসীম গুরুত্ব দিয়ে দেখেছি। অপরদিকে ফ্রয়েড, উইটগেইন্সটাইন, লাঁকা, দেরিদা, হাইডেগার এঁদের চিন্তা ভাবনার কাছেও বারেবারে ফিরে যেতে হয়েছে। কারণ রামমোহনের সতী বুঝতে গেলে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের দার্শনিক প্রত্যয়গুলিকে আগে বুঝতে হবে। আমি আমার গবেষণার প্রকল্পকে বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। অধ্যায় বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একটি বৃহৎ মৃত্যু চেতনার ইতিহাসকে ধরবার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বা তাকে দাহ করা ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে একটি প্রধান ও অন্যতম রীতি। একইসঙ্গে এটা নিরীক্ষিত যে বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম এবং শিখরা মৃতদেহ অগ্নিসৎকারে বিশ্বাস করে না। এমনকি বেশিরভাগ নিম্নবর্গের হিন্দুরা মৃতদেহ পোড়ানোতে বিশ্বাস করত না। উনিশ শতকীয় চিন্তাবিদরা মনে করতেন অগ্নিসৎকারের ধারণার জন্ম ভারতবর্ষে মূলত আর্যদের আগমনের সাথে সাথে। মনে করা হয় ভারতবর্ষ থেকেই অগ্নিসৎকার প্রথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিল, যদিও এ নিয়ে দ্বিমত আছে। ঐতিহাসিকগতভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আদিপর্বে অগ্নিসৎকারের ব্যবস্থা ছিল না, কেন ছিল না তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত বা বহুমত আছে। একথা ঠিক যে প্রাক্ বৈদিক পর্বে মৃতদেহকে কবর দেওয়া হত এবং তার এক ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তীকালে আর্যদের আগমনের সাথে সাথে এই ঐতিহ্যের ছায়া সমসাময়িক মৃতদেহের সৎকারের পদ্ধতিকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কবর ব্যবস্থার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ঐতিহাসিকদের বহু যুক্তি আছে এবং এই যুক্তির বেশিরভাগ আধার বা বয়ান

মূলত ধার্মিক বা অতিন্দ্রিয়বাদের উপর নির্ধারিত। এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন হওয়ার আছে। তা হল কেন, কবে এবং কিভাবে কবর ব্যবস্থা থেকে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার প্রচলন ভারতবর্ষে হল? এই পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক বর্গটিকে বুঝতে হলে, সমসাময়িক সমাজে ধর্মীয় চেতনার স্তরগুলিকে বুঝতে হবে, কারণ এখানে ইতিহাস চর্চার পদ্ধতিগত কাঠামোটিকে প্রচলিত ধারণা ও তার বাইরে গিয়েও প্রচলিত কার্যকারণ পদ্ধতিকে প্রশ্ন না করলে, এই রূপান্তরের সঠিক কারণ অনুধাবন করা সহজ কাজ নয়। কারণ মৃতদেহ সৎকার ব্যবস্থাটির যে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার দিক আছে তা মূলত মানুষের কল্প কাহিনী ও বিশ্বাসের উপর আধাররত যা আবার চোরাস্রোতের মত প্রচলিত ঐতিহাসিক ধ্রুব সত্য ব্যবস্থাকে কখনও আলোকিত, কখনও সংশয়ের দিকে নিয়ে গেছে। হয়ত সেই জন্যই ইতিহাসের গর্ভে এক সত্যের বদলে বহু সত্যের জন্ম নেয় এবং ইতিহাস নবীন হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক K. Rebay-Salisbury-এর মতে কবর ব্যবস্থা থেকে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থায় রূপান্তরের মধ্যে ‘Belief system’ কতটা প্রভাবিত হয়েছে বা করেছে তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে এই ‘Belief system’ সমাজেরই এক কল্পিত ধারণা যা সমাজকেই সামাজিকতা দেয়। তাঁর মতে এই রূপান্তরের কারণটিকে কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য করা যায় তা তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা নির্মানের যে যুক্তিকাঠামো তাকে নমনীয় করে নতুন যুক্তি নির্মান করার পথ প্রসারিত করতে হয়েছিল না হলে শুধুমাত্র সামাজিক নীতিগত সিদ্ধান্ত দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক বর্গকে পরিবর্তিত করে এর একটি নব্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব ছিল না। কবর ও অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার মধ্যে একটি সমানুপাতিক দ্বন্দ আছে। কবর ব্যবস্থার মাধ্যমে মৃতদেহকে রক্ষা করার মাধ্যমে মৃতদেহের পুনর্জীবন সম্ভব যা অগ্নিসৎকারের মাধ্যমে সম্ভব নয় বলে তৎকালীন কবর ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি উঠেছিল। অপরদিকে একথাও সত্যি যে, এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে অর্থাৎ অগ্নিসৎকারের মাধ্যমেও আত্মার পুনর্জন্ম

সম্ভব কারণ অগ্নিসৎকারে বিশ্বাসী মানুষেরা মনে করতেন আত্মা অবিনশ্বর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Sorensen and Bille প্রশ্ন তুলেছেন, কেন পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজ ব্যবস্থায় অগ্নিসৎকার ব্যবস্থাকে মৃতদেহ জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় রূপান্তরের ব্যবস্থা হিসেবে মনে করা হয়। এখানে তাঁরা অগ্নিকে একটি সাংস্কৃতিক চিহ্ন হিসেবে দেখতে চেয়েছেন যার অতলে আছে গভীর বিজ্ঞান বোধ। মৃতদেহ কেন অগ্নির মাধ্যমে সৎকার করা যেতে পারে এ প্রশ্নটি আসাও প্রাসঙ্গিক। মনে করা হয় প্রাক ঐতিহাসিক পর্ব থেকে ধ্রূপদী যুগ পর্যন্ত অগ্নি বা আগুন একটি প্রযুক্তির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হত (Pyrotechnics)। আগুনের মাধ্যমে খাদ্য, তৈজস পত্রাদি তৈরী, ধাতব বস্তু গলানো, এছাড়া আরও অনেক কিছুতে আগুনের ব্যবহার করা হত। তৈজস দ্রব্যাদি আগুনে পোড়ানোর জন্য যে চুল্লি তৈরী করা হত, মৃতদেহ অগ্নিসৎকারে যে চুল্লির ধারণা মনে করা হয় তা এখান থেকেই এসেছিল। ভারতবর্ষে প্রথম অগ্নিসৎকার প্রামাণ্য হিসেবে পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। ১৫০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে অধুনা পাকিস্তানে এই প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃত স্তোত্র সংকলিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদ গ্রন্থের চারটি স্তর রয়েছে। যথা: "সংহিতা", "ব্রাহ্মণ", "আরণ্যক" ও "উপনিষদ্"। "ঋগ্বেদ সংহিতা" হল এই গ্রন্থের মূল অংশ। এই অংশে দশটি “মণ্ডল” বা খণ্ড এবং সর্বপরি মোট ১০২৮ টি “সুক্ত” বা স্তোত্র নিয়ে সংকলিত এবং সব মিলিয়ে মোট মন্ত্রের সংখ্যা ১০,৫৫২ টি। ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলে সূক্ত ১৫ এর ১৪ তম স্তোত্র থেকে ভারতবর্ষে প্রথম অগ্নিসৎকারের ধারণার প্রমাণ মেলে। ইউরোপে মৃতদেহ সৎকারের মাধ্যম হিসেবে অগ্নিসৎকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করা হত। যদিও খ্রিস্টধর্মে শবদাহ সম্পর্কে ‘*New Testament*’ এ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইউরোপে খ্রিস্টপূর্বে শবদাহ ব্যবস্থা চালু থাকলেও তা শুধুমাত্র ধর্মীয় মোহ বিশ্বাসের জালে আবদ্ধ থাকেনি বরং এই

ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের দিকটিও প্রাচীন আমলে সামাজিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু কখনোই ধর্মীয় ভাবে আবদ্ধ ছিল না। একথা মনে করা যেতে পারে মৃতদেহের দাহ করার ভাবনার মূল উৎস হলো স্বাস্থ্যসংক্রান্ত চিন্তা। এখানে ধর্মীয় শিরোনামের যতটা না প্রয়োজন তার চেয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের বাস্তবিক ভাবনার প্রয়োজন বেশি। ফলত ইউরোপীয়রা শবদাহকে ধর্মহীন প্রথা বা পদ্ধতি হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু একথা সত্য যে অগ্নিসৎকার প্রথা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গভীর শিকড় থাকা সত্বেও পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের কাছে তা কখনোই যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়নি। তাদের প্রশ্নটা যতটা না ঐতিহাসিক তারচেয়ে বেশি ধার্মিক। উনিশ শতকে 'হিন্দু অগ্নিসৎকার প্রথা' ব্রিটিশদের কাছে একটি 'ভৌতিক' ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। ১৮৭০ পর্যন্ত শবদাহ ব্যবস্থা পশ্চিমের সভ্যতা গুলির কাছে একটি জঘন্য ও অমানবিক ক্রিয়া-কলাপ হিসেবে দেখা হয়েছে। শবদাহ সম্পর্কে এই ধারণা তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে অংশত সতীদাহ সম্পর্কে তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া যা সাধারণ শবদাহ সংস্কারকেই ইউরোপীয়রা ভয়ঙ্কর ও জঘন্য বলে মনে করেছেন। মূলত অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিমের ব্যক্তিবর্গ চিন্তাবিদরা সরাসরি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে লাগলো। ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতা ছাড়াও ইউরোপীয়রা শবদাহকে অস্বাস্থ্যকর ও দূষণ হিসেবে দেখতে চেয়েছে। ১৮৫৯ সালে বেঙ্গল ইন্সপেক্টর জেনারেল Frederic J. Mouat শ্মশান ঘাট থেকে নির্গত ধোঁয়ার গন্ধ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন, "nauseous and disgusting to the last degree"। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন অবসান ঘটার পর ব্রিটিশ রাজতন্ত্র শাসনভারের দায়িত্ব নিলে তখন প্রাদেশিক শাসক ও কেন্দ্রীয় শাসন নতুনভাবে গঠিত পৌরসভার মাধ্যমে হিন্দু ক্রিমেশন ঘাটগুলিকে শহরের মূল কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। Sir Cecil Beadon এর আদেশে কলকাতায় আধুনিক

চুল্লি গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে অর্ধ পোড়া মৃতদেহ ও অপরিচ্ছন্ন শবদাহ ঘাট না থাকে। এরপরই Municipality-র তরফ থেকে চুল্লি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হলো হুগলি নদীর তীরবর্তী প্রাচীন শবদাহ ঘাটে। একদিকে পাশ্চত্য ধারণায় অগ্নিসৎকার আরো প্রবল ভাবে গ্রহণ-বর্জন চলছে , উল্টোদিকে হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীও ধর্মে হাত পড়েছে বলে চিৎকার জুড়েছে। এইখানেই ঔপনিবেশিক শাসকদের, 'Scientific Cremation' বক্তব্যটি আরও যুক্তিযুক্তভাবে বৈধতা পায়। সাধারণভাবে শবদাহ ব্যবস্থা নিয়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রাথমিকভাবে নেতিবাচক মনোভাব থাকলেও পরবর্তী কালে তা কিছুটা সংশোধিত হয়েছিল। একমাত্র শবদাহ ব্যবস্থার মাধ্যমেই "রোগজীবাণুর পূর্ণ মৃত্যু" সম্ভব। যদিও ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে ভারতীয়দের 'উন্মুক্ত অগ্নিসৎকার' বনাম বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্নিসৎকার নিয়ে দীর্ঘ বিবাদ হয়েছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে 'মহামারী' ও 'মৃত্যু' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহামারী ও মৃত্যু- এই দুটি শব্দ বোধহয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত, রচিত ও সমালোচিত শব্দ। মহামারী ও মৃত্যু, দুটি বিষয় কিভাবে সম্পর্কিত হয়েছে, অর্থাৎ বলতে চাইছি সম্পর্কের ধরনের আদান প্রদানের মধ্যে মহামারী ও মৃত্যু কিভাবে যুক্ত ও বিযুক্ত? মৃত্যু তো জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু মহামারী বা অতিমারী মৃত্যুকেই ব্যঞ্জনাময় করে তোলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক মৃত্যু বা কম সময়ে বহু মানুষের মৃত্যুতে, মৃত্যু আর জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে থাকে না। এখানেই ইতিহাসে কার্যকারণতত্ত্বে আলোচনা বা প্রসঙ্গ চলে আসে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মহামারী, অতিমারী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, কারণ মহামারী বা অতিমারী কোন দৈব ঘটনা নয়। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি মহামারী বা অতিমারীর কারণ হিসেবে রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, ধর্ম বহুমাত্রিক ভূমিকার অবদান রেখেছে, তাই আজও ইতিহাসে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর দুটি

শ্রেনীবিভাগ আছে, আর শ্রেনীবিভাগ থাকলেই তার একটি বর্গ নির্মাণ হয়, আর তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে মহামারী বা অতিমারীকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা যা একই সঙ্গে দ্বান্দ্বিক, কিছু অর্থে বহুমাত্রিক। আমরা জানি, রোগ, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলি ঐতিহাসিকভাবেই ইউরোপ কেন্দ্রিক, সাম্প্রতিককালে তা পশ্চিমিকেন্দ্রিক অর্থাৎ জনসংখ্যার সাথে জনস্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। আর সেখানেই মহামারী বা অতিমারীর সংজ্ঞারও বিভিন্নতা আছে বলে মনে করি। অর্থাৎ প্রাচ্যের দেশে কতজনের মৃত্যু হলে মহামারী বলা যেতে পারে এবং পাশ্চাত্যে তা কত এ হিসেবের পার্থ্যক্যই সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য ধারণা দুটি পৃথক। ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উন্নতির মাধ্যমে সমগ্র জনজাতির উন্নতি সম্ভব এমন নয়। এখানে রাষ্ট্র, আইন ও পরিবেশ সমগ্র ব্যবস্থার মৌলিক উন্নতির ফলেই জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব। ঐতিহাসিকগতভাবে যখন জনস্বাস্থ্য আলোচনার বিষয় হয় তখন শুধুমাত্র একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তা বোঝা সম্ভব নয়। সেখানে সাধারণ ভাবেই কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন চলে আসে যেমন, কেন মানুষের মৃত্যু হার বাড়ছে, মানুষের রোগ প্রতিরোধ দুর্বল হওয়ার কারণ কি, সঠিক পুষ্টি বিন্যাস ও আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে কি সম্পর্ক - প্রভৃতি প্রশ্নগুলি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। মহামারী ও অতিমারীর ইতিহাস আলোচনা শুধুমাত্র জন্ম মৃত্যু হার বা রোগ জীবাণুর ইতিহাস নয়, এখানে ঐতিহাসিকতার যে কাঠামো তার প্রাসঙ্গিকতা ও ব্যাখ্যা সমানুপাতিকভাবেই প্রয়োজন। তা না হলে জনস্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্য আলোচনা উন্নয়ন অবনয়নের তথ্য হিসাবেই রয়ে যাবে, ইতিহাসের বলয়কে তা কখনই আলোকিত করবে না। আসলে জনস্বাস্থ্য কি এ প্রশ্নটি শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বা রাশি বিজ্ঞানের সন্দর্ভে বোঝা শক্ত। স্বাস্থ্যের মধ্যে যখন 'জন' শব্দটির ধারণা গড়ে ওঠে জনস্বাস্থ্য তখন শুধুমাত্র অরাজনৈতিক বা বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে থাকে না।

ঐতিহাসিক ভাবে স্বাস্থ্যের ধারণার সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা, বর্ণভেদ প্রথা এমনকি মেধাবৃত্তি জড়িত অর্থাৎ, স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো ও জনসংখ্যার চাহিদা যোগানের যে অসাম্যতা সেখানেই অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় 'সোসাল চয়েস থিওরি ' বা কাদের স্বাস্থ্য সর্বাধিক প্রাধান্য পাবে তা স্বাভাবিক ভাবেই বিতর্ক ও আলোচনার পটভূমিকা তৈরি করে। এ সম্পর্কে একজনের কথা না বললেই নয়। পল ফার্মার ছিলেন হার্ভাড মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ করা ডাক্তার এবং মেডিকেল অ্যানথ্রপলজিতে পিএইচ. ডি। তাঁর গবেষণার কাজের জন্য তাঁকে গিয়ে থাকতে হত হাইতিতে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন কিভাবে উন্নয়নের নামে নদীতে বাঁধ বেঁধে গোটা গ্রামটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল। সেই গ্রামের মেয়ে অ্যাসিফিকে যেতে হল শহরে কাজের তাগিদে; সেখানে মালিক ও মেলেটারির উগ্র যৌন লালসার পথ ধরে তার দেহে বাসা বাঁধল এইচ.আই.ভি., সেই খোঁজ থেকে ডাঃ পল তুলে আনলেন স্বাস্থ্যের সামাজিক সম্পর্ক গুলিকে- গড়ে তুললেন স্বাস্থ্যের জৈব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। স্বাস্থ্য মানে কেবল ওষুধ বা চিকিৎসা নয়, জীবাণু বা ভাইরাসের আক্রমণ নয়, স্বাস্থ্য মানুষে মানুষে সম্পর্ককে, জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ককে দ্বিমাত্রিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত নরওয়েজিয়ান সমাজতাত্ত্বিক জোহান গ্যাল্টাং এর সমাজকাঠামো গত হিংসার ধারণার সাহায্য নিয়ে পল খুজে দেখতে লাগলেন 'কারা বাঁচে, আর কারা মারা যায়!'। শুধুমাত্র আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা বা সোভিয়েত ভেঙে তৈরি হওয়া দেশগুলিতেই নয়, আমেরিকাতেও লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে রোগে, বিনা চিকিৎসায়, অপচিকিৎসায়। পল দেখলেন, কিভাবে অনাহার, অশিক্ষা, দারিদ্র ও স্বাস্থ্য পরিসেবার অভাবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে আছে মানুষের স্বাস্থ্য; আবার এও দেখলেন কিভাবের অস্বাস্থ্যের কারণগুলিকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আফ্রিকার স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসনে দেশগুলিকে যুগ পরম্পরায় হতশ্বাস রেখে দেওয়া

হল। যার পরিণতি রোগের নিরবিচ্ছিন্ন আক্রমণ ও অকাল মৃত্যু। অথচ এর জন্য দায়ি করা হতে লাগল চাপিয়ে দেওয়া অসহায়তা বয়ে বেড়ান মানুষগুলিকেই। বলা হল অসংযমী জীবনযাপনই তাদের রোগের মূল কারণ। এর বিরুদ্ধে পল ও তাঁর সহযোগীরা বললেন, উন্নত বিশ্ব তাদের শোষণের ভিতর দিয়ে রোগটা দেবে, ওষুধ দেবে না সেইটা হতে পারে না। পলের বাস্তব গবেষণা দেখাল, কিভাবে ‘রোগ নিরাময়ের চেয়ে ভাল হল রোগ প্রতিরোধ’- এই আপ্তবাক্যের আড়ালে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সামাজিক চয়ন পদ্ধতি বা সোশাল চয়েস থিয়োরির আধুনিক সংজ্ঞাকার বা জনক হলেন Kenneth Arrow। তাঁর সামাজিক চয়ন পদ্ধতির মূল কথা হল অসমতার মধ্যে একধরনের ভারসাম্য খোঁজা। এই সামাজিক চয়ন পদ্ধতি বিংশ শতকে এমন একটি দার্শনিকতার জন্ম দিয়েছিল যা স্বাধীন হবে এমন রাষ্ট্র, স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন রাষ্ট্র এবং পরবর্তি কালে স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাস যখন লেখা হয় তখন এই পদ্ধতি ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবীদ এবং দার্শনিকদের ব্যপক ভাবে প্রভাবিত করে, যার মধ্যে অন্যতম হলেন অমর্ত্য সেন। এই সামাজিক চয়ন পদ্ধতিকে তিনি তাঁর স্বকীয় গবেষণার মাধ্যমে আরোও এগিয়ে নিয়ে যান এবং পরবর্তিকালে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। এই পদ্ধতির মূল ধারণা হল, এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা বা এমন একটি যৌক্তিক ব্যবস্থার আলোচনা ও নীতি প্রণয়ন করা যেখানে নীতি, ন্যায় এবং স্বাম্যতা প্রাধান্য পাবে এবং যেখানে এক যৌক্তিক অধিকার তৈরি হবে যা রাষ্ট্রের থেকে কাম্য। এই প্রসঙ্গে বলা যায় অমর্ত্য সেনের ১৯৪৬ এর দুর্ভিক্ষ-এর উপর গবেষণায়ও সামাজিক চয়ন পদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়। পরবর্তিকালে যখন স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক কাজ করেন বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন ধরণের রোগ জন্ম নিয়েছিল, যে বিপুল জনসংখ্যার মৃত্যু হয়েছিল এবং যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তা নিয়ে যখন গবেষণা করা

হয়, সেখানেও এই সামাজিক চয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে বা হচ্ছে বলা যেতে পারে। অমর্ত্য সেনের মতে সমস্যা সমাধানের নতুন ব্যবস্থাপনা দিয়ে সামাজিক উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন দেশের সব লোককে তার মধ্যে ধরবার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ কাঠামোকে অনুধাবন করতে পারেনি বলেই ভারতীয় সমাজকে বারে বারে দুর্ভিক্ষ, মহামারীর সম্মুখীন হতে হচ্ছিল এবং মৃত্যু হারও খুবই বেশী ছিল। কিন্তু এমন নয় যে ঔপনিবেশিক দেশগুলি তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তা সমাধান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। অমর্ত্য সেনের গবেষণা বিশেষত তাঁর 'পভার্টি এন্ড ফেমিনস' গ্রন্থটি শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসকেই চিহ্নিত করে না, ইতিহাসের কার্য-কারণ তত্ত্বকেও এক বহুমাত্রিক আণুবীক্ষণিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে, যা উনিশ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার যে পদ্ধতি তাকেও প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে উপনিবেশিক বাংলায় সামাজিক ইতিহাসে মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সতীদাহ প্রথা বোধহয় সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য ও এর মধ্যে দিয়ে শাসক ও শাসিতের যে সম্পর্ক তাকে নতুন ভাবে দেখার সম্ভবনা তৈরি হয়। কারণ, সতীদাহ প্রথা সারা ভারতবর্ষেই বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন নামে, বৈচিত্রময় ঐতিহাসিক কাঠামোয় প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাংলার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সতীদাহ প্রথার আলোচনা শুধুমাত্র ঐতিহাসিকতা দিয়ে বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, সতীদাহ প্রথা একটি কুসংস্কার যা রদ হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়, তাঁর সহযোগী ও ব্রিটিশদের দ্বারা এটুকু বললেই বোধহয় পুরোটা বলা হয় না। কারণ, সতীপ্রথার সাথে মৃত্যু, পিতৃতান্ত্রিক শোষণ, শোক, বাসনা ও দেহের সমাপ্তি ইত্যাদি দার্শনিক বর্গগুলি কখনও সরাসরি কখনও ভাষা, শাস্ত্র ও চেতনার অন্তরালে আলো ছায়াময় হয়ে উপস্থিতির জানান দেয়। এই অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি আধুনিক ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায় কিভাবে

সতীদাহ প্রথা রদের মাধ্যমে আধুনিকতার সন্ধান করছিলেন। উনিশ শতকের বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা সতীদাহ প্রথাকে একটি ধর্মীয় আচার, বিচার, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। কিন্তু সতীপ্রথা তো একটি মৃত্যুরই গল্প, আর এখানেই রামমোহন রায় শাস্ত্র সংস্কারের উর্ধে গিয়ে দয়া, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার বর্গগুলিকে এনেছেন অনুভূতির মাধ্যমে। রামমোহন রায় সতীপ্রথা রদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত শোক থেকে সমূহ শোকের প্রতি সন্ধান করেছেন। আর তাঁর এই বিচিত্রগামী মৃত্যু চিন্তাই উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে বহুমাত্রা যোগ করেছে। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসকে মৃত্যুর চোখ দিয়ে দেখলে ঔপনিবেশিক শাসনের যে দমন ও আধিপত্য তার বিরুদ্ধে দেশীয় শুদ্ধ চেতনা অইউরোপীয় আধুনিকতার আদলে যে তৈরি হচ্ছিল তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আরও দেখিয়েছি, উনিশ শতকের চিন্তাবিদরা কিভাবে মহামৃত্যুর সন্ধান করছিলেন এবং এক ধরণের ধর্মীয় মৃত্যু সংস্কৃতি নির্মাণের মাধ্যমে স্বমৃত্যুর ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন। কলিকাতা সমাজের বিভিন্ন বাবু ও জমিদারেরা কিরকম ভাবে মারা যেতে চান, তাঁর বর্ণনাও পাওয়া যায়। এ সময়ে থিওসফিকাল সোসাইটি, ব্রাহ্মসমাজ ও আরও অনেক সভা, সমিতি তৈরি হচ্ছিল যেখানে পরলোক চর্চা, প্রেতচর্চা, প্ল্যানচেট, তান্ত্রিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই অধ্যায়ে আরও দেখিয়েছি রবীন্দ্রনাথ যেমন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত আধুনিকতার সন্ধান করছিলেন, অপরদিকে বিবেকানন্দ আধুনিক যুবসমাজকে দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করার কথা বলছেন, যা পরবর্তিকালে ঋষি অরবিন্দ থেকে সুভাষচন্দ্র বসুকে ও বাংলার বিপ্লবীদের প্রভাবিত করছে। গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও মৃত্যু বরণ করার যে সম্পর্ক তাঁর নব্য রাজনৈতিক দর্শন তৈরি হচ্ছে। কিছুটা বলা যেতে পারে, স্বদেশী আন্দোলনে মৃত্যু বরণ করার যে গৌরব তৈরি হয়েছিল তা গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড কিছুটা গৌরবের

উজ্জ্বলতাকে অন্তর্মুখীন করে তোলে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন মৃত্যু কেন্দ্রিক গল্প উপন্যাস ও তার ঐতিহাসিকতাকে সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করেছি। এই উনিশ শতকেই পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিকদের মধ্যে মৃত্যু ও তার পরবর্তি অনুষঙ্গগুলিকে নিয়ে যে চর্চার ঢেউ উঠেছিল তার তরঙ্গ ভারতেও এসেছিল। তবে তাকে ইতিহাসের সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করেছি। বিশেষত আলোচনা করেছি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও তাঁর চেতনা সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের একের পর এক ব্যক্তিগত মৃত্যু শোক কিভাবে সমগ্র বাঙালি সমাজকে এক উত্তরণের পথ দেখাচ্ছে ও পরোক্ষ ভাবে ইতিহাস চেতনাকেও প্রভাবিত করেছে। শোক পালনের মধ্যে যে এক আত্মাভিমান আছে, তা ঔপনিবেশিক আধিপত্যের যে আধুনিকতা তাকে প্রতিরোধ করে। আলোচনা করেছি শোক কি? শোক কিভাবে মানুষকে ব্যক্তিগত করে তোলে এবং শোকের মধ্যে দিয়ে ভাষার সীমাবদ্ধতা কিভাবে প্রকট হয় ও একটি সমাজ কিভাবে বিকল্পতার সন্ধান করতে বাধ্য হয়। যে বাধ্যতা স্বইচ্ছার এ প্রসঙ্গে শোকের সাথে, দেহ ও মনের সম্পর্ক কি তা বোঝার চেষ্টা করেছি। শোক আমাদের ভিতরের মধ্যে যে আমি তাঁর বিপরীতে এক অপর আমিকে বসায়, যার সঙ্গে নিরন্তর কথাবার্তা চলে এবং তা নিজের আমিত্বকেই বৃহৎ করে দেয়। আসলে ফ্রয়েডের মৃত্যু সম্পর্কিত শোকের যে চিন্তা সেখানে ফ্রয়েড মনে করেন শোকের মধ্যে দিয়েই শোকের উত্তরণ সম্ভব। কবি বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন যাহাই ব্যক্তিগত তাহাই পবিত্র। এই 'ব্যক্তিগত' ও 'পবিত্রতা' এই দুটি শব্দেরই সামাজিক ও চলেয়মান ঐতিহাসিক চালচিত্র আছে, যা রাষ্ট্র, সমাজ, গোষ্ঠী এবং অপরদিকে এক বিতর্ক ভাবনার প্রতিকল্পের জন্ম দেয়। যেখানে সমূহ নয়, সমূহের শোক নয়, ব্যক্তির যে ব্যক্তিগত মনন সেখানে শোকের এক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যার বিমূর্ত প্রকাশ আছে, তার জন্ম হয়। তখন তা ব্যক্তিগত ও পবিত্রতার মধ্যে এক আন্তরিক সহাবস্থান লাভ করে। উইটগেইন্সটাইন এর মতে এখান থেকে ভাষারও জন্ম হয়।

শোক সম্পর্কে আলোচনায় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বাধ্যতামূলক ভাবে এসে পড়ে অর্থাৎ বর্ণ হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে ভারতীয় সমাজে যেভাবে মানুষের শোকের সামাজিক ইতিহাস আছে বা শোক বহিঃপ্রকাশের যে ভাষা, প্রতিধ্বনি বা প্রতিনিধিগত সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল যোগাযোগ আছে। তার ফলে শোকের সামাজিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব। যেমন কীর্তন , শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণসভা, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি। কিন্তু এই বক্তব্যের একটি অপর চিত্রও আছে যেমন - অতিমারী, দুর্ভিক্ষ, গণহত্যা তখন শোক এর পবিত্রতার যে আলঙ্করিক মাত্রা আধুনিক নাগরিক জীবন দেখতে অভ্যস্ত তা এখানে ব্যতিক্রম। এখানে মৃতদেহের বদলে লাশ, শোকের বদলে সংখ্যা, পবিত্রতার বদলে বীভৎসতা ইত্যাদি শব্দগুলি যেন এক একটি বিকল্পের প্রতিনিধি হয়ে তথাকথিত সামাজিক ইতিহাসকে মাত্রাহীন নগ্নতার সামাজিক আয়না হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরে। তখন পাবলিক, প্রাইভেট, পবিত্রতা নিয়ে যে বিতর্কগুলি আমরা করি তা যেন অতিরিক্ত পার্থক্যের কারণে চিহ্নিত করণের যে সুবিধা তা প্রায়শই অচিহ্নিত ইতিহাস হিসেবেই রয়ে যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে মৃত্যুর ইতিহাস অনুসন্ধানে শ্মশানের ইতিহাসও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচনা করেছি। বিশেষত সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে শ্মশানের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ভাবে তাৎপর্য বহনকারী। আলোচ্য অধ্যায়ে শ্মশানের ইতিহাসকে দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি। একটি হল শ্মশানের সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক দিক, অন্যটি হল শ্মশান সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস। সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক দিকটিতে দেখিয়েছি শ্মশানের স্থাপত্য, শ্মশানের ভৌগোলিক অবস্থান ও শ্মশান সম্পর্কিত বিভিন্ন জড় উপাদান কিভাবে শ্মশান ব্যবস্থাটির সাংস্কৃতিক চিহ্ন বহন করছে। এই প্রসঙ্গে শ্মশান সংলগ্ন কালী মন্দির বা শ্মশানকালীর কিভাবে সাংস্কৃতিক বর্গে ধর্মীয় চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটছে তা আলোচনা করেছি। অপরদিকে প্রাচীন হিন্দু

রীতিতে শ্মশানের যে সামাজিক, দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় দিক আছে তা আলোচনা করেছি। বর্তমানে প্রচলিত শবদাহের রীতিনীতির সঙ্গে প্রাচীন সমাজের শবদাহের রীতিনীতির বিস্তর তফাৎ লক্ষ করা যায়। বর্তমানে শবদাহের জন্য নির্মিত বৈদ্যুতিক চুল্লি বা বাঁধানো ঘাট ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে সুনির্দিষ্ট করে শ্মশান হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও প্রাচীন যুগে শ্মশান সম্পর্কে এই রকম ধারণা গড়ে ওঠেনি বলা চলে। শ্মশানের স্থান নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে শ্মশান সবসময় হবে গ্রামের উত্তরপ্রান্তে এবং তার জমির ঢাল হতে হবে দক্ষিণ দিকে। স্থান নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তার আশেপাশে নদী কিমবা জলাশয়ের উপস্থিতি থাকে। আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন শ্মশান ঘাটগুলির ইতিহাস মূলত কাশীশ্বর মিত্র শ্মশান ঘাট, নিমতলা শ্মশান ঘাট ও কেওড়াতলা মহাশ্মশানের ইতিহাস আলোচনা করেছি। এই ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের বিশেষত মধ্য উনিশ শতকে তাদের যে নব্য আধুনিকতার বর্গে দূষণ-রোগজীবাণু, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সপর্কে যে ধারণা গড়ে উঠছিল তার সঙ্গে ভারতীয় শ্মশান ব্যবস্থার যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তার বিরোধ লেগেছিল। এই আলোচনার বর্গে ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ধর্মীয় চেতনার ধারণাটিকে ধরতে পারেনি। তার বদলে ভারতীয় শ্মশান সম্পর্কে তাদের এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। বাংলার স্যানিটারি কমিশনের সভাপতি জন স্ট্রাচি ১৮৬৪ সালে ৫ ই মার্চ লেখেন, যে নদী কলিকাতার অধিকাংশ লোককে পানের ও রন্ধন ইত্যাদি গৃহ কার্যের জন্য জল যোগায়। সেই নদীর জলে প্রতি বছর পাঁচ হাজারের উপর মানুষের মৃতদেহ নিক্ষেপ করা হয়। ১৮৭৫ সালে পোর্ট কমিশনার নালিশ করেন যে নিমতলা ঘাট থাকার জন্য তাদের রেল চলাচলের পথে বাঁধা তৈরি হচ্ছে। এই নালিশের ফলে ম্যাকিন্টস্ বার্ন কোম্পানিকে দিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে বর্তমান জায়গায় নিমতলা শ্মশান ঘাট তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি ইউরোপেও আধুনিক ক্রিমেশন পদ্ধতি নিয়ে

চর্চা শুরু হয়েছিল যার অভিঘাত ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। উন্মুক্ত অগ্নিসৎকারের বদলে ঘেরা জায়গায়, শহর থেকে দূরে, চিমনির মাধ্যমে ধোঁয়া নির্গমন ও যথেষ্ট বায়ু চলাচলের যাতে ব্যবস্থা থাকে তা সনাতন অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল। এসম্পর্কে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, সনাতন ও আধুনিক ব্যক্তি বর্গের মধ্যে যে যুক্তিতর্ক তা আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। শ্মশান ব্যবস্থাকে সরাসরি চাক্ষুষ করার জন্য হুগলী, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত শ্মশান পরিদর্শন করেছি। যেমন- হুগলীর বোড়াইচন্ডীতলা, ত্রিবেণী মহাশ্মশান; উত্তর চব্বিশ পরগণার বাদুড়িয়া শ্মশান, বসিরহাট শ্মশান; কলকাতার নিমতলা মহাশ্মশান, কেওড়াতলা মহাশ্মশান, কাশীমিত্র শ্মশান ঘাট ইত্যাদি। এইসমস্ত শ্মশান ঘাটে ঘুরে ঘুরে সেখানকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাথে যুক্ত বিভিন্ন মানুষজনের সাথে কথা বলে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। বিশেষত একটি ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। কাঠে পোড়ানোর বীভৎসতার মধ্যে দিয়ে উচ্চবর্গীয় বর্ণহিন্দুদের আধুনিক সময়ে একধরনের নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু হুগলী জেলার ত্রিবেণী মহাশ্মশানের নিম্নবর্গীয় মানুষের মধ্যে কাঠে পোড়ানোর ঝোঁক প্রবল। তার কারণ হিসেবে তারা আমায় জানিয়েছেন তাদের বিশ্বাস কাঠে পোড়ালে আত্মার মুক্তি দ্রুত হয় ও পুণ্যলাভ এতে বেশী হয়। ইতিহাসের সঙ্গে স্থান, কাল, পাত্রের যেমন যোগ আছে, তেমনই শ্মশানের ইতিহাস শ্মশান স্থান হিসেবেই বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শ্মশানে গেলে যেমন চিত্ত শুদ্ধি হয়, আবার তেমন ভয়ের সঞ্চারও করে এবং ভাষার ব্যখ্যার অতীত এমন এক অনুভূতির জন্ম দেয় যা ভবিষ্যতের চিন্তা চেতনাকে নির্দেশিত করে। উনিশ শতকের সমাজবিদরাও শ্মশান চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কালীপ্রসন্ন ঘোষ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাদের বিভিন্ন লেখায় কখনও সরাসরি কখনও পরোক্ষ ভাবে শ্মশান চিন্তার বা শ্মশানের মধ্যে দিয়ে যে দেহের অন্তিম সৎকার হয় তা তুলে

ধরেছেন। আর এই দেহের অন্তিমতাকে নিয়ে উনিশ শতকের চিন্তা চেতনার ইতিহাসে বিশেষ স্থান বা বর্গের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শ্মশানের ইতিহাস এক ধরনের ঐতিহাসিক ‘Space and histiriocity’ এর জন্ম দেয়, যা বর্ণহিন্দুর পাবলিক, প্রাইভেট শোকের সংজ্ঞাটিকে প্রতিরোধ করে। অর্থাৎ উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের কাঠামোতে বর্ণহিন্দু সমাজের যে নাগরিক চেতনা, শ্মশানের গল্প ও তার সম্পর্কিত অনুগল্প, তা সেই চেতনার পূর্ণতাকে বিচ্ছিন্ন পরিচিতির মাধ্যমে এক লৌকিক (general) বর্গ নির্মাণ করায় যা সামাজিকতার বৃত্তায়ণকেই পূর্ণতা দেয়। এই সম্পর্কে তিথি ভট্টাচার্য্য তাঁর ‘Deadly space; ghost, histories and colonial anxiety in nineenteenth century Bengal’ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, কিভাবে সুখীঘর বা প্রাইভেট স্পেস, অন্যদিকে শ্মশান ঘাট, পুরনো বাড়ি, ভৌতিক ও অতিপ্রাকৃত স্থানগুলি বিকল্প আত্মচেতনার সন্ধানের স্থান হিসেবে গড়ে উঠছে। এ প্রসঙ্গে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আপন কথা’ প্রবন্ধটি আলোচ্য আলোচনায় ব্যবহার করেছেন। আমার গবেষণার সন্দর্ভে শোক নিয়ে আমি বিস্তর আলোচনা করেছি। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের শ্মশানের ইতিহাসে যম ও চণ্ডালদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিষয় নজরে আসে যে অগ্নিসৎকারের সাথে যুক্ত মানুষদের কি শোক হয় না? ছোটবেলা থেকেই শ্মশানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এই মানুষগুলো মৃত মানুষের বালিশ, বিছানাকে বা সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেন এবং জিজ্ঞাসা করলে তারা জানান শোক করার সময় কোথায়? মৃত্যুতো অনিবার্য, অর্থাৎ শোকেরও শ্রেণী বিভাগ আছে। আর এখানেই সামাজিক ইতিহাসের সামাজিকতার বহুমাত্রিক প্রশ্নের জন্ম নেয়।

জীবিত মানুষ সব সময়েই মৃত্যুর হুমকির সম্মুখীন হয়ে থাকে। সেইজন্যই তাদের নিজেদের ভবিষ্যতে থাকার সর্বদা বর্তমান প্রয়াস। মৃত্যু মানুষকে কি অতীতচারী করে

তোলে? ভবিষ্যৎ হচ্ছে মৃত্যু ঘটার জন্য সময় আর বর্তমান হচ্ছে নিজের স্থিতি আবার অতীতের অভিজ্ঞতা বা তথ্য যা দিয়ে মৃত্যুকে বোঝা যাবে আর একইসঙ্গে এর দ্বারা ঐতিহাসিকতাও তৈরি হবে। এর দ্বারা যে চেতনা বা বোধের জন্ম হয় তাকে জীবন বলে। যা মৃত্যুর বিপরীতে নয় বরং মৃত্যুবোধকে নিয়েই মৃত্যুর সাথে যাত্রা করে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ এর দশকে মৃত্যু সম্পর্কে গবেষণা বা ইতিহাস চর্চা গুরুত্ব পায়। মূলত ফরাসি দেশেই মৃত্যু সম্পর্কে গবেষণার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফিলিপ অ্যারিস লুইস ভাবলে, ভিন্সেন্ট লুইস তাঁদের গবেষণায় মৃত্যুর ইতিহাসকে নৃতাত্ত্বিকরা কিভাবে দেখছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সামাজিক ইতিহাসে মৃত্যুর অনুসঙ্গ হিসাবে শোক, বিরহ, দুঃখ, শূন্যতা, একাকীত্ব, অমরত্ব, প্রেম ও মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়গুলি তাদের গবেষণার গুরুত্ব পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে ফরাসি দেশের অ্যানাল স্কুলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অতীত চর্চার আলোকে ইতিহাসবিদ্যার বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও মৃত্যুভাবনার সাথে সম্পর্ক কি, সেটি বোঝা খুব প্রয়োজন। সেইসঙ্গে যেটা বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন তা হল ইতিহাস হয়ে ওঠার যে বিশ্লেষণ পদ্ধতি অর্থাৎ মেথডোলজি তার রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতা ও সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে মৃত্যু, শোক, দুঃখ বা বৃহৎ অর্থে মৃত্যুকেন্দ্রিক যে সংস্কৃতি তার বয়ানের মধ্যে যে সামগ্রিকতার জ্ঞানতত্ত্ব তা কি ঐতিহাসিকতার সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করতে পারে? মৃত্যুর ইতিহাস বা ইতিহাসের মৃত্যু শুধুমাত্র কিছু মৃত্যুর পরিসংখ্যান নয়। মৃত্যুর যেমন ইতিহাস আছে, তেমনি ইতিহাসে মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা হতাশার চেতনাগুলি বিভিন্ন জড় অজড় সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। প্রথাগত ইতিহাস চর্চার যে অন্তর বয়ান তার মধ্যে দিয়ে কি ভারতীয় অতীতের তলভাগের প্রকরণগুলিকে কব্জা করা সম্ভব? প্রথাগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও

প্রকরণ বিষয় ও পদ্ধতিকে আদৌ কি স্বতন্ত্রীকরণ করতে পারে? অর্থাৎ আর্কাইভস সোর্সকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মেথডোলজি স্বয়ং বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করছে। যার ফলে অনেক সময় অতীতচর্চার মুখোশে তথ্যচর্চা ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠছে। পল ফেয়ার ব্যান্ড তাঁর 'এগেইনস্ট মেথড' বইতে পুরোপুরি যুক্তিবাদ বর্জনের কথা বলে সিদ্ধান্ত করেন যে সবরকম পরিস্থিতি ও সময়ের জন্য একটি মাত্র নীতিকে সমর্থন করা যায়- তা হল সবই চলে অর্থাৎ ইতিহাসের অতীতকে সামগ্রিকতা দিয়ে বিচার না করলে সম্পূর্ণ বিচার সম্ভব নয়। পদ্ধতি যেমন ঐতিহাসিকের চৈতন্য কালিকতার ও স্থানিকতার উপর নির্ভর করে, অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের তথ্যচয়ন ও বিন্যাসের প্রকৃতির উপর অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় প্রকৃতির উপর পদ্ধতির যৌক্তিক স্তরবিন্যাসকে অনেকাংশেই নির্ভর করতে হয়। সুতরাং পদ্ধতি চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়াটি বেশ গোলমেলে ব্যাপার। বিশেষত ভারতীয় অতীতের সম্মুখে কোন একটি বা দুটি ঐতিহাসিক কার্যকারণ তত্ত্বকে অবস্থায়িত করা বেশ যৌক্তিক ধৈর্যের ব্যাপার। ঐতিহাসিক কার্যকারণ তত্ত্বের যৌক্তিক আধার পেরিয়ে যে আকারে এই তথ্য সমগ্র আমাদের নাগালে আসে তাতে এই অধ্যায়ন সহজ থাকে না। কারণ লিখিত ভাষ্যের স্বচ্ছতা, দৈনিক কালিকতার জটিলতা ইতিহাসের তথ্য ও জ্ঞানের বয়ানের দূরত্বকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করে তোলে। এই জ্ঞান ও তথ্যের প্রেক্ষাপটেই ইতিহাস চর্চার সীমাবদ্ধতার ধারণাটি আরো স্পষ্ট হয়। ঐতিহাসিকতার মধ্যে যে মানুষের ইতিহাস সন্ধান করা হয় সেই মানুষকেও মানুষ হয়ে উঠতে হয়। আর এই হয়ে ওঠা মানুষের পরিণতি হল মৃত্যু। তাকে আমরা সব সময় কার্যকারণ তত্ত্বের মধ্যে ধরতে পারবো না। অ্যারিস্টটল তাঁর 'মেটাফিজিকস' গ্রন্থে সীমাবদ্ধতা বা লিমিটেডের ধারণাটি সংজ্ঞায়িত করেছেন তা হল- 'The

first thing outside which there is nothing to be found and the first thing inside which is to be found which everything is to be found.'[8] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক শুধুমাত্র যৌক্তিক কার্যকারণ তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে মানব সভ্যতার অতীন্দ্রিয় ভাব বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানতত্ত্বের বহুমাত্রিক বোধকে পাঠ করা কি সম্ভব? ঐতিহাসিক চিন্তার এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ভিটগেইনস্টাইনের অবস্থানটিও খুব যৌক্তিক, সেটি হল – 'We should have to find both side of the limit thinkable, we should have to be able to think what cannot be thought.' সুতরাং কাঠামোগত ইতিহাস চর্চায় যে রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানার তথ্যের যৌক্তিক বিন্যাসের যে পরিসর তার প্রকল্পটিকে রাষ্ট্র নির্মিত যুক্তির বয়ানের বাইরে সন্ধান করতে হবে। মূলত রাষ্ট্রীয় চেতনার মধ্যে আসলে ইতিহাসচর্চার তাত্ত্বিক কার্যকারণ পদ্ধতির অবস্থান আর অতীতের অবস্থান এর মধ্যে বিরোধ আছে। যেসব তথ্যসূত্রের মাধ্যমে ইতিহাস অতীতকে কব্জা করতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। দার্শনিক ইস্টাভান ক্লিয়ারলিভ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ডেথ এন্ড হিস্ট্রি'-তে বলেছেন- 'It also become a question whether the historical research update may have some kind of the thematic as well as ontological and structural priviledge over historical essence of the history quality itself which is only responded by the historiological research update or more precisely by the same existence of such effort

৪ Aristotle, *Metaphysics*, translated by Christopher qas, Oxford, OUP, 1801, p.54

rather than thematised or articulated it is clear now that awquard enquiry points to two directions. First the directions of the hysteriality, hystereocality and historical problem of death and second the equaly problem directions of historiocality itself.' অর্থাৎ ইতিহাস চর্চায় মৃত্যুর ইতিহাস সন্ধান কোথাও যেন মৃত্যুবোধ ইতিহাসের অতীতকে আরো মৃত্যুর অন্তর্নিহিত শূন্যতাকে এক রৈখিক নিবিড়তায় বিদ্ধ করে। এখানে আরো একটি প্রশ্ন উঠে আসে ইতিহাসে কি সঠিকভাবে মৃত্যু চেতনা বা শূন্যতা বোধ, শোক প্রতিনিধিত্ব করে? এখানেই রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক চেতনার অবস্থানটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন – 'তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতা তাৎপর্য নির্ণয় করতে চাও তো বিপন্ন হবে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার আসে অত্যন্ত সাধারণ নিয়মে। সেটাকে অবজ্ঞা করো। আমাদের জীবনে সুতরাং সাহিত্য হয়তো কোন একটা বিশেষ বুধ বা বৃহস্পতিবার সপ্তাহ ডিঙ্গিয়ে চব্বিশ ঘন্টাকে উপেক্ষা করেই আসন রক্ষা করে। যেদিন বর্ষার অপরাহ্নে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙ্গি নৌকা বোঝাই করে মগ্ন প্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে, সেদিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজও আমার মনে আছে। সেই দিনই 'সোনার তরী' কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল আমার মনে। আর তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই। এরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল হবারই কথা। কারণ আমার মনে 'সোনার তরী'র যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে সেটা হচ্ছে সেই শ্রাবণ দিনের ইতিহাস। সেটা কোন তারিখে লিখিত হয়েছিল সেটি আকস্মিক। সেই দিনটা আমার স্মৃতিপটে কোন চিহ্ন দিয়ে যায়নি। অতএব আমার ইতিহাসে আর তোমাদের ইতিহাসে এইখানে বাদ

প্রতিবাদ হবেই; দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের হাতে দলিল আছে, আমার হাতে নেই। আদালতে তোমাদের জিদ রইল। আমার দলিলের তারিখ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে – 'শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে'। তুমি বলবে ওটা কাল্পনিক; আমি বলবো তোমাদের তারিখটা রিয়ালেস্টিক।'[৫] ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অবস্থানটি খুব স্পষ্ট একদিকে ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যু ও শোক দ্বারা জীবনের ভিত্তিভূমিকে বারে বারে তলিয়ে দেওয়া আবার অন্যদিকে শোক ও মৃত্যুর মধ্যে জীবনেরই জয় গান গেয়েছেন, যা তার ইতিহাস চিন্তাকে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী করে তুলেছে। এখানে ইতিহাস চর্চার যে মেথড তার এক বিপরীত অবস্থান রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিয়েছেন। এখানে ইতিহাসের নামে শুধুমাত্র তথ্যচর্চা নয় বরং বৃহৎ সত্যের সন্ধান করেছেন। এখানেই মৃত্যু চিন্তা, চেতনা, শোক, বিরহ, জীবন মৃত্যুর বিভিন্ন অনুভূতিগুলির পূর্ণ থেকে সম্পূর্ণতার দিকে যাত্রা করেছে। আসলে ইতিহাস শব্দটিকে ঘিরে প্রশ্নটি ঐতিহ্য ও অধুনার মোড়কে যে বিগত দুই শতকে ভারতীয় মননে সঞ্জীবিত হয়েছিল পাশ্চাত্য অভিখাতে সেই বর্গীয় সংঘাত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চিন্তায় নতুন পর্বে উত্তরণ ঘটেছিল। ইতিহাসচর্চায় যে রাষ্ট্রীয় চরিত্রের জন্য আর মহাফেজখানায় রক্ষিত তথ্যের যে আলোক প্রাপ্তির প্রসার সীমা ও রূপান্তরের ঠিক পাশেই যে ছোট আরেকটি বলয় আছে, সেখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অর্থ ভিন্ন। সেই বলয় কল্পনা ও ভাবনার অভ্যাসেই পৃথক অবয়ব পায়। কারণ দলিল দস্তাবেজে আমরা তো সেটাই খুজে পাই ঠিক যা খুঁজতে চাই। আলোক বৃত্তের পাশে ও রাষ্ট্রীয় বৃত্তের বয়ানের মধ্যেই রয়েছে বিকল্প তথ্যের আদি গল্প ঐতিহ্যের

৫ সোনার তরী কবিতার কল্পনা শ্রাবণে ও রচনা ফাল্গুনে এ সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ১৭১

পদ্ধতির চয়ন এবং নির্মাণের প্রশ্ন। স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এই অরাষ্ট্রীয় আদিকল্পের ধারণাটি তথ্যের সৃষ্টির সন্ধান করতে পারলেও তার বিন্যাসের জন্য যে যুক্তির আধার দরকার রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে তাকে চিহ্নিত করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই সন্ধিক্ষণ থেকেই ইতিহাস মৃত্যু চিন্তায় বা বলা যেতে পারে মৃত্যু হয়ে যাবার মধ্যে যে আমিত্বের শূন্যতা তৈরি হয় তা ইতিহাসের তথ্য দিয়েই কি পূরণ করা সম্ভব? এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত চিন্তার যে ত্রিকালদর্শন আছে সেখানেই না আমির পূর্ণতা পায় সঙ্গীতের সুরের মাধ্যমে।

পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিকের যে কোন ধরণের সৃজনশীল ক্রিয়াকান্ড বা কারুকৃতি প্রথমে মননে জারিত হয়, পরে প্রয়োগে সিদ্ধি পায়। তবে সৃষ্টির এই দ্বিত্ব প্রক্রিয়াতে মাঝে মাঝে চুতি বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের মধ্যের 'তথ্যের' বর্গটিকে 'অর্থের' (meaning) বর্গে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোন না কোন আদিকল্পের প্রতি এক নিষ্ঠায় ও অভ্যাসের অনুজ্ঞায় আমরা এক ছকে পরে যাই। বিষয় প্রাচুর্য বা তথ্যের সমাবেশে ছকের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু বৃত্তের ধরাবাঁধা বেষ্টনীর বাইরে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। ঔপনিবেশিক ইতিহাসের আদিকল্পের প্রস্থানের বাইরে গিয়ে মৃত্যু, শোক, দুঃখ প্রভৃতি অনুভুতিগুলিকে বুঝতে হবে। জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতা, সামাজিকতা ও ঐতিহাসিকতার মতো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মতবাদ গুলিকে কোন এক আদি অকৃত্রিম আর্কাইভস্-এর অটুট বৃত্তান্তে বোঝা বা অতলান্তে পৌঁছানো অপ্রত্যাশিত ও সম্ভব নয়। ছড়ানো ছিটনো 'অর্থ' (meaning) বর্গের এক্তিয়ারে এনে অনেক গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনুষঙ্গতা লাভ করতে পারে, এখানে ইতিহাস ও সামাজিকতা অন্তরঙ্গতা পায়। শোক ও মৃত্যুর ইতিহাস এক বৃহৎ সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্দর্শনকে নির্দেশিত ও প্রাগভিজ্ঞতায় বৃত্তায়িত করে চিন্তার গোলকায়ন ঘটায়। উপনিবেশবাদের মরণসত্ত্বার কুমতির বিরুদ্ধে মৃত্যুর শোক দুঃখ প্রভৃতি বর্গগুলি কখনো শাসিত

মানুষের কখনো জ্ঞানের মাধ্যম বা প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। মৃত্যু, শোক, দুঃখ ভারতীয় ব্যক্তিক ও সমষ্টিগত মননের অঙ্গহীন চেতনার স্পর্শ 'ছোট আমিকে' 'বড় আমির' কাছে তুলে দেয়। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার যুক্তিভূমি ও কল্পভূমির সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে শোকের রাজনীতি বিপ্লবীদের মৃত্যুবরণ ঔপনিবেশিক শাসকের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে চিহ্নিত করে তার মধ্যে দিয়ে সামাজিক ইতিহাসের দুটি বর্গ সমানুভূতি ও সহানুভূতির জন্ম দেয়। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের ঈপ্সাতে বৌদ্ধ করুণা, হিন্দু দয়া, খ্রিস্টানের কল্যাণকর দিকটি কখনো উপেক্ষা বা অপেক্ষার ছায়া অস্পষ্ট উত্তরের আধুনিক চেতনার কামনার অনুষঙ্গ লাভের অপেক্ষারত । হয়তো মৃত্যু শোক যাপনের ইতিহাসই বর্তমানের শরীরের মধ্যে দিয়ে অতীতের অপেক্ষারত চেতনারই বিশেষ বাসনার ফল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যু সম্পর্কে দেশজ ভাবনা

২.১. পটভূমিকা

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম।

শেষাস্থিরত্বামিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতপরম"

আঠারো পর্বে বিন্যস্ত হিন্দু মহাকাব্য মহাভারতের বন পর্বে যম যক্ষের রূপ ধরে এসে যুধিষ্ঠিরকে কতকগুলি অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিলেন। যা যক্ষ প্রশ্ন বা ধর্ম বক উপাখ্যান নামে খ্যাত। যক্ষের "কিমাশ্চর্য্যম"- অর্থাৎ আশ্চর্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির উপরোক্ত শ্লোক দুইটির মাধ্যমে উত্তর দেন। যার অর্থ অহরহ ভূত অর্থাৎ জীব মৃত্যুর পরে যমালয়ে গমন করছে, যারা অবশিষ্ট থাকছে তারা বিশ্বাস করছে যে তারা আজীবৎ কাল বেঁচে থাকবে, এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কি আছে?[১]

মৃত্যু হল জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। জীব ও জীবনের জন্য মৃত্যুর অপেক্ষা 'মনুষ্য' নামক জীবকে এই অন্তহীন প্রানের মাঝে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। মৃত্যু বোধের যেমন দার্শনিকতা আছে ঠিক তেমনই তার ইতিহাসও আছে। মৃত্যু একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যা শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিকতা দিয়ে বোঝা যাবে না। ভারতীয় ও পৃথিবীর অন্যান্য দর্শনে, মৃত্যুর পরের ধাপ থেকেই যাবতীয় কর্মকান্ড শুরু হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে মৃত্যুর পর মানুষকে সম্মানিত রাখার প্রক্রিয়ায় সমাধিস্থ করার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১০০,০০০ বছর আগে আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে আসা আধুনিক হোমিনিডদের মধ্যে। ইজরায়েল এর কেডুমিম এর স্খুল নামক গুহায় লাল মাটির রঙে রাঙানো মনুষ্য

---

১ Yaksha Prasna, K. Balasubramaniaiyer, Bharatiya vidya bhavan, 1989, Pg 72-73

কঙ্কাল পাওয়া যায়। সেখানে সমাধি ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম জিনিসের সাথে মৃতের বাহুতে একটি বন্য শূয়োরের চোয়াল পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক Philip Lieberman এর মতে মৃতের প্রিয় জিনিসপত্রাদির সাথে মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করার অভিপ্রায় ধর্মীয় অনুশীলনের প্রথমতম সনাক্তযোগ্য রূপ।[২] মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রথম নিয়েন্ডারথালরাই কবর দেওয়ার প্রচলন করেছিল এবং মৃতদেহকে সম্মানের সাথে অগভীর কবরস্থ করে তাতে পাথরের সরঞ্জাম ও পশুর হাড় রাখত।[৩] যদিও বেশকিছু গবেষক এই পদ্ধতিকে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবেই দেখে থাকেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সাথে সাথে শবদাহের অভ্যাসও মানব ইতিহাস জুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্বগতভাবে, নিওলিথিক যুগে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সাথে সাথে দাহ করারও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক Bowler ও তার সহ-গবেষকদের মতে ২৫ থেকে ৩০ হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার লেক মুঙ্গ-তে দাহ করা মানুষের দেহাবশেষের হদিশ পাওয়া গেছে।[৪](চিত্র-১)

---

[২] Philip Lieberman (1991). *Uniquely Human: The Evolution of Speech, Thought, and Selfless Behavior*. Harvard University Press. p. 163. ISBN 978-0-674-92183-2.

[৩] Wilford, John Noble (16 December 2013). "Neanderthals and the Dead". *The New York Times*.

[৪] Bowler, J.M. 1971. Pleistocene salinities and climatic change: Evidence from lakes and lunettes in southeastern Australia. In: Mulvaney, D.J. and Golson, J. (eds), Aboriginal Man and Environment in Australia. Canberra: Australian National University Press, pp. 47–65.

চিত্র ১: ব্রোঞ্জ যুগের একটি মৃৎশিল্প, এর ভিতরে একটি থলিতে মানব শবদাহের অংশ বিশেষ পাওয়া যায়[৫]।

আবার Kaczmarek এবং Piontek বলেছেন মৃতদেহের সংকার ব্যবস্থা হিসেবে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থা নিওলিথিক যুগ থেকে মধ্যযুগের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মধ্য ইউরোপে অধিক প্রচলিত ছিল।[৬] (চিত্র-২)

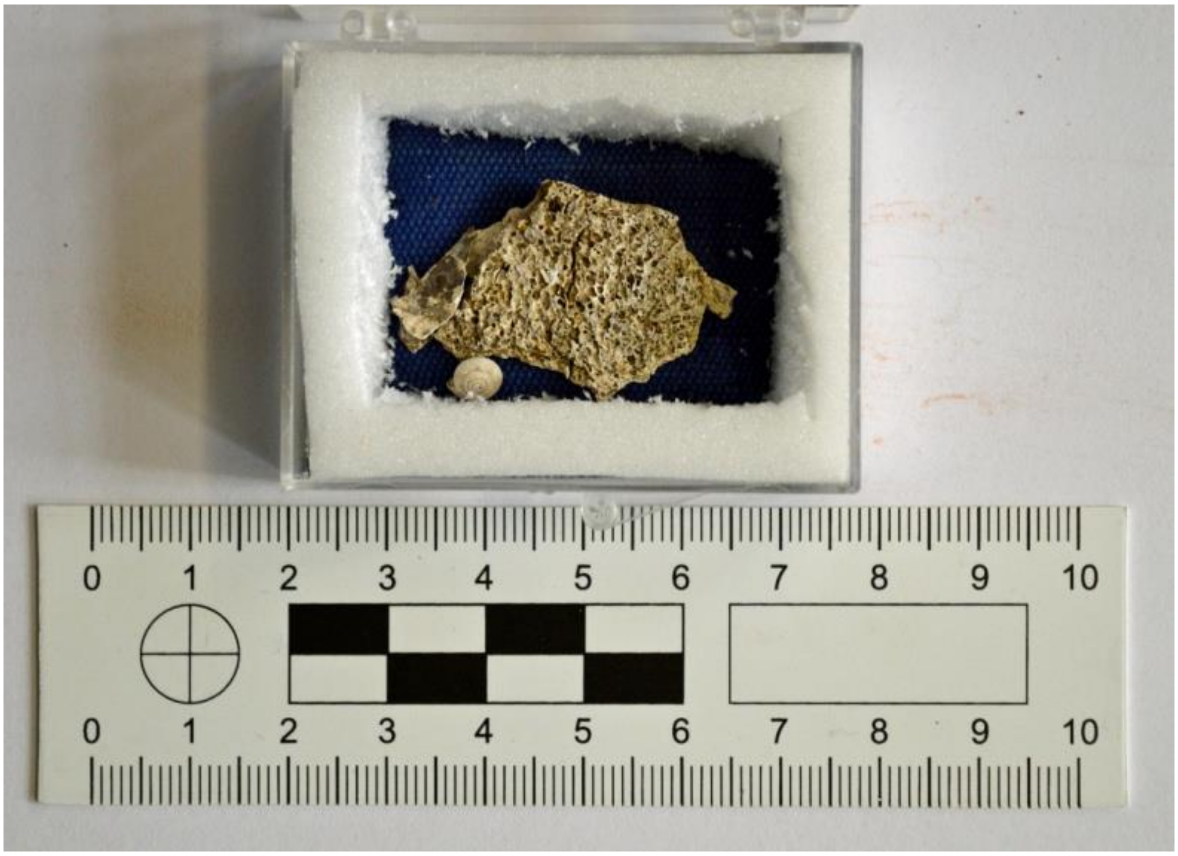

চিত্র ২: নিওলিথিক/ব্রোঞ্জ যুগের শবাধারের একই থলিতে পাওয়া মনুষ্য ও শামুকের পোড়া দেহাবশেষ[৭]

---

[৫] https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1920-1109-1, © The Trustees of the British Museum.

[৬] Kaczmarek M, Piontek J. Human cremated remains and the diversity of man. 1982. Available at: https://www.researchgate.net/publication/233752229_Human_cremated_remains_and_the_diversity_of_man. Accessed November 14, 2017.

চিত্র ৩: নিওলিথিক/ব্রোঞ্জ যুগে ইংল্যান্ডের রোডমার্টন গ্রামে পাওয়া মানুষের অগ্নিদাহ ছাব্বিশটি হাড় ও করোটির টুকরো[৮]

লৌহ যুগে মানব মৃতদেহের অগ্নিসৎকার এর দেহাবশেষের সাথে পক্ষীর দেহাবশেষ, চকমকি পাথর, কাঁচ ও মৃৎ পাত্রের টুকরো পাওয়া যায়। এগুলি মূলত পাওয়া গেছে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের King Harry Lane সমাধির কাছে।[৯] (চিত্র-৩)। মনুষ্য মৃতদেহ সমাধিস্থ করা বা দাহ করা হলেও উভয় ক্ষেত্রে প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকেই মৃতদেহের সাথে পার্থিব বস্তু, খাদ্য পানীয়, জন্তু জানোয়ার, অস্ত্র শস্ত্র

---

[৭] https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1895-0723-3-1, © The Trustees of the British Museum.

[৮] https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1873,1219.288, © The Trustees of the British Museum.

[৯] https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1976-0501-1279, © The Trustees of the British Museum.

ইত্যাদি রাখবার কারণ স্বরূপ ভাবা যেতে পারে, সে যুগের মানুষ কল্পনা করত যে মৃতের শরীরে জীবন ফিরে আসবে।

এশিয়া মহাদেশে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সাথে সাথে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম মতে মৃতদেহকে মূলত দাহ করার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। অপরদিকে ইহুদী, খ্রিস্টান এবং ইসলামিক সমাজ মৃতদেহকে দাহ করার বিপক্ষে। যদিও কিছু উদারপন্থী ইহুদী মৃতদেহ দাহ করার স্বপক্ষে। মূলত ইসরায়েলের মানুষের হলকাস্টের সময় নির্মূল শিবিরগুলির অভিজ্ঞতা থেকে তারা মৃতদেহকে দাহ করার সাথে মানসিকভাবে বিরুদ্ধাচার করে থাকে। বিশ্বের মহান ধর্ম গুলির মধ্যে হিন্দু ধর্মে মৃতদেহ উন্মুক্তভাবে দাহ করার রীতিনীতির প্রচলন আছে, যা সংস্কার নামে খ্যাত এবং এটি জীবনের ১৬ টি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি। হিন্দু ধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে এবং মনে করে দেহ বিনাশের পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে ও আত্মা পুনর্জন্ম লাভ করে। ভারতবর্ষে মৃতদেহের অগ্নিসৎকার প্রক্রিয়াটি মূলত হইয়ে থাকে উন্মুক্ত ভাবে, কাঠ দিয়ে তৈরী করা সমাধিক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়ে থাকে, দাহ করার পর মৃতদেহের অস্থি বিসর্জিত হয় গঙ্গায়। যদিও ইউরোপে আদিকাল থেকে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থা সাধারণভাবে গ্রহনযোগ্য এবং তা প্রচলিত ব্যবস্থা হলেও, খ্রিস্টান সমাজে তা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে গ্রহনযোগ্য বলে মনে করা হয়নি। তার প্রধান কারণ মৃতদেহ অগ্নিসৎকার হলে বিচার ব্যবস্থায় মৃতদেহের শবচ্ছেদ করার প্রয়োজন পড়লে তা এই ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। সেই জন্যই জার্মানীতে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল সমস্ত মৃতদেহ অগ্নিসৎকার করা হবে আর তা সম্পন্ন হওয়ার আগে মৃতদেহগুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে একটি আস্ত মৃতদেহ ভস্মীভূত করতে উন্নত মানের চুল্লির প্রয়োজন (আধুনিক চুল্লিতে অগ্নিসৎকার করতে ৫০ থেকে ৬০ মিনিট প্রয়োজন) কিন্তু প্রচলিত চুল্লিতে বা পুরনো চুল্লি ব্যবস্থায় একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা প্রয়োজন

অগ্নিসংকার করতে।[১০] ঐতিহাসিক Bass-এর মতে আগুনের ক্ষমতা আছে শক্ত মাংস, অস্থি এবং দাঁত কে ভস্মীভূত করার কিন্তু সম্পূর্ণ শরীর ভস্মীভূত করতে আধুনিক চুল্লি ব্যবস্থায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং পরিবেশগত ভাবে দূষণ মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শবদাহ হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে মৃতদেহকে অত্যাধিক তাপের মাধ্যমে (বৈদ্যুতিক চুল্লি) ভস্মীভূত করা হয় এবং পুরো প্রক্রিয়াসম্পন্ন করতে ১০৯৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। আধুনিক বিশ্বে অগ্নিসংকার ব্যবস্থা একটি বিজ্ঞানসম্মত ও ধার্মিকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়, তাই পৃথিবীতে সব থেকে অগ্নিসংকার ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা বলে মনে করে যে দেশ তার নাম হল জাপান।[১১] শুধু তাই নয় রোমানিয়াতেও অগ্নিসংকার ব্যবস্থাকে আইনগত এবং একটি বৈধ ব্যবস্থা বলে প্রচলন করা হয়েছে (Noul cod Civil (New Civil Code,2011)।[১২]

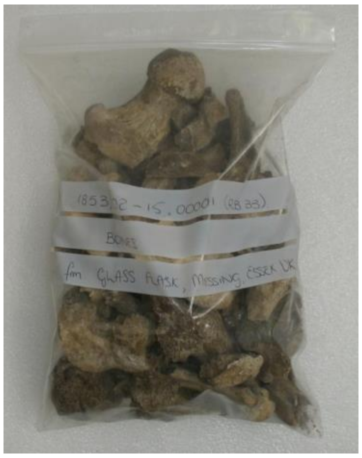

[১০] Radu. C et. al., Forensic ethical and religious issues regarding the cremation process, Rom J Leg Med 25, 432-434, 2017.

[১১] "International Cremation Statistics 2008". The Cremation Society of Great Britain, 2008. Available at: http://www.srgw.info/CremSoc4/ Stats/. Accessed November 14, 2017.

[১২] Noul cod Civil (New Civil Code), 2011. Available at: http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_civil_republicat_2011_noul_cod_civil.php. Accessed November 14, 2017.

চিত্র ৪: রোমানো-ব্রিটিশ যুগের একটি থলি বর্তি অগ্নিদাহ মনুষ্য হাড়-গোড় একটি নীলাভ সবুজ চৌকো কাঁচের বোতলে পাওয়া গেছে।[১৩]

দেশ	**অগ্নিসৎকার (শতাংশ)**
জাপান	৯৯.৮৫%
তাইওয়ান	৯২.৪৭%
ভারত	৮৫%
চীন	৪৮.৫০%
যুক্তরাজ্য	৭২.৪৪%
সুইডেন এবং ডেনমার্ক	৭০%

According to International Cremation Satistics 2008[১৪]

এখানে আলোচ্য অংশে ভারতবর্ষে অগ্নিসৎকার ও তার ইতিহাস এবং অগ্নিসৎকারের সাথে মহামারী, পরিবেশ দূষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও পরিশেষে অগ্নিসৎকারের সাথে ধর্মীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে এখানে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। ২০২০ সালে সারা বিশ্বে COVID-19-এ আক্রান্ত হয়ে

[১৩] https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1853,0215.1, © The Trustees of the British Museum.

[১৪] "International Cremation Statistics 2008". The Cremation Society of Great Britain, 2008. Available at: http://www.srgw.info/CremSoc4/ Stats/. Accessed November 14, 2017.

জনজীবন প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তখন 'লকডাউন' সময়ে জীবন মৃত্যুবোধকেই যেন অনবরত জাগিয়ে দিচ্ছে। এইরকম অতিমারিতে কাতারে কাতারে মানুষের মৃত্যু এবং সেই মৃতদেহের সৎকার করার কোনো নিয়মের বেড়াজালে বাঁধা রইলো না। সেখানে মৃতদেহ ও তার সৎকার একটি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি মৃতদেহের সৎকার শুধুমাত্র ধার্মিক বিষয় নয়, পরিবেশ ও নান্দনিকতারও বিষয়। একবিংশ শতকে করোনা আক্রান্ত মৃতদেহগুলিকে যেভাবে সমাধিস্থ ও অগ্নি সৎকার করা হয়েছে তা সত্যিই একটি বিতর্কিত বিষয়। একথা ঠিক, পৃথিবীর বহু ধর্মে শবদাহ ব্যবস্থা সার্বজনীন না হলেও আংশিকভাবে তার প্রচলন ছিল।

২.২. ভারতবর্ষে অগ্নিসৎকার ও তার ইতিহাস

মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বা পোড়ানো ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে একটি প্রধান প্রথা ও রীতি। একইসঙ্গে এটা নিরীক্ষিত যে বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখরা মৃতদেহ অগ্নিসৎকারে বিশ্বাস করে না। এমনকি বেশিরভাগ নিম্নবর্গের হিন্দুরা মৃতদেহ পোড়ানোতে বিশ্বাস করত না। উনিশ শতকীয় চিন্তাবিদরা মনে করতেন অগ্নিসৎকারের ধারণার জন্ম ভারতবর্ষে, মূলত আর্যদের আগমনের সাথে সাথে। মনে করা হয় ভারতবর্ষ থেকেই অগ্নিসৎকার প্রথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে গিয়েছিল।[১৫] যদিও এ নিয়ে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিকগতভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আদিপর্বে অগ্নিসৎকারের ব্যবস্থা ছিল না, কেন ছিল না তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত, অথবা বহুমত আছে। একথা ঠিক

[১৫] Hugo Erichsen, The cremation of dead, from aesthetic, sanitary, religious, historical, medical, and economical standpoint, Detroit, Do. Haynes, 1887, p. 39.

প্রাক্-বৈদিক পর্বে মৃতদেহকে কবর দেওয়া হত এবং তার এক ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তীকালে আর্যদের আগমনের সাথে সাথে এই ঐতিহ্যের ছায়া সমসাময়িক মৃতদেহের সৎকারের পদ্ধতিকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কবর ব্যবস্থার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ঐতিহাসিকদের বহু যুক্তি আছে এবং এই যুক্তির বেশিরভাগ আধার বা বয়ান মূলত ধার্মিক বা অতিন্দ্রীয়বাদের উপর নির্ধারিত। সে আলোচনা ক্রমানুসারে করা যাবে কিন্তু এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। তা হল কেন, কবে, কিভাবে কবর ব্যবস্থা থেকে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার প্রচলন হল এই ভারতবর্ষে? এই পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক বর্গটিকে বুঝতে হলে, সমসাময়িক সমাজে ধর্মীয় চেতনার স্তরগুলিকে আগে বুঝতে হবে, কারণ এখানে ইতিহাস চর্চার পদ্ধতিগত কাঠামোটিকে প্রচলিত ধারণা ও তার বাইরে গিয়েও প্রচলিত কার্য-কারণ পদ্ধতিকে প্রশ্ন না করলে এই রূপান্তরের সঠিক কারণ অনুধাবন করা সহজ হবে না। কেননা এখানে শুধুমাত্র ইতিহাসের ধ্রুব সত্যকে মাপকাঠির মানদণ্ড করলে উত্তর পাওয়া কঠিন হবে। কারণ মৃতদেহ সৎকার ব্যবস্থাটির যে একটি সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার দিক আছে তা মূলত মানুষের কল্প কাহিনী ও বিশ্বাসের উপর আধারিত যা আবার চোরাস্রোতের মত প্রচলিত ঐতিহাসিক ধ্রুব সত্যকে কখনও আলোকিত, কখনো বা সংশয়ের দিকে নিয়ে গেছে। হয়ত সেইজন্যই ইতিহাসের গর্ভে এক সত্যের বদলে বহু সত্যের জন্ম নেয় এবং ইতিহাস নবীন হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক K. Rebay-Salisbury[১৬]-এর মতে কবর ব্যবস্থা থেকে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থায় রূপান্তরের মধ্যে 'Belief system' কতটা প্রভাবিত হয়েছে বা করেছে তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তার মতে এই 'Belief system' সমাজেরই এক কল্পিত ধারণা, যা সমাজকেই সামাজিকতা দেয়। তার মতে এই রূপান্তরের কারণটিকে কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য করা যায় তা তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা নির্মাণের যে

---

[১৬] K. Rebay-Salisbury, Inhumation and cremation: how burial practices are linked to beliefs, K. Rebay-Salisbury, Embodied Knowledge (pp.15-26), 2012

যুক্তিকাঠামো তাকে নমনীয় করে নতুন যুক্তি নির্মান করার পথ প্রসারিত করতে হয়েছিল, তা না হলে শুধুমাত্র সামাজিক নীতিগত সিদ্ধান্ত দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক বর্গকে পরিবর্তিত করে এর একটি নব্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব ছিল না।

কবর ও অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার মধ্যে একটি সমানুপাতিক দ্বন্দ্ব আছে। কবর ব্যবস্থার মাধ্যমে মৃতদেহকে রক্ষা করার যে পদ্ধতি তাতে মৃতদেহের পুনর্জীবন সম্ভব বলে তাঁরা মনে করত। কিন্তু অপরদিকে অগ্নিসৎকারের মাধ্যমে তা সম্ভব নয় বলে তৎকালীন কবর ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি জোরালো হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে একথাও সত্যি যে এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে অর্থাৎ অগ্নিসৎকারের মাধ্যমেও আত্মার পুনর্জন্ম সম্ভব, কারণ অগ্নিসৎকারে বিশ্বাসী মানুষেরা মনে করেন আত্মা অবিনশ্বর অর্থাৎ আত্মার বিনাশ নেই। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Sorensen and Bille[১৭] প্রশ্ন তুলেছেন, কেন পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজ ব্যবস্থায় অগ্নিসৎকার ব্যবস্থাকে মৃতদেহ জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায় রূপান্তরের ব্যবস্থা হিসেবে মনে করা হয়। এখানে তারা অগ্নিকে একটি সাংস্কৃতিক চিহ্ন হিসেবে দেখতে চেয়েছেন যার অতলে আছে গভীর বিজ্ঞানবোধ।

“Fire suggests the desire to change, to speed up the passage of time, to bring all life to its conclusion, to its hereafter. In these circumstances the reverie becomes truly fascinating and dramatic; it magnifies human destiny; it links the small to the great, the hearth to the volcano, the life of a log to the life of a world. The fascinated individual hears the call of the funeral pyre. For him

[১৭] Sørensen, T. F., and M. Bille. 2008. Flames of transformation: the role of fire in cremation practices. *World Archaeology* 40, 2: 253–267.

destruction is more than a change, it is a renewal."[১৮](Bachelard 1968: 16, emphasis in the original)

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে কবর ব্যবস্থার মধ্যে যেমন প্রবলভাবে পরবর্তী জন্মান্তরের যে বিশ্বাস জড়িয়ে আছে এবং মনে করা হয় যেন কবর ব্যবস্থা ও জন্মান্তরবাদ যেন একে অপরের পরিপূরক। এখানে ধর্মীয় চেতনার যে স্তর বিন্যাস তা প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ মৃতদেহকে সংরক্ষিত করতে পারলে স্মৃতি এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই দেহে আত্মা পুনর্জন্ম পেতে পারে বলে মনে করা হয়, যা ভারতীয় দর্শনে একটি বিশেষ বর্গকে প্রতিরোধ করে, অর্থাৎ থাকা আর না থাকার ধারণা, স্মৃতি ও বিস্মৃতির ধারণা। অগ্নিসংৎকার ব্যবস্থাতেও পুনর্জন্মের ধারণা আছে কিন্তু সেখানে মনে করা হয় না যে মৃতদেহ সংরক্ষিত হলেই পুনর্জন্ম সম্ভব, কারণ এখানে দেহ ও চেতনাকে আলাদা ভাবে ভাবা হয়। অগ্নি দেহকে ভস্ম করতে পারলেও চেতনা বা আত্মা অবিনশ্বর। ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ববিদ Childe, Piggott এবং Clark[১৯,২০,২১] কবর ব্যবস্থা থেকে অগ্নিসংৎকার ব্যবস্থার রূপান্তরে 'Belief system' এর যে ভূমিকা তাদের গবেষণায় তুলে ধরেছেন ঠিক তাঁর উল্টোদিকে গবেষক Salisbury[২২] তার বিরোধিতা করেছেন। নৃতত্ত্ববিদদের মতে এই পরিবর্তনের পশ্চাতে এক ধর্মীয় দার্শনিকতা বোধও কাজ

---

[১৮] Bachelard, G. 1968. The Psychoanalysis of Fire. Boston, MA: Beacon Press, p. 7

[১৯] Childe, V. G. 1944. Progress and Archaeology. London: Watts, p. 31.

[২০] Clark, G. 1960. Archaeology and Society. Reconstructing the prehistoric past. London: Methuen, p. 11.

[২১] Piggott, S. P. 1965. Ancient Europe from the Beginnings of Agriculture to Classical Antiquity. A survey. Edinburgh: Edinburgh University Press, p. 27.

[২২] K. Rebay-Salisbury, Inhumation and cremation: how burial practices are linked to beliefs, K. Rebay-Salisbury, Embodied Knowledge (pp.15-26), 2012

করেছিল যা 'Belief system' এরই অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে মৃতদেহের অগ্নিসৎকার হবে, না কবর দেওয়া হবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসই একমাত্র যুক্তি হিসেবে ভাবা যায় না। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের মনে হয়েছে, মৃতদেহের অবস্থান, পারিবারিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা ও শহরের থেকে কবরস্থানগুলির দূরত্ব, কবর দেওয়ার পাথরের মান ইত্যাদি উপাদানগুলি প্রমাণ করে কি কারণে কেন অগ্নিসৎকারের বদলে কবর দিতে বাধ্য হয়েছিল যা শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিচার করলে ইতিহাসে অবিচার করা হবে। মৃতদেহ কেন অগ্নির মাধ্যমে সৎকার করা যেতে পারে এ প্রশ্নটি আসাও প্রাসঙ্গিক। মনে করা হয় প্রাক-ঐতিহাসিক পর্ব থেকে ধ্রূপদী যুগ পর্যন্ত অগ্নি বা আগুন একটি প্রযুক্তির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হত (Pyrotechnics)। আগুনের মাধ্যমে খাদ্য, তৈজস পত্রাদি তৈরী, ধাতব বস্তু গলানো, এছাড়া আরও অনেক কিছুতে আগুনের ব্যবহার করা হত। তৈজস দ্রব্যাদি আগুনে পোড়ানোর জন্য যে চুল্লি তৈরী করা হত, মৃতদেহ অগ্নিসৎকারে যে চুল্লির ধারণা মনে করা হয় তা এখান থেকেই এসেছিল। শিল্পায়ন এর সাথে সাথে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থারও অগ্রগতি হয়েছে। শিল্পায়নের মাধ্যমে যে স্থাপত্য বিদ্যার জন্ম নেয় তা থেকে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার যে কাঠামো ও অগ্নিসৎকারের সমাধিক্ষেত্রগুলি পরিবর্তিত ও প্রভাবিত হতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অগ্নিসৎকারের সমাধি ক্ষেত্রতে ইটের ব্যবহার ও ধোঁয়া নির্গত হবার জন্য চিমনির ব্যবহার শিল্পায়িত যুগের প্রভাবকেই প্রমাণিত করে, উদাহরণস্বরূপ The Cambridge city crematorium এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে প্রথম অগ্নিসৎকার প্রামাণ্য হিসেবে পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। ১৫০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে অধুনা পাকিস্তানে এই প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃত স্তোত্র সংকলিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদ গ্রন্থের চারটি স্তর রয়েছে। যথা: "সংহিতা", "ব্রাহ্মণ", "আরণ্যক" ও "উপনিষদ্"। "ঋগ্বেদ

সংহিতা" হল এই গ্রন্থের মূল অংশ। এই অংশে দশটি “মণ্ডল” বা খণ্ড এবং সর্বোপরি মোট ১০২৮ টি “সুক্ত” বা স্তোত্র নিয়ে সংকলিত এবং সব মিলিয়ে মোট মন্ত্রের সংখ্যা ১০,৫৫২ টি। ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলে সূক্ত ১৫ এর ১৪ তম স্তোত্র থেকে ভারতবর্ষে প্রথম অগ্নিসৎকারের ধারণার প্রমাণ মেলে।

“যেअ॑ग्निद॒ग्धा येअन॑ग्निदग्धा॒मध्ये॑ दि॒वः स्व॒धया॑ मा॒दय॑न्ते।

तेभि॑ः स्व॒राळसु॑नीतिमे॒तां य॑थाव॒शं त॒न्वं॑ कल्पयस्व ॥ १०.०१५.१”[২৩]

অর্থাৎ- “হে স্বপ্রকাশ অগ্নি! (ক) যে সকল পিতৃলোক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছেন, কিংবা যাঁহারা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ (খ) হয়েন নাই, যাহারা স্বর্গ মধ্যে স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি আমাদিগের এই সজীব দেহকে তোমার ও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর।”[24]

“(ক) মুলে “স্বরাট,” শব্দ আছে। অর্থ “স্বপ্রকাশ অগ্নি।” কিন্তু শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতার টীকাকার (শু, যজু, ১৯। ৬০) ইহার অর্থ যম করিয়াছেন এবং পণ্ডিতবর রোথও সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।”[২৪]

“(খ) মূলে “যে অগ্নিদগ্ধাঃ যে অগ্নিদগ্ধাঃ” আছে। অগ্নিদাহ প্রথা কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহা এতদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ১১ খকে যে “অগ্নি সত্ব” শব্দ আছে সায়ণ তাহার অর্থ ও অগ্নিদগ্ধ করিয়াছেন।”[২৪]

---

[২৩] https://sanskritdocuments.org/bengali/rigveda/

[২৪] https://www.ebanglalibrary.com/23684/ ঋগ্বেদ-১০।০১৫/, অনুবাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী

চিত্র ৫: একটি ১৮২০ সালের পেইন্টিং এ দেখানো হয়েছে দক্ষিণ ভারতে একটি হিন্দু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মিছিল। মৃতদেহকে সাদা কাপড়ে মুড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি নদীর কাছে, বাম দিকে প্রধান শোককারী হাঁটছে, আত্মীয় এবং বন্ধুরা রয়েছেন পিছনে[২৫]।

খ্রিষ্টধর্মের আগে প্রাচীন গ্রিসে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা ছিল। ইউরোপে মৃতদেহ সৎকারের মাধ্যম হিসেবে অগ্নিসৎকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করা হত। যদিও খ্রিস্টধর্মে শবদাহ সম্পর্কে '*New Testament*' এ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইউরোপে খ্রিস্টপূর্বে শবদাহ ব্যবস্থা চালু থাকলেও তা শুধুমাত্র ধর্মীয় মোহ বিশ্বাসের জালে আবদ্ধ থাকেনি বরং এই ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের দিকটিও প্রাচীন আমলে সামাজিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু কখনোই ধর্মীয়ভাবে আবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন গ্রিসে সক্রেটিসের আমল থেকেই অগ্নিসৎকার ব্যবস্থা ঐচ্ছিক প্রথা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, যদিও সক্রেটিস-এর কাছে সমাধি বা শবদাহ কখনোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠেনি। ইহুদীরা শবদাহের বিরোধিতা

[২৫] Museum record 2007,3005.2 © The Trustees of the British Museum.

করেছিল, কারণ হিসেবে তাদের যুক্তি ছিল, মৃতদেহের সাথে আত্মার এক বছর ধরে মিলন হয়, সেইজন্য শবদাহ কাঙ্ক্ষিত নয়। এই ধারণা থেকেই সমাধির ধারণার জন্ম বলে মনে করা হয়, যেখানে মৃতদেহ ও আত্মার মিলনের সুযোগ থাকবে[২৬]।

চিত্র ৬: The Cambridge city crematorium[২৭]

২.৩. মৃত্যু সম্পর্কীয় বিভিন্ন ভাবনা

স্বামী নিগুড়ানন্দ তাঁর 'মৃত্যু ও পরলোক' নামক গ্রন্থে হিন্দুদের মৃত্যুচিন্তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন – " কোনো হিন্দু যদি বুঝতে পারে যে তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, তাহলে আত্মীয় স্বজনদের

---

[২৬] John Jamieson, Origin of cremation, Proc. R. S. of Ed., 1817

[২৭] Photo courtsey : K. Rebay-Salisbury, Inhumation and cremation : how burial practices are linked to beliefs, K. Rebay-Salisbury, Embodied Knowledge (pp.15-26), 2012

ডেকে শেষ কথা বলবে। মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে বালুকা শয্যায় শয়ন করবে। অর্থাৎ তাঁকে মৃত্তিকায় নামানো হবে। মৃত্যুর আগে ব্রাহ্মণদের দান করে যেতে পারলে পরলোকে তাঁর ভালো হবে এই বিশ্বাসও হিন্দুদের রয়েছে। এই দান সামগ্রীর মধ্যে থাকে গরু- যে গরু তাঁকে বৈতরণী পার হতে সাহায্য করবে। যে শয্যায় তাঁর মৃত্যু হবে তাঁর তিন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তাঁর কাছে বা গৃহের অগ্নির কাছে রাখা হয়। এই সময় তাঁর মাথা রাখা হয় দক্ষিণ দিকে। কানে বেদ বা ব্রহ্মবিদ হলে আরণ্যক থেকে পাঠ করে শোনানো হয়। সাধারণ মানুষের কানে তাঁর ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী মন্ত্র উচ্চারণ করে, যেমন বাঙালিদের কানে সাধারণত জপ করা হয় 'হরে কৃষ্ণ' নাম। মৃত্যু হবার পর মুক্ত আকাশের নীচ থেকে শবদেহকে আচ্ছাদনের নীচে নিয়ে আসা হয়। এই সময় তাঁর নখ ও চুল কেটে নিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা আছে। ঋষি গৌতম এই অভিমত পোষণ করেন। অনেক সময় দেহ ব্যবচ্ছেদ করে অন্ত্র বের করে পবিত্র জলে ধুয়ে নেয়, তারপর মাখন দিয়ে এই অন্ত্রপূরণ করে। এটা করা হয় মূলত দেহ দগ্ধকরণ দ্রুত করার জন্য। মৃত ব্যক্তিকে দক্ষিণ শিয়রে শয়ন করিয়ে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তাঁর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয় এক ধরণের সুগন্ধ ফুলের মালা। মৃতকে নববস্ত্র পরিধান করানো হয়। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র পরানো হয় পুত্রকে, শিশুকে অথবা স্ত্রীকে। এই কাপড় যতদিন টিকে থাকবে ততদিন তা পরতে হয়। কোথাও কোথাও মৃতের বস্ত্রের এক টুকরো সংরক্ষণ করে রাখা হয়। যদি মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে কোনো পশু বলি দিয়ে দেবতার তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করতেন তবে তার জন্য তিনটি ছাগল বলি দেওয়া হয়। শবযাত্রার অগ্রভাগে মশাল হাতে থাকে এক ব্যক্তি। এই মশাল গৃহের চুল্লি থেকে ধরানো হয়। তাঁর পিছনে পিছনে চিতাগ্নি জ্বালানোর জন্যে আগুন নিয়ে আসে অন্যেরা। তাঁর সঙ্গে থাকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অন্যান্য জিনিসপত্র। মৃতদেহ তোলার সময় ধ্বনি দেওয়া হয় 'পুষ্ণ তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যান'। রাস্তার এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ পার হলে একটি ছাগলকে বলি দেওয়া হয় কিম্বা খই ছিটানো হয়। এই খই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দক্ষিণ

দিকে ছুঁড়ে দেয়। তরুণ শবযাত্রীরা তিনবার দক্ষিণ দিক থেকে বামদিকে মৃতদেহ প্রদক্ষিন করে। .... মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় ধর্ম সঙ্গীত গাওয়া হয়। শ্মশানে এসে পৌছানোমাত্র মাধান্ডিনরা একচাপড়া ভাত পুঁতে দেয়। আর এক চাপড়া ভাত বাতাসেও ছুঁড়ে দেওয়া হয়, আর এক থোকা ভাত গুঁজে দেওয়া হয় মৃতের হাতে।"[২৮] হিন্দু শাস্ত্রে মৃতদেহ সৎকারে নানান পদ্ধতি, আচার, সংস্কার, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেনীবিন্যাসে তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। একথা ঠিক হিন্দুদের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা হিসাবে কোনো একটি মাত্র রীতি বা চল ছিল না। হিন্দু শব্দের অর্থ যেমন ব্যাপক, তাঁর মৃত্যু চিন্তাও অনুরূপভাবে ব্যাপক। সেই মৃত্যু সম্পর্কীয় বিভিন্ন ভাবনার বিষয়গুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

২.৩.১. পরিবেশ ভাবনায় অগ্নিসৎকার

এবার পরিবেশের প্রসঙ্গে আসা যাক, পরিবেশের সাথে অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ ও নান্দনিকতার সাথে শবদাহ ব্যবস্থার সম্পর্ক সাম্প্রতিকতম নয় বরং বহু প্রাচীন। ঐতিহাসিকদের মতে শবদাহ ব্যবস্থার সাথে কাঠের প্রাচুর্যতা বা লভ্যতাও সম্পর্কযুক্ত। ঐতিহাসিক William Eassie–এর মতে, "Possibly they might have burned their dead also - as in nearly all originally well- wooded countries- If they had been possessed of fuel"[২৯]. অর্থাৎ সংস্কার শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয় নয়, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক বিষয়েরও অঙ্গ। সাম্প্রতিককালে covid-19 আক্রান্ত পৃথিবীতে যেখানে মৃতদেহের সৎকার কিভাবে হবে তাই নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে, সেখানে বিশেষত সংক্রামিত মৃতদেহ পোড়ানো হবে, না সমাধিস্থ করা হবে তা নিয়ে একটি ধর্মীয় বিতর্কেরও সৃষ্টি

---

[২৮] নিগূঢ়ানন্দ, মৃত্যু ও পরলোক, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২৫-২৬

[২৯] William Eassie, Cremation of the dead, its history and bearings upon public health, C.E., London, Smith, Elder & Co., 15 Waterloo place, 1875, p 5

করেছে। যেমন শ্রীলঙ্কায় মুসলমানদের কবর দেওয়ার বদলে পোড়ানো হয়েছে বলে মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।[৩০] যদিও ইতিহাসে আমরা অন্য সাক্ষ্য পাই। সংক্রামিত মৃতদেহকে দাহ করার পক্ষেই সওয়াল করেছিলেন বিখ্যাত কবি হোমার। তিনি বলেছেন- "When Homer hinted that the frequency of the kindling of the funeral pyres was owing to the contagion sent by Apollo he alluded to the practice"[৩১]. ইউরোপে প্লেগ মহামারীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে সমাধি ব্যবস্থার কারণেই প্লেগ আরো বেশী করে ছড়িয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক Bianchi জানাচ্ছেন (১৮২৮ সালে) ৩০০ বছর আগের প্লেগাক্রান্ত মৃতদেহের কবর খোঁড়ার ফলে ইতালির Modena শহরে নতুন করে প্লেগ রোগ মহামারীর আকার নিয়েছিল।[৩২]

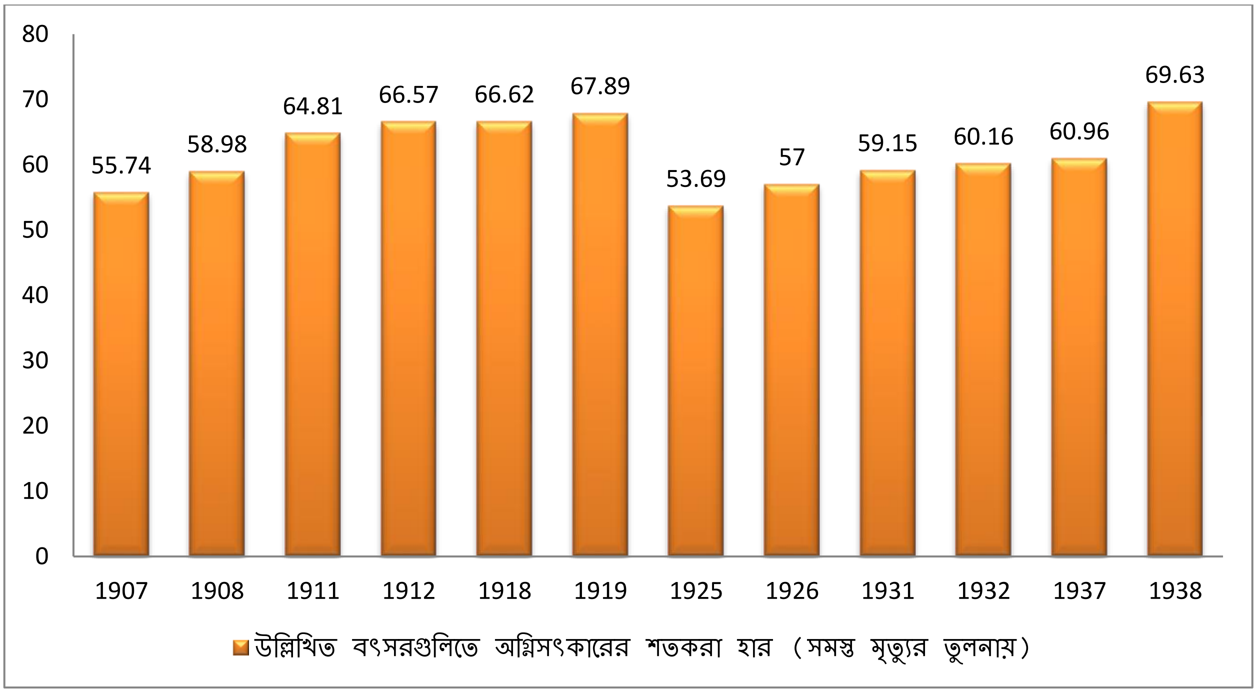

---

৩০ The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Saturday April 11th, 2020

৩১ William Eassie, Cremation of the dead, its history and bearings upon public health, C.E., London, Smith, Elder & Co., 15 Waterloo place, 1875, p 6

৩২ Bianchi, Glasgo, On the cause of some epidemics, 1874, p. 21

চিত্র ৭: প্লেগ মহামারীর সময়ের মৃতদেহের অগ্নিসৎকার, বোম্বে, ১৮৯৭।[৩৩]

একথা মনে করা যেতে পারে মৃতদেহের দাহ করার ভাবনার মূল উৎস হলো স্বাস্থ্যসংক্রান্ত চিন্তা। এখানে ধর্মীয় শিরোনামের যতটা না প্রয়োজন তার চেয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের বাস্তবিক ভাবনার প্রয়োজন বেশি। ফলত ইউরোপীয়রা শবদাহকে ধর্মহীন প্রথা বা পদ্ধতি হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু একথা সত্য যে অগ্নিসৎকার প্রথা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গভীর শিকড় থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের কাছে তা কখনোই যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়নি। তাদের প্রশ্নটা যতটা না ঐতিহাসিক তার

[৩৩] Burning issues: Cremation and incineration in Modern India, David Arnold, NTM, 2016 Dec: 24(4): 393-419. doi: https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00048-017-0158-7

চেয়ে বেশি ধর্মীয়। উনিশ শতকে 'হিন্দু অগ্নিসৎকার প্রথা' ব্রিটিশদের কাছে একটি 'ভৌতিক ' ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। ১৮৭০ পর্যন্ত শবদাহ ব্যবস্থা পশ্চিমের সভ্যতাগুলির কাছে একটি জঘন্য ও অমানবিক ক্রিয়া-কলাপ হিসেবে দেখা হয়েছে। শব দাহ সম্পর্কে এই ধারণা তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে আসলে সতীদাহ সম্পর্কে তাদের তীব্র প্রতিক্রিয়া যা সাধারণ শবদাহ সংস্কারকেই ইউরোপীয়রা ভয়ঙ্কর ও জঘন্য বলে মনে করেছেন।

চিত্র ৮: 'Widow Burning in India'[৩৪] (Illustration by the Wesleyan Missionary Society (a public domain image downloaded 2020)

[৩৪] Illustration by the Wesleyan Missionary Society (a public domain image, https://archive.org/downloads/wesleyanjuvenil08socigoog/wesleyanjuvenil08socigoog.pdf)

১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত বহুকাল ব্রিটিশরা এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেকে ও নানা সমিতি এই সংক্রান্ত ব্যাপারে যুক্ত ছিল। মূলত অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিমের ব্যক্তিবর্গ চিন্তাবিদরা সরাসরি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে লাগলো[৩৫]। ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতা ছাড়াও ইউরোপীয়রা শবদাহকে অস্বাস্থ্যকর ও দূষণ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। ১৮৫৯ সালে বেঙ্গল ইন্সপেক্টর জেনারেল Frederic J. Mouat শ্মশান ঘাট থেকে নির্গত ধোঁয়ার গন্ধ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন, "nauseous and disgusting to the last degree"[৩৬]. ১৮৬০ সালের আগে হিন্দু অগ্নিসৎকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল না। যার ফলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে নদীর পাড়ে বা সমুদ্রের ধারে শ্মশান ঘাট গড়ে উঠেছিল। শ্মশানের নিয়মাবলী দেশীয়ভাবে পালিত হত। হিন্দু অগ্নিসৎকার প্রথার বা সংস্কারের অন্যতম উপাদান হল কাঠ, আর এই কাঠের আগুনে পোড়ানোর ফলে তার থেকে ধোঁয়া নির্গত হওয়া নিয়ে ব্রিটিশদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক ছিল। তাছাড়া আধপোড়া কাঠ, অর্ধ-পোড়া মৃত দেহ, মৃতের জিনিসপত্র শ্মশানঘাট এলাকাকে দূষিত করে। যার ফলে শেয়াল, শকুনের আগমন ও তাদের টানাহেঁছড়াতে এলাকার পরিবেশ জঘন্য রকম হয়ে ওঠে। তার জন্য অগ্নিসৎকার ব্যবস্থাকে মৃতদেহ সৎকার ব্যবস্থার মধ্যে নিকৃষ্টতম বলে তাদের মনে হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ মহামারীর সময় মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেত কিন্তু কাঠ ও সৎকারের ক্রিয়াকলাপ সামগ্রীর জোগান কমে যাওয়ার ফলে তার দামও বৃদ্ধি পেত, যার ফলে অনেক গরিব নিম্নবর্গের হিন্দুরা শ্মশানে সৎকার না করে মৃতদেহ ফেলে রেখে চলে যেত।[৩৭] এইসমস্ত নানা কারণে হিন্দু শবদাহ প্রথা ব্রিটিশদের কাছে প্রযুক্তি, আইন ও নীতিগত ভাবে অপমানজনক মনে

[৩৫] Eliza Fay, Original Letters from India (1779-1815) London : Hogarth Press, 1925.

[৩৬] Indian official Records (British Library London, Bengal Judicial(Jails), nos. 2-4, 11 August. 1815.

[৩৭] First Annual Report of the Sanitary Commission for Bengal 1864-1865. Calcutta Military Orphan press.

হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন অবসান ঘটার পর ব্রিটিশ রাজতন্ত্র শাসনভারের দায়িত্ব নিলে তখন প্রাদেশিক শাসক ও কেন্দ্রীয় শাসন নতুনভাবে গঠিত পৌরসভার মাধ্যমে হিন্দু ক্রিমেশন ঘাটগুলিকে শহরের মূল কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কলকাতা ও বোম্বে শহরের এই ব্যবস্থা প্রথমেই লাগু হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উন্মুক্তভাবে শবদাহ করা যাবে না বলে নির্দেশাবলী তৈরি করা হয়। শবদাহ করার ঘাটগুলিকে কংক্রিটের মাধ্যমে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করা হল যাতে বাইরে থেকে মৃতদেহ সৎকার দেখা না যায়। প্রত্যেক শ্মশানঘাটে যাতে প্রচুর পরিমাণে কাঠ থাকে, যাতে কোন মৃতদেহ অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়ে না থাকে সেই ব্যবস্থা করা হল। শ্মশান ঘাটে মৃতদেহ গণনার ব্যবস্থা করা হল যাতে মৃত্যুহারের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।[৩৮] Sir Cecil Beadon-এর আদেশে কলকাতায় আধুনিক চুল্লি গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে অর্ধ পোড়া মৃতদেহ ও অপরিচ্ছন্ন শবদাহ ঘাটে পড়ে না থাকে। তখনো শহরের মধ্যে আগুনে মৃতদেহ পোড়ানো নিষিদ্ধ হয়নি, কিন্তু অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ নদীতে ফেলা নিষিদ্ধ হয়েছিল। Sir Cecil Beadon-এর নির্দেশ ছিল সমস্ত মৃতদেহ শহর থেকে দূরে সৎকার করতে হবে, উন্মুক্তভাবে মৃতদেহ সৎকার করা যাবে না।[৩৯] এরপরই Municipality এর তরফ থেকে চুল্লি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হল হুগলি নদীর তীরবর্তী প্রাচীন শবদাহ ঘাটে। হিন্দু সমাজ প্রাথমিকভাবে এই চুল্লি ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিল কিন্তু যখন বুঝতে পেরেছিল এটা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করবে না, তখন তারা এই

---

[৩৮] Hugh Conybeare, Report on the sanitary state and sanitary requirements of Bombay. Bombay; Education Society Press, 1855.

[৩৯] Sir Cecil Beadon (১৮১৬-১৮৮১) ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রশাশক ছিলেন।১৮৬২-১৮৬৬ সাল পর্যন্ত বাংলার(প্রেসিডেন্সি)লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই কলিকাতায় কুলিন প্রথার সংস্কার, পৌরপ্রতিষ্ঠানের উন্নতি, ন্যায় বিচার ব্যবস্থাকে সাধারনের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট ছিলেন (Alex Reid, Life story of Cecil Beadon, www.livesretold.co.uk)।

পদ্ধতিকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাও যে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছিল তা হলফ করে বলা যাবে না। তবে এই ব্যবস্থায় মৃতদেহ সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হত এবং লম্বা চিমনির সাহায্যে ধোঁয়া বাইরে নির্গত হত।[৪০] "'বায়ুর সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ', নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "আবর্জনা পুড়াইয়া ফেলিলে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ইতিপূর্বে কলিকাতায় আবর্জনা পোড়াইবার জন্য একটি কল স্থাপিত হইয়াছিল। এই কলের নাম 'ইনসিনারেটর'। এই কলের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল। অধুনা কলের দ্বারা কলিকাতার আবর্জনা পোড়ানো হয় না, কিন্তু যাহাতে পুনরায় এই কার্যের জন্য কলের ব্যবস্থা হয় তদ্বিষয়ে Municipality চেষ্টা করিতেছেন"।[৪১] বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ হিসাব করে দেখিয়েছেন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মৃতদেহ ৩ ঘণ্টার মধ্যে সৎকার করতে ৪০০ পাউন্ড কাঠ দরকার যার দাম ৬ টাকা। বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর মতে, যদি একটি পূর্ণবয়স্ক মৃতদেহের সৎকার কার্যে ৪০০ পাউন্ড কাঠের প্রয়োজন হয় তাহলে ১৮১৭ সালে বোম্বেতে ২২,৮১৮ জন সৎকার করতে বিপুল পরিমাণ কাঠের ব্যবহার হয়েছিল। ১৯১৭-১৮ সালে কলকাতায় ১৫,৪৮৯ জনের সৎকার করতে ২,৮০০ টন কাঠের ব্যবহার হয়েছিল।[৪২]

---

[৪০] Cremation in iron, January 3rd, July 13th ,1874.

[৪১] 'বায়ুর সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ', http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/jspui/bitstream/10689/17392/5/Chapter%202_51-98p.pdf পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭।

[৪২] Birendra Nath Ghosh, *A Treatise on Hygiene and Public Health*. 7th ed. Calcutta: Scientific Publishing, 1930, p. 32.

চিত্র ৯:[৪৩] 1898 সালে, গঙ্গা যাত্রীদের জন্য একটি নতুন আশ্রয় গিরিশ চন্দ্র বসু পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, যিনি নিমতলা এলাকায় ব্যবসা করতেন।[৪৪]

---

৪৩ http://thegangeswalk.com/nimtala-burning-ghat/. Free Access.

৪৪ রাধারমণ মিত্র, *কলিকাতা দর্পণ*, প্রথম খণ্ড, সুবর্ণরেখা, শান্তিনিকেতন, পৃ. ২৩

চিত্র ১০: মূল বর্ণনা: "Nimtolla burning ghat where Hindus burn the bodies of their dead and commit the remains to the Hooghly river. Several funeral pyres still burn while abandoned baby in foregroud awaits burning." [৪৫]

[৪৫] https://en.wikipedia.org/wiki/Nimtala_Crematorium#/media/File:Nimtala_burning_ghat,_Calcutta_in_1945.jpg (public domain)

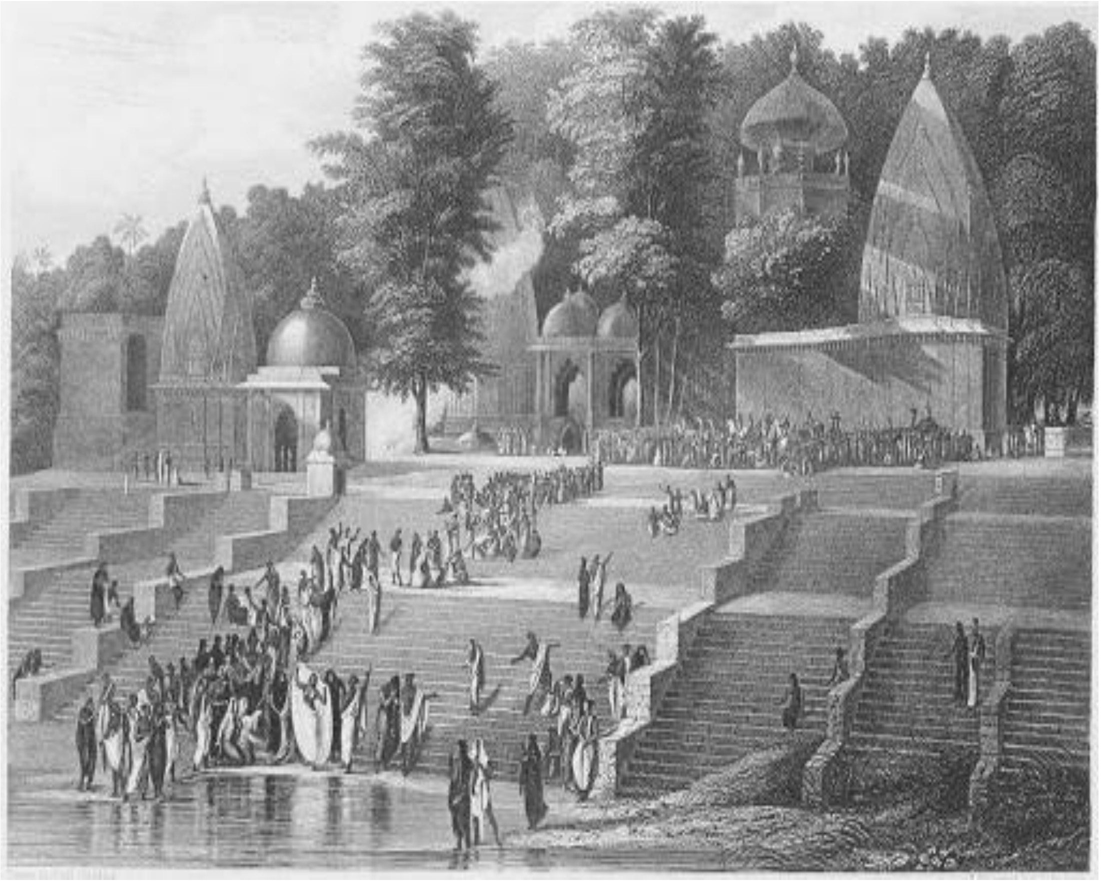

চিত্র ১১: প্রাচীন নিমতলা শবদাহ স্নানের ঘাটের একটি পুরনো খোদাই।[৪৬]

আসলে, মূল প্রশ্নটি হল অগ্নিসৎকার কীভাবে হবে? উন্মুক্ত পোড়ানোর ফলে উদ্ভুত বিভিন্ন গ্যাস পরিবেশে মিশে যায়। কাঠের সাথে দেহ পোড়ানোর ফলে মূলত কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। সেলুলোজ জাতীয় পদার্থগুলি পুড়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে এবং প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থেকে তৈরি হয় সালফার ডাই-অক্সাইড। উন্মুক্ত পোড়ানোর ফলে অক্সিজেন প্রবাহ বেশি থাকে এবং উক্ত গ্যাসগুলি সর্বোচ্চ অক্সাইড তৈরি করে। একদিকে পাশ্চত্য ধারণায় অগ্নিসৎকার আরো প্রবলভাবে গ্রহণ-বর্জন চলছে, উল্টোদিকে হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীও ধর্মে হাত পড়েছে বলে চিৎকার করতে

[৪৬] http://thegangeswalk.com/nimtala-burning-ghat/. Free Access.

শুরু করেছিল। এইখানেই ঔপনিবেশিক শাসকদের, 'Scientific Cremation' বক্তব্যটি আরও যুক্তিযুক্তভাবে বৈধতা পায়। এই সায়েন্টিফিক ক্রিমেশান এর মধ্যে স্যানিটারি উন্নতিকরণের ধারণাটিও অন্তর্ভুক্ত।

২.৩.২. বৈজ্ঞানিক ভিত্তির নিরিখে অগ্নিসৎকার

পাশ্চাত্যে যে বিষয়টি প্রায়ই আলোচিত হয়েছে তা হল, শবদাহ প্রথা অনেক কম জায়গা নেয়। প্রযুক্তিগতভাবে ও বৈজ্ঞানিকভাবে যদি শবদাহ করা যায় তাহলে শবদাহ কবর ব্যবস্থার চেয়ে ভালো। কিন্তু ঐতিহাসিকরা প্রশ্ন তুলেছেন যে, ভারতীয় শবদাহ ব্যবস্থা প্রাসঙ্গিক হলেও তা প্রশ্নাতীত নয় কারণ এই ব্যবস্থায় দূষণ বৃদ্ধি করে যা কবর ব্যবস্থায় করে না।[৪৭] সাধারণভাবে শবদাহ ব্যবস্থা নিয়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রাথমিক ভাবে নেতিবাচক মনোভাব থাকলেও পরবর্তী কালে তা কিছুটা সংশোধিত হয়েছিল। শবদাহ আর সমাহিত করা নিয়ে ইউরোপীয়দের মধ্যে বিতর্ক ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে সেই বিতর্ক দার্শনিক বিতর্কের বদলে সংস্কার-কুসংস্কারের বিতর্কে পরিণত হয়েছিল। পরাধীন ভারতবর্ষে শবদাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে এমন বিতর্ক চলছে তখন ইউরোপীযারা এই ব্যবস্থার পক্ষে সমর্থন জানিয়ে ছিল। তার কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে হিন্দুরা এই ব্যবস্থার পক্ষে ছিল এবং প্রবল সমালোচনার সম্মুখেও তারা "শবদাহ " ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করছিল। তাদের প্রাথমিকভাবে শবদাহের স্বপক্ষের যুক্তির কারণ যতটা না ধর্মীয় তার থেকে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত দিকটি তাদের বেশি ভাবিয়েছিল। আসলে সময়ের সাথে সাথে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অবস্থান

[৪৭] Justin Rowlatt, India’s Dying Mother. BBC World News, 2016. URL: www.bbc.co.uk/programmes/n3ct0bx7 (last accessed: 12.05.2016). Jadavpur University digital library.

পাল্টাচ্ছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে শবদাহ ব্যবস্থার স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশে প্রভাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। সমসাময়িক পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনার মধ্যে বিশেষত বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার মধ্যে 'miasmatic poison' , 'epidemic contagion' এর ধারনার উদ্ভব হওয়ায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যাবস্থায় তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে কর্তা ব্যক্তিদের অভিযোগ ছিল যে ভারতে সমাধিগুলো অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। এই সমাধিগুলো বিভিন্ন প্রকার ছোঁয়াচে জীবাণুর বংশ বিস্তারের কারণ। বরং শবদাহ ব্যবস্থাকে যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পন্ন করা যায় তাহলে মৃতদেহ থেকে নিঃসৃত হওয়া জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব।[৪৮] ১৮৮০ থেকে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট, (ভারতবর্ষের প্রথমসারির মেডিক্যাল জার্নাল) বিজ্ঞানসম্মতভাবে 'শবদাহের' পক্ষে প্রচার শুরু করেছিল। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল জার্নাল-এর মূল বক্তব্য হল, ব্রিটিশদের আগমনের আগে থেকেই ভারতবর্ষে শবদাহ ব্যবস্থা সফলভাবেই কার্যকর ছিল। এমনকি ব্রিটেনে বা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শবদাহ ব্যবস্থা প্রচার বা জনভিত্তি গড়ে ওঠার আগেই ভারতবর্ষে শবদাহ ব্যবস্থার সংস্কার শুরু হয়েছিল। সুতরাং শবদাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে অতি উৎসাহ বা বৈধতা কোনোটাই দেখানোর প্রয়োজন নেই। যদিও জার্নাল কর্তৃপক্ষ শবদাহ ব্যবস্থার প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করেছিল। ১৮৯৪ সালে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে 'শবদাহ' ব্যবস্থার স্বপক্ষে আরো জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছিল। পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর, ও পরিবেশগতভাবে শবদাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত আধুনিক উন্নত ব্যবস্থা বলে তারা মনে করেছিল। তাদের যুক্তি হল 'সমাধি' ব্যবস্থার ফলে মৃতদেহ থেকে নিঃসৃত জীবাণু মাটি, জল, এবং বাতাসকে সহজেই দূষিত করে এবং তা সহজেই মহামারীর আকার নিতে পারে। একমাত্র শবদাহ ব্যবস্থার মাধ্যমেই "রোগজীবাণুর পূর্ণ মৃত্যু" সম্ভব। শবদাহ হলো দ্রুত,

[৪৮] John C Douglas, Inhumation in Indian Towns. Madras Quarterly Journal of Medical Science, 1867: (12) pp 24–31.

সহজ এবং কার্যকরী ব্যবস্থা। শুধুমাত্র তাই নয় এই প্রক্রিয়ায় মৃতদেহের সৎকারের অবশিষ্ট ছাই ও জীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা কম থাকে।

চিত্র ১২: Crematorium Simmering, Vienna[৪৯]

সাম্প্রতিক কালের প্রাবন্ধিক জয়তী রাহা লিখছেন "এ দেশে কর্মসূত্রে আসা ইউরোপীয়রা মারা গেলে, খরচ এবং প্রযুক্তির নিরিখে তাদের দেশে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা শুরু হওয়ায় তাদের মৃতদেহ দাহ করে সৎকারের মাধ্যমে ভস্ম নিয়ে যাওয়া সহজ হত। ঔপনিবেশিক সময়ে বাঙ্গালী, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম এবং কিছু ক্ষেত্রে পারসিরাও এভাবে সৎকার করতেন। খ্রিস্টান ব্যুরিয়াল বোর্ড এর সদস্য রণজয় বসুর মতে, সেই সময়ে প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের মতো অসুখে মৃত একই খ্রিস্টান পরিবারের একাধিক সদস্য মারা গেলে সমাধিস্থ করার খরচ এবং জায়গা বাঁচাতে এই

---

[৪৯] Photo courtsey : K. Rebay-Salisbury, Inhumation and cremation : how burial practices are linked to beliefs, K. Rebay-Salisbury, Embodied Knowledge (pp.15-26), 2012

পদ্ধতি নেওয়া হতো"।[৫০] উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থা শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের প্রথা ছিল না, অন্য সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। এই প্রথার যে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল তা পাশ্চাত্য সমাজ অস্বীকার বা বর্জন কোনোটাই করতে পারে নি। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসকরা অগ্নিসৎকার ব্যবস্থাকে কিভাবে আরও আধুনিক করা যায় তা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছিল। জয়তী রাহা আরও জানাচ্ছেন "গ্যাসের তাপে" শবদাহ হত এ শহরে। তাও খ্রিষ্টানদের জন্য। ১১৬ বছর আগে কলকাতা পুরসভার তৈরি সেই 'গ্যাস ক্রীমেটোরিয়াল' ছিল সম্ভবত এশিয়ার মধ্যে প্রথম। লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিস্থলের বয়স তখন মাত্র ৬৩। সালটা ছিল ১৯০৩, খ্রিস্টান সোসাইটি পরামর্শ মেনে এই সমাধিস্থলের পূর্ব দিকে তৈরি হলো সেটি। এ জন্য কলকাতা পুরসভার নির্দিষ্ট দপ্তর ৩৪ হাজার টাকা খরচ করেছিল। এর জন্যই সামনের রাস্তার নাম হল ক্রীমেটোরিয়াল স্ট্রীট । ১৯৭৯ সালে শেষ বার সক্রিয় হয়েছিল এই সমাধিস্থলটি।

২.৩.৩. অগ্নিসৎকারের বিজ্ঞান ও ধর্মীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব

এ কথা সত্য যে ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষত উচ্চবর্গ হিন্দুদের মধ্যে শবদাহ ঐতিহাসিকভাবে জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু নিম্নবর্গ হিন্দুদের ক্ষেত্রে এমনটা ছিল না। শবদাহ ব্যবস্থা উচ্চবর্গ হিন্দুদের ব্যবস্থা বলেই বিবেচিত হত। আদিবাসী ও নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে মৃতদেহ সমাহিত করার চল ছিল। ফলত, হিন্দুদের মধ্যে মৃতদেহের অগ্নিসৎকার এর যে প্রক্রিয়া তা একমাত্র মাধ্যম বলে মনে করার কারণ

[৫০] জয়তী রাহা, 'দাহ পুরানের বিবর্ণ অতীত বইছে শহরে'- আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, শনিবার ১০ আগস্ট ২০১৯।

নেই। যেমন ১৮৮০ সালে বোম্বেতে ১৩,০৩৭ জনের মধ্যে ৫,৫৬৯ জনের শবদাহ করা হয়েছে অর্থাৎ ৪৩% মতো। আসলে সবদাহ প্রথা উচ্চবর্গের হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সময়ের সাথে সাথে নিম্নবর্গের হিন্দুরাও এই প্রথা সম্পর্কে বিশ্বাস দেখাতে শুরু করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের এই বিশ্বাস বৃদ্ধির কারণটা সামাজিক। শবদাহ প্রথা গ্রহণের মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গীয় হয়ে ওঠার চেষ্টা। ঐতিহাসিকরা একে 'Sanskritization' বলে মনে করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর 'অভাগীর স্বর্গ' ছোটগল্পে এক নিম্নবর্গীয় হিন্দু মায়ের বাসনা জমিদার গিন্নির মতো সেও যেন ঐ চিতা কাঠের ধূমায়িত কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে স্বর্গে যেতে পারে। ‘অভাগীর স্বর্গ’ নামক ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দু সমাজের যে বর্গীকরণ তা চিহ্নিত করেছেন[৫১, ৫২]।

---

[৫১] Mahua Sarkar, Women, Law and Social Reform in Bengal in Gender Sensitization, Empowerment and Distance Education, NSOU, 2014, p. 9.

[৫২] মহুয়া সরকার, ‘উনিশ শতকের বাংলার জীবন ও জীবনচর্চা’, *ইতিহাস অনুসন্ধান* খণ্ড ২৬, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩৬-৪৮

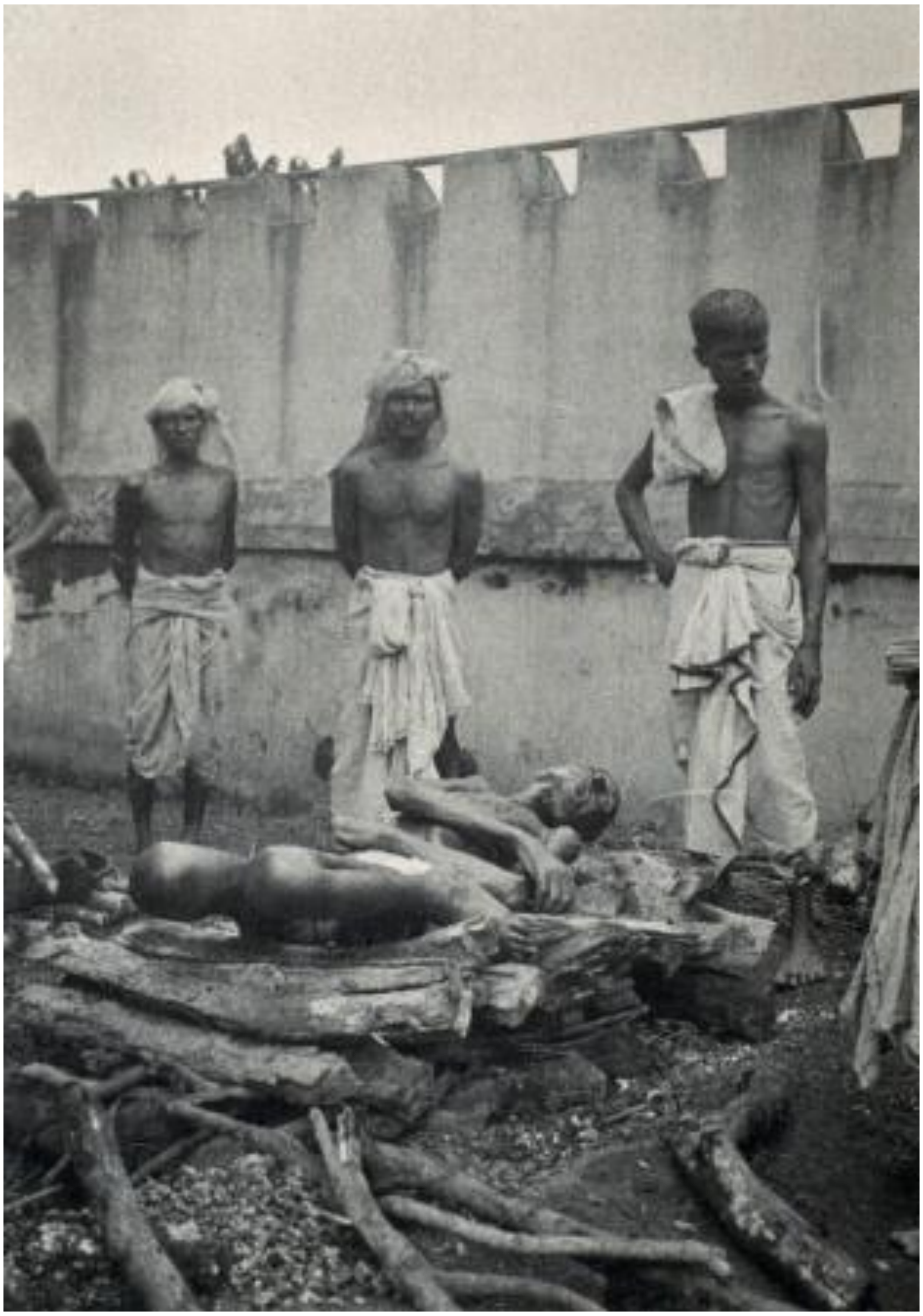

চিত্র ১৩: উনিশ শতকের বাংলার উন্মুক্ত শবদাহ[৫৩]

[৫৩] Copyright https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

হিন্দু সমাজ ও ঔপনিবেশিক শাসকেরা শবদাহ গ্রহণ করলেও কিন্তু একটি বিষয় নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। বলা যেতে পারে বিতর্কের বিষয়টা ধর্মীয় ও কিছুটা নান্দনিক। প্রথম থেকেই উন্মুক্ত শবদাহ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক ছিল। হিন্দু সমাজের যুক্তি ছিল উম্মুক্ত আকাশে চন্দন কাঠ (ধনীদের ক্ষেত্রে) বা সমতুল্য কাঠের সাহায্যে অগ্নিসৎকার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ শবদাহ ব্যবস্থা মেনে নিলেও তারা চাইছিলেন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শবদাহ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে। ১৮৮০-১৮৯০ দশকে গোঁড়া হিন্দুদের বক্তব্য হলো "Many Orthodox Hindus claimed that indoor cremation was utterly alien to them and incompatible with their traditional funeral rites" অর্থাৎ, অনেক গোঁড়া হিন্দু দাবি করেছিলেন যে অভ্যন্তরীণ শ্মশান তাঁদের কাছে একেবারেই ভিনগ্রহী ছিল এবং তাঁদের ঐতিহ্যবাহী সৎকার রীতির সাথে বেমানান ছিল।[৫৪] হিন্দু সমাজের এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে একজন ইউরোপিয়ানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য- "The Hindoo motive for burning a body is to prevent defilement of the dead, the motive for the European is to prevent defilement of the living" অর্থাৎ, হিন্দু মতে অগ্নিসৎকার করার উদ্দেশ্য হল মৃতদেহ কে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা, যেখানে ইউরোপীয়দের উদ্দ্যেশ্য হল জীবিতদের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা।[৫৫] এ কথা বলা যায় হিন্দুসমাজ শবদাহের আধুনিকীকরণ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। হিন্দু শবদাহ সম্পর্কে 'ভারত সাধনা' পত্রিকাতে শ্রীবিভুভুষণ দত্ত সম্পাদিত বক্তব্যটি বলা যেতে

[৫৪] David Arnold, Burning issues: Cremation and incineration in Modern India, NTM, 2016 Dec: 24(4): pp 402.

[৫৫] Times of India, 11october 1887: pp 5.

পারে। "বর্তমান সময়ে যন্ত্র সাহায্যে শবদাহের যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। ইহার দ্বারা মৃতের কোনোরূপ কল্যাণ গঠিত হয় না। উহাতে বিজাতীয় লোকের স্পর্শ সম্ভাবনা, মন্ত্রপাঠাদির অভাব থাকায় বৈধ দান সিদ্ধ হয় না। অতএব দাহ সিদ্ধ না হইলে, তৎপরবর্তী মৃতের অদ্য দৈহিক ক্রিয়াকলাপ গুলিও অসিদ্ধ হয়। এই কারণে যান্ত্রিক দাহে কাষ্ঠ ব্যয়ে ও শ্রমের লাঘব হইলেও এই সুবিধার নামে অশাস্ত্রীয় কার্যদ্বারা মৃতের পারত্রিক কার্যে বিঘ্ন সম্পাদন কখনও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সমর্থনীয় হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত হিন্দুজনেরই যান্ত্রিক দাহে অনাস্থা ও তীব্র প্রতিবাদ করা কর্তব্য"।[৫৬] অর্থাৎ হিন্দু সমাজ যে শবদাহের আধুনিকীকরণ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না তা বোঝা যাচ্ছে।

ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে ভারতীয়দের 'উন্মুক্ত অগ্নিসৎকার' বনাম বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্নিসৎকার নিয়ে দীর্ঘ বিবাদ হয়। উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকেই আভ্যন্তরীণ সৎকার নিয়ে ব্যাপক জনভিত্তি গড়ে উঠেছিল। ১৮৬৪ সালে মেজর থমাস মার্টিন পাঁচ কক্ষ বিশিষ্ট 'Cremetorium chamber' ডিজাইন করেছিলেন। এমনভাবে নির্মাণ করেছিলেন যাতে মৃতদেহ থেকে নির্গত ধোঁয়া 'Chimney'র সাহায্যে বাইরে বেরিয়ে যাবে। পাঁচ কক্ষ বিশিষ্ট চেম্বার করার কারণ হল যাতে বিভিন্ন বর্গের হিন্দুদের আলাদা আলাদা ভাবে সৎকার করা যায়। মৃতদেহের ছাই যাতে না মিশে যায়[৫৭]।

---

56 ভারত সাধনা' - শ্রী বিভুভুষন দত্ত সম্পাদিত দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩৭ কার্ত্তিক প্রথম সংখ্যা ।

৫৭ Thomas Martin(major), Specification of a Cinerator for theUse of Brahmins, andOtherHindoo Castes. Bombay: Chesson and Woodhall,1864, p. 27.

২.৩.৪. ভারতীয় বিপ্লবীদের মৃত্যু সংক্রান্ত দেশীয় ভাবনা

১৮৩০ এর দশকের পর থেকে ঔপনিবেশিক নীতির কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। ১৮৩০ দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ জেলে ভারতীয় বন্দিদের সমাধিস্থ করা হতো। যদি তারা উচ্চবর্গীয় হিন্দু হত তাহলে তাদের শবদাহের ব্যবস্থা করা হত। সেক্ষেত্রে তাদের শবদাহের খরচ সমবর্গীয় বা সহ বন্দি বা তাঁদের পরিবারের থেকে নেওয়া হত। এই ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু ও শিখ বন্দিদের আত্মীয় পরিজনেরা তাদের মরণোত্তর দেহ নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইল। এটি একটি সাধারণ পন্থা হিসাবে দাঁড়িয়েছিল। যদিও কর্তৃপক্ষের কখনও মনে হত, এটি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেক্ষেত্রে 'দেহদান' করা হত না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জেলে বন্দি অবস্থায় হিন্দু বা শিখ জাতির কেউ মারা গেলে সমাধিস্থ করাই সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৫৮]

"The British Raj sent Indian dissidents and mutineers to a remote island penal colony in an 'experiment' that involved torture, medical tests, forced labour and, for many, death."[৫৯]

---

[৫৮] Ramesh Chandra, The forgotten act XI of 1836, Proceedings of the Indian history Congress, Vol-9, 1946, pp. 369-371.

[৫৯] Scott-Clark, Cathy; Levy, Adrian (22 June 2001). "Survivors of our hell". *The Guardian*. Retrieved 7 February 2019, Wikipedia public domain.

Cathy Scott-Clark এবং Adrian Levy উন্মোচন করেন, ব্রিটিশরাজ ভারতীয় বিদ্রোহী ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের একটি প্রত্যন্ত দ্বীপের পেনাল কলোনীতে পাঠিয়েছিল (আন্দামান সেলুলার কারাগার), যেখানে চলত জোড় পূর্বক শ্রম, নির্যাতন, চিকিৎসা পরীক্ষা। কর্তৃপক্ষের কাছে এটি ছিল একটি পরীক্ষা মাত্র, যার সাথে জড়িয়ে ছিল অনেক মৃত্যু। তাই এই অংশে আন্দামান সেলুলার কারাগারে বন্দী সম্পর্কিত কিছু তথ্য প্রদান করা হল-

সেই সময় কারাগারের খারাপ অবস্থা ও নিম্নমানের খাবারের প্রতিক্রিয়ায় অনেক বন্দী অনশন করে।কারা কর্তৃপক্ষ এই অনশনকে বন্ধ করার জন্য অনশন কারী বন্দীদের জোড় করে খাওয়াত। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রেকর্ডের মধ্যে, প্রাদেশিক গভর্নর এবং প্রধান কমিশনারদের আদেশে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়- "Very Secret: Regarding security prisoners who hunger strike, every effort should be made to prevent the incidents from being reported, no concessions to be given to the prisoners who must be kept alive. Manual methods of restraint are best, then mechanical when the patient resists."।[৬০] ১৯৩৩ সালের মে মাসে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট কারা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। ৩৩ জন বন্দী তাদের চিকিৎসার প্রতিবাদ করে অনশনে বসেন। এদের মধ্যে ছিলেন মহাবীর সিংহ, মোহন কিশোর নামদাস, মোহিত মৈত্র প্রমুখ। কারাপক্ষের জোর করে খাওয়ানোর কারণে এই তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছিল। বাকি বন্দীদের মধ্যে ছিলেন[৬১]-

৬০ Scott-Clark, Cathy; Levy, Adrian (22 June 2001). "Survivors of our hell". *The Guardian*. Retrieved 7 February 2019.

[৬১] Scott-Clark, Cathy; Levy, Adrian (22 June 2001). "Survivors of our hell". *The Guardian*. Retrieved 7 February 2019.

১। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত, ৩১৫৫২ (ডগলাস কিংসফোর্ডের ব্রিজ অংশীদারদের, প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিসেস প্রিঙ্গল কেনেডি এবং তার মেয়ে গ্রেসকে হত্যা করেন মুজফরপুরে একটি গাড়ির ভিতরে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে)।

২। বিপ্লবী বারীন ঘোষ, ৩১৫৪৯

৩। বিপ্লবী ইন্দু ভূষণ রায়, ৩১৫৫৫ (ছেঁড়া কুর্তা দিয়ে নিজে ফাঁসি বরণ করেন)

৪। বিপ্লবী ছত্তার সিংহ, ৩৮৩৬০ (যিনি আয়রন স্যুটে সাসপেন্ড ছিলেন তিন বছরের জন্য)

৫। বিপ্লবী বাবা ভান সিং, ৩৮৫১১ (যিনি ডেভিড ব্যারির লোকদের দ্বারা মারা গিয়েছিলেন)

৬। বিপ্লবী রাম রক্ষা, ৪১০৫৪ (যিনি পবিত্র ব্রাহ্মণ্য সুতা বা পৈতা অপসারণের প্রতিবাদে অনাহারে ছিলেন)

৭। বিপ্লবী হরিপদ চৌধুরী (একটি পোস্ট অফিস হোল্ড-আপে ধরা পড়ার সময় দুটি পিস্তল বহন করেছিলেন)

৮। বিপ্লবী ধীরেন্দ্র চৌধুরী, ১৪৭ (বোমা ও বন্দুকের তহবিল সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করেছিলেন), ইনি কালাপানিতে বেঁচে যাওয়া কয়েকজনের মধ্যে একজন।

৯। বিপ্লবী নারিংগুন সিংহ (নির্যাতনের কারণে নিজের ঘরে নিজেকে ফাঁসি দেন)

১০। বিপ্লবী শের আলী, ১৫৫৫৭ (ভারতের ভাইসরয় লর্ড মায়োকে হত্যা করেন ১৮৭২ সালে ৪ ই ফেব্রুয়ারি একটি পরিদর্শন সফরে আন্দামান দ্বীপে আসাকালীন, ১১ ই মার্চ, ১৮৭২ সালে ইনাকে ফাঁসি দেওয়া হয়) ।

১১। বিপ্লবী মেহতাব, ১২৮১৯

১২। বিপ্লবী চৈতুন, ১০৮১৭

১৩। বিপ্লবী নারাইন, ৬১ (দিনাপুর সেনানিবাসে রাষ্ট্রদ্রোহ থাকার কারণে, পালানোর চেষ্টা করায় তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বিপ্লবী এবং রাজনৈতিক বন্দীদেরকে একে অপরের থেকে বিছিন্ন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেয়েছিল বলে নির্জন কারাবাস কার্যকর করা হয়েছিল তাদের জন্য। আন্দামান সেলুলার কারাগারের অধিকাংশ বন্দীই ছিলেন স্বাধীনতাকামী। তাদের মধ্যে ছিলেন যোগেন্দ্র শুক্লা, বটুকেশ্বর চক্রবর্তী, ফজল ই হক খেয়রাবাদি প্রমুখ[৬২]।১৮৬৮ সালের মার্চ মাসে ২৩৮ জন বন্দী পালাবার চেষ্টা করেন। তারা সবাই ধরা পড়েন এপ্রিলের মধ্যে। তাদের মধ্যে একজন আত্মহত্যা করেন এবং বাকি ৮৭ জন বন্দীকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওয়াকার ফাঁসির আদেশ দেন[৬৩]।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কী সামাজিকতাকে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে 'ভাল মৃত্যু' বা 'মন্দ মৃত্যু' বলে কোন দার্শনিক নীতি আরোপ করেছিল? যদি তা করে থাকে তাহলে সেটি কেমন নীতি? তা কী আমাদের প্রাক্ উপনিবেশিক সমাজের দার্শনিকতার যুক্তির প্রত্যয়গুলিকে নৈতিকভাবে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে? আসলে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ বা শাসন যন্ত্র বিপ্লবীদের মৃত্যু সম্পর্কে যে অভয় তৈরী হয়েছিল তা তাদেরকে ভাবিয়েছিল, কারন, বিপ্লবীরা যেভাবে জীবনের মায়া অতিক্রম করে মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত ছিল তার কারণ একদিকে যেমন দেশ মাতার কাছে আত্মবলিদান, অপরদিকে হিন্দু ধর্মে দার্শনিকতার এমন কিছু উপাদান আছে যা জীবন মৃত্যুকে সমমাপে বরণ করতে কুণ্ঠাবোধ তাদের হত

---

[৬২] Freedom Fighters Deported to Andamans Archived 2010-09-06 at the Wayback Machine. AndamanCellularJail.org.

[৬৩] History of Andaman Cellular Jail: Atrocities committed on early freedom fightersArchived 18 January 2007 at the Wayback Machine. AndamanCellularJail.org.

না অর্থাৎ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ও প্রাচ্য বিশারদদের কাছে একটি মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যা শুধুমাত্র নব্য প্রচলিত আইন কানুন ও ইউরোপীয়করণের মধ্য দিয়ে যার সমাধান সম্ভব ছিল না। তাই হিন্দু ধর্মের নান্দকিতার ও দার্শনিকতার দিকটিকে প্রচলিত আধুনিকতার প্রেক্ষিতে আঘাত হেনে বা হেনস্থার মাধ্যমে, বৈধ-অবৈধর বর্গে ফেলা হয়েছিল, যাতে করে বিপ্লবীদের আত্ম বলিদান শহিদের তকমা না পায় এবং অধার্মিক বা অপ্রয়োজনীয় মৃত্যুবরণ হিসেবে মনে করানো যায়। এই প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মৌলিক কাঠামোর প্রশ্নটিও জড়িয়ে আছে। ইউরোপীয় নব জাগরণে জীবন মৃত্যুর সীমাকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে যেভাবে ক্রমবর্ধমান করা হয়েছিল, ভারতীয় ঐতিহ্য জীবন মৃত্যুর সম্পর্ককে উলম্বিত দূরত্বের বদলে সমদূরত্বের দিকে যাত্রা করেছিল যা ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের কাছেও বিড়ম্বনার কারণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে।

চিত্র ১৪: ভারতীয় বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোস ব্রিটিশ পুলিশের সাথে[৬৪]

[৬৪] উইকিপেডিয়া পাবলিক ডোমেন

চিত্র ১৫: আন্দামান সেলুলার জেল[৬৫]

২.৩.৫. জাতীয়তাবাদের গর্ভে হয়ে ওঠা মৃত্যুর জন্ম

বর্তমান কালে ‘উন্মুক্ত শবদাহের’ যে দৃশ্যমানতা এমনকি টিভি, রেডিও্ বিভিন্ন বেতার মাধ্যমে তার প্রচার হিন্দু ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক চিহ্নকেই বিশ্বের সামনে তুলে ধরে। মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, নেহেরু, রাজীব গান্ধীর মৃতদেহের সৎকার এর দৃশ্য সমগ্র ভারতবাসীর কাছে যে দৃশ্যমান করে তোলা হয়েছিল তা ভারতীয়দের হিন্দু জাতীয়তাবোধকে প্রকাশমান করে।[৬৬]

---

[৬৫] https://www.dreamstime.com/photos-images/cellular-jail.html (royalty free stock images)

[৬৬] David Arnold, Burning issues: Cremation and incineration in Modern India, NTM,2016 Dec: 24(4): 393-419. doi: https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00048-017-0158-7

চিত্র ১৬: Cremation of Mohandas Gandhi, Delhi, January 1948[৪৬]

আধুনিক প্রযুক্তি, রেলপথ, বিমানপথ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে বিদেশ থেকেও ভারতীয়রা মৃতদেহের ‘ছাই’ আনতে পারছেন এবং গঙ্গা বা কোন পুণ্য নদীতে বিসর্জন দিচ্ছেন, এমনকি মৃতদেহ সরাসরি বিদেশ থেকে ভারতে এনে ‘সৎকারের’ ব্যবস্থা করাও যাচ্ছে যা ভারতীয় ‘উন্মুক্ত শবদাহ ব্যবস্থা’র চেয়েও বেশি দৃশ্যমান এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক চিহ্ন বহন করছে।

বাংলার বিপ্লবীদের মৃত্যু চেতনা

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর থেকেই এক ধরনের জাতীয়তাবাদ নব্য মৃত্যু চিন্তা জন্ম দিচ্ছিল। বিরোধিতার ফলে মৃত্যুর অর্থ ও সংজ্ঞা নতুন ভাবে রচিত হচ্ছিল। বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র চরমপন্থার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সংঘর্ষ ও মৃত্যু, মৃত্যুকে গ্রহণ করবার নানা চিন্তার কুসুম ফুটে উঠেছিল। পাঞ্জাবে

মহারাষ্ট্রে উত্তর ভারতে মৃত্যুর দর্শনের প্রকাশ ছিল অন্যরকম, প্রথম দিকে তা ছিল প্রবল ধর্মীয় ভাবাবেগে আচ্ছন্ন। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গি বা মৃত্যুকে গ্রহণ করার এক অন্য দর্শন লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় এর প্রথমে ধর্মীয় ভাগভাগের ভেতর দিয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাংগঠনিক ও কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে মৃত্যু গ্রহণ করার বা মৃত্যুকে কিভাবে জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হিসেবে না ভেবে মৃত্যুই সব সময় সাথী বা মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে চলার যে জীবন বোধ তা তৈরি হচ্ছিল। সংগঠনভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করার যে নতুন পন্থা তা মূলত বিবেকানন্দ ম্যাক্সিনি রুশ বিপ্লব ও আইরিশ বিপ্লবের প্রভাবে তৈরি হচ্ছিল। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার গ্রন্থ মহামৃত্যু সন্ধানে ভারতীয় বিপ্লবীরা তে দেখাচ্ছেন নিজস্ব জীবন দর্শনের মত বিপ্লবের ক্ষেত্রেও আত্মোৎসর্গের একটা দর্শন থাকে। এই দর্শন কিন্তু পাল্টে যায় দেশ কাল সংগঠনগত এবং শ্রেণি গত কারণে। সেই জন্যই হাসির মঞ্চে বা ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের সামনে আমরা দেখি একেকজন বিপ্লবী মৃত্যুকে এক এক রকম ভাবে দেখছেন। ক্ষুদিরামের চোখে মৃত্যুকে যে চোখে দেখেছিলেন কানাইলাল সে চোখে দেখেননি । ভগৎ সিং এর দেখবার ধরন ছিল অন্যরকম। মৃত্যু চিন্তার ধরনকে বিশেষণ করলে দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করলে তাদের সেই দেখার ভেতর দিয়ে বোঝা যায় সমাজ মননে পরিবর্তন আসছে কোথায়। বোঝা যায় সমাজের কি ধরনের গতিবেগের ভেতর দিয়ে তারা এসেছেন, সংগঠন কি শিখিয়েছে তাদের এবং তারা মৃত্যুর ইচ্ছা ও মৃত্যু চিন্তা কে কিভাবে ধারণ করেছেন বক্ষে। নিজের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ভিতরে মিশে থাকে ভয়। সেই ভয়কে সাহস দিয়ে চেতনা দিয়ে জয় করতে হয় বিপ্লবী কে। কখনো মৃত্যুকে ঘিরে তৈরি হয় রোমান্টিকতা, মৃত্যু হয়ে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বী। বিবেকানন্দ মৃত্যুকে নতুন ব্যঞ্জনায় অভিসঞ্চিত করেছিলেন। বিবেকানন্দের পরে বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দ দেশ মাতৃসরূপা এই জ্ঞানকেই উদ্বোধিত করেছিলেন। বিশেষত অরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি এ বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন "আমি কিন্তু আমার দেশকে মা বলেই জানি,

একমাত্র তাকেই আমি ভালোবাসি"। বিবেকানন্দ কথিত আত্মদানের আদর্শ এভাবেই মার জন্য দেশ মাতৃকার জন্য আত্ম বলিদান এর আদর্শে রূপায়িত হয় এবং আত্ম বলিদান শুরু হতেই তৈরি হয় যায় চাক্ষুষ আত্মদানের দর্শন। দেশপ্রেম ক্রমশ অবচেতনে হয়ে উঠেছে ধর্মের বিকল্প। ক্রমশ দেশপ্রেম কেবলমাত্র দেশপ্রেমী চরমপন্থীদের কাছে একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে আর এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আত্ম বলিদান এর আদর্শ থেকে সরে যায় বিপ্লবীরা, সমন্বয় দেশপ্রেমের আদর্শ তীব্র হয়ে ওঠে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে দেশপ্রেম কখনোই ধর্মের বিকল্প ছিল না।[৬৭]

২.৩.৬. মৃত্যু সম্পর্কে দার্শনিক ভাবনা

পরিশেষে যে কথাগুলি বলা যায় তা হল, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 'মৃতদেহ' নিয়ে আলোচনা করা অর্থাৎ বৃহৎ অর্থে কিভাবে সৎকার করা হবে, যিনি মৃত, তিনি কিভাবে মৃত হলেন, তার কারণ প্রভৃতি বিষয়ে ইতিহাসে বা তৎকালীন সময়েও ভীষণভাবে খারাপ বা অসম্মানজনক বিষয় ছিল বলে মনে করা হত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন রায়, তার 'সতিদাহ প্রথা' অবলুপ্তির মাধ্যমে শুধুমাত্র সতীদাহ প্রথার মতো কুসংস্কারকে রদ করেছিলেন এমনটা ভাবলে ভুল হবে, দার্শনিকভাবে সতীপ্রথার মধ্যে যে 'মৃত্যু' একটি বিষয় হয়ে উঠেছিল, তা তিনি প্রচলিত উচ্চবর্গীয় আলোচনা চিন্তাভাবনা জগতের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। মৃত্যু ও দেহ সৎকার চর্চার ধারণার পরোক্ষভাবে সামাজিক ইতিহাসের এক্তিয়ারের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। সতীদাহ প্রথা শুধুমাত্র নারীকেন্দ্রিক সমস্যা হিসাবে তিনি দেখতে চান নি। এই প্রথার মধ্যে 'মৃত্যু' থেকে উৎসারিত শোক, দুঃখ, যন্ত্রনা ইত্যাদি

৬৭. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামৃত্যু সন্ধানে ভারতীয় বিপ্লবীরা, রুপালি, কলকাতা, পাতা ৬-৮

এক লিঙ্গহীন সংস্কারের দিকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সংস্কৃতি পরবর্তীকালে আলোকায়নকে চিহ্নিত ও স্থায়িত্ব দিয়েছিল। আধুনিকতার একধরনের সমস্থিতির অনুরণন নির্মান করতে পরবর্তী সংস্কারকদের তিনি সাহায্য করেছিলেন। মৃত্যু ও তার সামাজিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে জটিল ভাবনাচিন্তা মূল চিন্তার অনুষঙ্গ হিসেবে এসে পড়ে, না এলে বোধ হয় চিন্তার পুর্ণতার অপেক্ষা পূরণ হয় না। সমাজ বলতে আমরা যেটা বুঝি বিশেষত সেটা কোন সাধারন সমাজ নয়। ঔপনিবেশিক সমাজ, তার পটভূমি, বিস্তার এবং সেইসঙ্গে তার অন্তর সম্পর্কগুলিকেও বোঝার প্রয়োজন আছে। সমাজের অন্তরে ও বাহিরে মৃত্যু সমাজকে এক সামাজিকতা দান করে। মৃত্যু ও তাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি তা ঔপনিবেশিক সমাজে কখনও স্পষ্ট কখনও অস্পষ্ট ভাবে বিষয় থেকে বিষয়ী আবার কখনও কখনও বিষয়ী থেকে বিষয় হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে একটি বিষয় খুব স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্য করা যায়, তা হল মৃত্যু কি? মৃত্যুর পরে কি হবে, পরলোক চর্চা, প্রেত চর্চা প্রভৃতি বিষয়গুলি তাদের লেখালিখির জগৎ ও সমাজ সংস্কারকদের ভাবনাগুলির মধ্যে উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। এমনকি ইউরোপের দর্শনেও এই বিষয়গুলি নিয়ে অর্থাৎ, আত্মা বা সোল, দেহ বা বডী, মন বা মাইন্ড নিয়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের প্রভূত চর্চা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি দেহ+আত্মা+মন= মানুষ এই বয়ানটিকে নিয়ে একবিংশ শতকেও বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা চলছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মৃত্যু ও তার সম্পর্কিত আলোচনা মূল ধারার ইতিহাস চর্চায় কিছুটা অবহেলিত থেকেছে, তার কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।[৬৮] কিন্তু মৃত্যু কেন অবহেলিত থেকেছে তাকে শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন হিসেবে দেখলে ভুল হবে। বিশ্বের ইতিহাসে বা বলা যেতে পারে সভ্যতার ইতিহাসে মৃত্যু ছাড়া কোন কিছুকেই বোঝা সম্ভব হত না। 'মৃত্যু'কে গ্রহণ করা অর্থাৎ মৃত্যু

৬৮ L.Kong, Cemetries and Coloumbaria, Memorials and Cremations, Oxford, OUP, p. 121

হবেই আর যদি তা হয় কেন হবে। কেন বেশী মানুষ কারণে বা অকারণে মারা যাবে তাও সভ্যতার ভিত্তি ভূমির মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। ১৮৩০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে মৃত্যু ও তার পরবর্তী সৎকার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে উপনিবেশিক শাসকের কাছে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইউরোপীয় মনোভাবের মধ্যে শ্মশান শুধুমাত্র একটি স্থান ছিল না। যেখানে মৃতদেহের সৎকার হয়, বরং শ্মশান ব্যবস্থার মধ্যে ইউরোপীয়রা হিন্দু সমাজের শ্রেণীবিভাগ, ধর্ম এবং উচ্চবর্গীয় সমাজের মানসিক দ্বন্দ্বকে বুঝতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক শাসকরা মৃত মানুষের অগ্নি সৎকারের ছায়ায় জীবিত মানুষের নীতি ও মূল্যবোধকে বুঝতে চেয়েছেন। Thomas Liquor-এর মতে মৃত্যু ও তার সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির নিন্দা বা সমালোচনা করে জীবিত মানুষদের অনুভূতির যে নৈতিক মানদণ্ড তার সত্য মিথ্যার ব্যবধানকে প্রসারিত করেছিল।[৬৯] ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা অবলুপ্তির মাধ্যমে মৃত্যু, মৃতদেহের সৎকার, সৎকারের পদ্ধতি, ধর্মীয় আচার-বিচার প্রভৃতি বিষয়গুলি ইউরোপীয় শাসক ও তাদের চিন্তাবিদদের মানসিক পটভূমিতে অনুকম্পা তৈরি করেছিল। মৃত্যুও হিন্দু রীতিতে সৎকার ব্যবস্থা ইউরোপীয়দের কাছে খুবই গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল কারণ, উপনিবেশিক শাসকদের মৌলিক ভিত্তি স্থাপনের সাথে মানসিক বা অনুভূতি সম্পর্কিত বিষয়গুলি শাসন প্রক্রিয়ার পদ্ধতির বিষয় হিসেবে উঠে আসছিল। মৃত ব্যক্তির চেয়েও গুরুত্বপুর্ণ বা প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল জীবিত ব্যক্তিদের কাছে। এই প্রসঙ্গে, Thomas Liquor-এর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। 'It matters because the living need the dead for more than the dead need the living. It matters because the dead made social worlds. It matters because we cannot bear

৬৯ Thomas Liquer, The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains, Princeton, Newzealand, Princeton University Press, 2015, Intro.

to live at the border of our mortality.'[৭০] অর্থাৎ সতীদাহ প্রথা রদ এক ধরনের ইউরোপীয় আলকায়নের বাস্তব পরীক্ষা যেখানে পাবলিক রিসিন ও প্রাইভেট রিসিনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির বন্ধন মুক্তি ও নির্মান সম্ভব।[৭১] সাম্প্রতিক কালে চিন্তাবিদ Giorgio Agamben, Achille Mbembe, Carl Smitte প্রমুখ মৃত্যু, রাষ্ট্র, জন সংখ্যার সাথে মৃত ও জীবনের কি সম্পর্ক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উক্ত দার্শনিকেরা গভীর থেকে গভীরতর আলোচনা করেছেন। ফুকোদিয়ান বায়ো পলিটিক্স এর উত্তর চিন্তাবিদ হিসেবে আগাম্বেন thanato politics তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন। তার পরবর্তীকালে Achille Mbembe তার তত্ত্ব necro politics এর মধ্যে দিয়ে উপনিবেশবাদ, রাষ্ট্র মৃত্যুকে বিষয় হিসেবে রেখে 'Necropolitics to the subjugation of life to the power of death' অর্থাৎ কিভাবে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র জীবিত মানুষের আধারকে নির্মান করছে এবং একইসঙ্গে মৃত্যুই জীবনকে আরও জীবিত করে তুলছে তা Achille Mbembe Necropolitics এর মধ্যে দিয়ে দেখাচ্ছেন। বায়োপলিটিক্স, থানাটোপলিটিক্স ও নেক্রপলিটিক্স এর মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে মৃত্যুকে ও তার সম্পর্কিত যে সংস্কৃতি তার প্রেক্ষাপটটিকে আলোচনা না করলে মৃত্যু শুধুমাত্র ভূতের গল্পের জন্ম দেবে ইতিহাসের গর্ভে। একথা ঠিক প্রচলিত ইতিহাস চর্চায় ঔপনিবেশিক বা ইউরোপীয় কল্পনায়, মৃত্যু বিশেষত ঔপনিবেশিক সমাজে কখনই প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসেনি। কেন আসেনি তাও একটি ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক প্রশ্ন হতে পারে। বৌদ্ধ যুগের সূচনা লগ্নে অগ্নিসৎকার ও সমাধি ব্যবস্থা উত্তর ভারতে অত্যন্ত সাধারণ ও জনপ্রিয় ব্যবস্থা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। যদিও দক্ষিণ ভারতে

৭০। Thomas Liquer, The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains, Princeton, Newzealand, Princeton University Press, 2015, p.1
৭১. Imanuel Kant, What is Enlightment, Intro.

আর্য সংস্কৃতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করার ফলে সমাধিস্থ করার বদলে দেহকে সৎকার করার প্রথা জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে গণ্য হতে শুরু করে।[৭২]

উনবিংশ শতকে পশ্চিমের উৎসাহী গবেষকরাও ভারতীয় মৃতদেহ সৎকার ও তার সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। উনবিংশ শতকে উৎখনন, প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে তাদের ধারণা হয়েছিল অগ্নিসৎকার উত্তর ভারতে আর্যদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ফায়ার বুরিয়াল বা অগ্নি সমাধি ভারত থেকে ইউরেশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে মৃতদেহ সৎকারের মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে অগ্নি সমাধি ব্যবস্থা সাধারণ সমাধি ব্যবস্থার চেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পশ্চিমে আদি খ্রিস্টান সংস্কৃতি যখন প্রবলভাবে চরম ক্ষমতাশীল সংস্কৃতিতে রুপান্তর ঘটছিল তখনই সাধারণ সমাধি ব্যবস্থা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৭৩] যখন পশ্চিমের পৃথিবীতে মৃতদেহ সৎকার করার মাধ্যম হিসেবে অগ্নিসৎকার বা বলা যেতে পারে পশ্চিমের দেশগুলিতে 'মৃতদেহে আগুন জ্বলেছিল' তখন ভারতে অগ্নিসৎকার মূলত তিনটি বর্নহিন্দু উচ্চজাতিদের মধ্যে বিশেষত ব্রাহ্মণরা এই ব্যবস্থা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। কারণ, অগ্নি সৎকার সেই সময় একটি অত্যন্ত ব্যয় বহুল ব্যবস্থা, যা নিচু জাতির পক্ষে এই সংস্কৃতি গ্রহন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বেশিরভাগ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতে আধুনিক সৎকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রথম ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছিল ইতালিতে। ১৮৭০ এর দশকে প্রথম মানুষের মৃতদেহ ও পশুদের মৃতদেহকে বদ্ধ ফার্নেসে অত্যাধিক উচ্চ তাপমাত্রায় মৃতদেহ সৎকার করার কাজ শুরু হয়। আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্প, প্রযুক্তি, রোগ জীবানু সম্পর্কে সচেতনতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলি মৃতদেহ ও তার সৎকার ব্যবস্থার সম্পর্ককে রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় নিরপেক্ষতার মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তা

৭২। Romila Thapar, Early India: From the Origin to AD 1300, London, Allen Lane, pp. 165-230
৭৩। William Eassie, Cremation of the Dead: Its History and Bearing upon Public Health, London, Smith Elder, 1975, p. 4

পরোক্ষভাবে আধুনিক অগ্নিসৎকার ব্যবস্থাকেই বা চুল্লির মাধ্যমে পোড়ানোর যে প্রথা তাকেই জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সমাধি ব্যবস্থার প্রধান ও প্রথম সীমাবদ্ধতা হল জায়গার অভাব ও তার সংরক্ষণ। সেই কারণেই অগ্নি সৎকার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঘটেছিল। যদিও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, আধুনিক সৎকার ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছিল ১৬৫৮ সালে ব্রিটেনে। শ্মশান ও অগ্নিসৎকার ব্যবস্থা হল রক্ষণশীল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানব সভ্যতার 'সভ্য' হয়ে ওঠার মাত্রাগুলি চিহ্নিত করা এবং আলোকিত করার ইতিহাস।

প্রায় একশ বছর আগে গ্রেট ব্রিটেনেও আধুনিকীকরণ নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলেছিল। যা ব্রিটেনের উপনিবেশগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল। আধুনিক সময় ব্রিটেনে ছাপান্ন শতাংশ মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্নি সৎকারের পক্ষে ছিলেন। ১৬৫৮ সালে আধুনিক অগ্নি সৎকারের পুনরুত্থান শুরু হলে নরউইকের একজন চিকিৎসক স্যার ব্রাউন তার একটি প্রবন্ধে 'Hydriotaphia urm burial' সাধারণ সমাধি ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে অগ্নি সৎকার ব্যবস্থার পক্ষে তিনি সওয়াল করেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৬৬৪ সালে ফ্রান্সে Philosophical discourse of the virtuosi of France নামে একটি বইতে। পরবর্তীকালে দুই শতাব্দী ধরে এই প্রশ্নে আরো অনেক আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এই বিষয় ব্যাপক পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল ১৮৬৯ সালে ফ্লরেন্সের মেডিকেল ইন্টারন্যাশানাল কংগ্রেসে "জনস্বাস্থ্য ও সভ্যতার নামে" একটি সম্মেলনে। সেখানে অধ্যাপক কোলেত্তি ও ক্যাসতিওগ্লিনি অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত যুক্তিসম্মত মতামত উপস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৭২ সালে শ্মশান ব্যবস্থার পক্ষে আরোও তথ্যসমৃদ্ধ সওয়াল করতে গিয়ে ডঃ পল্লি এক ধরনের আধুনিক সৎকার চুল্লির মডেলের একটি সংস্করণ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক গরিনি, অধ্যাপক ব্রুনেত্তি মৃতদেহকে অগ্নিসৎকার করলে তার কি কি প্রাথমিক ফলাফল হয় তা পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছিলেন। অর্থাৎ একটি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে, অগ্নিসৎকার পাশ্চাত্য দেশের কাছে শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং

তাকে আরো কিভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা যায় তা নিয়ে অনবরত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল। অধ্যাপক ব্রুনেত্তিও অগ্নি সৎকারের জন্য একটি মডেল চুল্লি নির্মান করেছিলেন এবং তা থেকে নির্গত ছাই ১৮৭৩ সালে ভিয়েনা এক্সপোজিসন এ প্রদর্শিত হয়েছিল। সেখানে স্যার হেনরি থম্পসন, ডঃ ব্রার্ট (এফ আর সি এস), রানী ভিক্টোরিয়ার সার্জেন সহ অনেকের কাছে এই এক্সপোজিসনে প্রদর্শিত চুল্লি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্যার হেনরি থম্পসন পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে ফিরে এসেছিলেন এবং তিনি এই পদ্ধতি সম্পর্কে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে সেখান থেকে ফিরে 'The treat of the body after death' নামে একটি গবেষণাপত্র লিখেছিলেন। যা ১৮৭৪ সালের জানুয়ারিতে 'Contemporary Review' তে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্মশান ব্যবস্থা সমর্থন করার জন্য স্যার হেনরি থম্পসন এর প্রধান যুক্তি হল- "It was becoming a necessary sanitary precaution against the propagation of disease among a population daily growing larger in relation to the area it occupied".[৭৪] অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ও রোগ জীবাণুর বৃদ্ধির হার এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনতে গেলে আধুনিকভাবে শ্মশান ও অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। এছাড়াও তিনি আরও কতকগুলি অগ্নি সৎকার ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তিপুর্ন সওয়াল করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন অগ্নিসৎকার ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর সমাধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহনযোগ্যতা পাবে। অন্তেষ্টিক্রিয়ার খরচ কমিয়ে দেবে, শোক পালনকারীকে শোক পালনের সময় শোকার্ত আবহাওয়ার সংস্পর্শে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা থেকে রেহাই দেবে। স্যার হেনরি থম্পসন সাহসিকতার সাথে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। অগ্নি সৎকারের ফলে ছাই সার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেছেন। ইতালির লোদির অধ্যাপক গোরিনিকে তার আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি নির্মানের তদারকি করার জন্য

৭৪। Maria, Graham, Journal of a Residence in India, Edinburg, Constable, 1812, p. 148

ব্রিটেনে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে ক্রিমেশন সোসাইটির অনারারি সেক্রেটারি মিস্টার উইলিয়াম ইসি তাকে সহায়তা করেছিলেন। ১৭ মার্চ ১৮৭৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে একটি ঘোড়ার মৃতদেহকে দাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই দাহ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে কত দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘোড়াটি ছাইতে পরিণত হচ্ছে। তা দেখে স্যার হেনরি থম্পসন পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে সম্পূর্ণরুপে দাহ করতে গেলে প্রায় এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় একান্ত প্রয়োজন হবে এবং এত নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হবে যে চিমনি থেকে কোন ধোঁয়া বা ফ্লুয়িড নির্গত হবে না। অর্থাৎ একটি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে যে ভারতে অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার সংস্কারের পূর্বেই ইংল্যান্ড ও ইটালিতে এই ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

মহামারী ও মৃত্যু - একটি পর্যালোচনা

৩.১. পটভূমিকা

সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে 'মহামারী' ও 'মৃত্যু', এই দুটি শব্দ বোধহয় সবচেয়ে বেশি চর্চিত, আলোচিত, রচিত এবং সমালোচিত শব্দ। মহামারী ও মৃত্যু বিষয় দুটি কিভাবে সম্পর্কিত হয়েছে, অর্থাৎ বলতে চাইছি সম্পর্কের ধরনের আদান প্রদানের মধ্যে মহামারী ও মৃত্যু কিভাবে যুক্ত ও বিযুক্ত? মৃত্যু তো জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু মহামারী বা অতিমারী মৃত্যুকেই ব্যাঞ্জনাময় করে তোলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক মৃত্যু বা কম সময়ে বহু মানুষের মৃত্যুকে একটা স্বাভাবিক পরিণতি বলা যায় না। এখানেই ইতিহাসে কার্যকারণতত্ত্বে আলোচনা বা প্রসঙ্গ চলে আসে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মহামারী, অতিমারী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, কারণ মহামারী বা অতিমারী কোন দৈবিক ঘটনা নয়। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি মহামারী বা অতিমারীর কারণ হিসেবে রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, ধর্ম বহুমাত্রিক ভূমিকার অবদান রেখেছে। তাই আজও ইতিহাসে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর দুটি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, আর শ্রেণীবিভাগ থাকলেই তার একটি বর্গ নির্মান হয়। তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে মহামারী বা অতিমারীকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা, যা একই সঙ্গে দ্বান্দ্বিক আবার কিছু অর্থে বহুমাত্রিক। আমরা জানি, রোগ, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলি ঐতিহাসিকভাবেই ইউরোপ কেন্দ্রিক, সাম্প্রতিককালে তা পশ্চিমিকেন্দ্রিক অর্থাৎ জনসংখ্যার সাথে জনস্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। আর সেখানেই মহামারী বা অতিমারীর সংজ্ঞারও বিভিন্নতা আছে বলে মনে করি। অর্থাৎ প্রাচ্যের দেশে কতজনের মৃত্যু হলে মহামারী বলা যেতে পারে এবং পাশ্চাত্যে তার সংখ্যা কত এই হিসেবের তারতম্যের ফলে সেই সংজ্ঞার পার্থক্য হওয়াটা

স্বাভাবিক হতে পারে। তাই এই অধ্যায়ের গোড়াতেই এই সংজ্ঞাগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

স্বাস্থ্য- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুসারে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা হল, "A state of complete physical, mental and social well being rather than the mere absence of disease or infirmity"[১] অর্থাৎ স্বাস্থ্য বলতে রোগ ও শারীরিক অক্ষমতা থেকে মুক্ত একটি শরীরকে বোঝায় না বরং স্বাস্থ্য হল সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থ্যতা বোধের একটি অবস্থা।

জনস্বাস্থ্য- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুসারে জনস্বাস্থ্যের সংজ্ঞা হল, "The science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health, through the organised efforts of society"[২] অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য হল সমাজের সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এক রোগহীন, দীর্ঘায়িত জীবন এবং স্বাস্থ্যমুখী সমাজের বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য ধারণা দুটি পৃথক। কোনো ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উন্নতির মাধ্যমে সমগ্র জনজাতির উন্নতি সম্ভব হবে এমনটা নয়। এখানে রাষ্ট্র, আইন ও পরিবেশ সমগ্র ব্যবস্থার মৌলিক উন্নতির ফলেই জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব। ঐতিহাসিকগতভাবে যখন জনস্বাস্থ্য আমাদের আলোচনার বিষয় হয় তখন শুধুমাত্র একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। সেখানে সাধারন ভাবেই কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন চলে আসে। যেমন, কেন মানুষের মৃত্যু হার বাড়ছে, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার কারণ কি, সঠিক পুষ্টি বিন্যাস ও আর্থিক স্বচ্ছলতার

---

[১] https://www.who.int/about/governance/constitution

[২] Acheson, 1988; WHO, https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services

মধ্যে কি সম্পর্ক, প্রভৃতি প্রশ্নগুলি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। মহামারী ও অতিমারীর ইতিহাস আলোচনা শুধুমাত্র জন্ম মৃত্যু হার বা রোগ জীবাণুর ইতিহাস নয়, এখানে ঐতিহাসিকতার যে কাঠামো তার প্রাসঙ্গিকতা ও ব্যাখ্যা সমানুপাতিক ভাবেই প্রয়োজন। তা না হলে জনস্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্য আলোচনা উন্নয়ন অবনয়নের তথ্য হিসাবেই রয়ে যাবে, ইতিহাসের বলয়কে তা কখনই আলোকিত করবে না।

আসলে জনস্বাস্থ্য কি- এ প্রশ্নটি শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বা রাশি বিজ্ঞানের সন্ধর্ভে বোঝা শক্ত। স্বাস্থ্যের মধ্যে যখন 'জন' শব্দটির ধারণা গড়ে ওঠে জনস্বাস্থ্য তখন শুধুমাত্র অরাজনৈতিক বা বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে থাকে না। ঐতিহাসিকভাবে স্বাস্থ্যের ধারণার সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা, বর্ণভেদ প্রথা এমনকি মেধাবৃত্তি জড়িত অর্থাৎ, স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো ও জনসংখ্যার চাহিদা যোগানের যে অসাম্যতা সেখানেই অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় 'সোসাল চয়েস থিওরি ' বা কাদের স্বাস্থ্য সর্বাধিক প্রাধান্য পাবে তা স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক ও আলোচনার পটভূমিকা তৈরি করে। এ সম্পর্কে একজনের কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন পল ফার্মার। তিনি ছিলেন হার্ভাড মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ করা ডাক্তার এবং মেডিকেল অ্যানথ্রপলজিতে পিএইচডি। তাঁর গবেষণার কাজের জন্য তাঁকে গিয়ে থাকতে হত

হাইতিতে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন কিভাবে উন্নয়নের নামে নদীতে বাঁধ দিয়ে গোটা গ্রামটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল। সেই গ্রামের মেয়ে অ্যাসিফিকে যেতে হল শহরে কাজের তাগিদে; সেখানে মালিক ও মিলিটারিদের উগ্র যৌন লালসার পথ ধরে তার দেহে বাসা বাঁধল এইচ.আই.ভি। আর সেই খোঁজ থেকে পল তুলে আনলেন স্বাস্থ্যের সামাজিক সম্পর্ক গুলিকে। একইসঙ্গে গড়ে তুললেন স্বাস্থ্যের জৈব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। স্বাস্থ্য মানে কেবল ওষুধ বা চিকিৎসা নয়, জীবাণু বা ভাইরাসের আক্রমণ নয়, স্বাস্থ্য হচ্ছে মানুষে মানুষে সম্পর্ক। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত নরওয়েজিয়ান সমাজতাত্ত্বিক জোহান গ্যাল্টাং এর সমাজকাঠামোগত হিংসার ধারণার সাহায্য নিয়ে পল খুজে দেখতে লাগলেন 'কারা বাঁচে, আর কারা মারা যায়!'। শুধুমাত্র আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা বা সোভিয়েত ভেঙ্গে তৈরি হওয়া দেশগুলিতেই নয়, আমেরিকাতেও লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে রোগে, বিনা চিকিৎসায়, অপচিকিৎসায়। পল দেখালেন, কিভাবে অনাহার, অশিক্ষা, দারিদ্র ও স্বাস্থ্য পরিসেবার অভাবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে আছে মানুষের স্বাস্থ্য; আবার এও দেখালেন কিভাবে অস্বাস্থ্যের কারণগুলিকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আফ্রিকার স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসনে দেশগুলিকে যুগ পরম্পরায় হতাশায় রেখে দেওয়া হল যার পরিণতি রোগের নিরবিচ্ছিন্ন আক্রমণ ও অকাল মৃত্যু। অথচ এর জন্য দায়ি করা হতে লাগল চাপিয়ে দেওয়া অসহায়তা বয়ে বেড়ান মানুষগুলোকেই। বলা হল অসংযমী জীবনযাপনই তাদের রোগের মূল কারণ। এর বিরুদ্ধে পল ও তার সহযোগীরা বললেন, উন্নত বিশ্ব তাদের শোষণের ভিতর দিয়ে রোগটা দেবে, কিন্তু ওষুধ দেবে না সেটা হতে পারে না। পলের বাস্তব গবেষণা দেখাল, কিভাবে 'রোগ নিরাময়ের চেয়ে ভাল হল রোগ প্রতিরোধ'- এই আপ্তবাক্যের আড়ালে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রতিজ্ঞা বিসর্জন দিয়ে গঠন করা

হচ্ছে নির্বাচিত গুটিকয় ক্ষেত্রকে, অধুনা যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে স্বাস্থ্য বিমার মত ঘোর অস্বাস্থ্য কর্মসূচি।[৩]

মহামারী- মহামারী বলতে বোঝায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কোন নির্দিষ্ট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশে কোন রোগের দ্রুত বিস্তার হওয়া।

অতিমারী- অতিমারী সাধারণত এমন মহামারীকে বোঝায় যা বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়ে বিপুল সংখ্যক লোককে প্রভাবিত করে।[৪]

এখানে বলা প্রয়োজন কতগুলি জায়গায় কতটা রোগের প্রভাব দেখা দিলে তাকে অতিমারী বলা হবে সেটা পরিষ্কার নয়। সাধারণত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন মহাদেশে এই রোগের প্রকোপগুলির সন্ধান, ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ও মৃত্যু হার বিবেচনা করে তাকে মহামারী বা অতিমারী ঘোষণা করে থাকে।

ঘটনা	সূচনা	শেষ	মৃত্যু (লক্ষ)
ব্ল্যাক ডেথ (কালো মৃত্যু)	১৩৩১	১৩৫৩	৭৫
ইতালীয় প্লেগ	১৬২৩	১৬৩২	২.৮
সিভিল এর মহামড়ক	১৬৪৭	১৬৫২	২০

[৩] Paul Farmer: প্রকৃত ব্যাধিটিকে চিনেছিলেন, কুমার রানা, ১৫ই মার্চ, ২০২২, আনন্দবাজার পত্রিকা।

[৪] Principles of Epidemiology , Third edition, Atlanta, Georgia: Centers for Disease Control and Prevention. 2012

লন্ডনের গ্রেট প্লেগ	১৬৬৫	১৬৬৬	১
মার্সেইয়ের মহামড়ক	১৭২০	১৭২২	১
প্রথম কলেরা মহামারী	১৮১৬	১৮২৬	১
দ্বিতীয় কলেরা মহামারী	১৮২৯	১৮৫১	১
রাশিয়া কলেরা মহামারী	১৮৫২	১৮৬০	১০
গ্লোবাল ফ্লু মহামারী	১৮৮৯	১৮৯০	১০
ষষ্ঠ কলেরা মহামারী	১৮৯৯	১৯২৩	১
এনসেফ্যালাইটিস লেথার্গিকা মহামারী	১৯১৫	১৯২৬	১৫
স্পেনীয় ফ্লু	১৯১৮	১৯২০	১০০০
এশিয়ান ফ্লু	১৯৫৭	১৯৫৮	২০
হংকং ফ্লু	১৯৬৮	১৯৬৯	১০
এইচ১এন১	২০০৯	২০১০	২.০৩

মহামারী

তালিকাঃ বিশ্ব মহামারীর সময়কাল ও মৃত্যু পরিসংখ্যান[৫]

	১৮১৫	**১৮১৬**	**১৮১৭**	**১৮১৮**	**১৮১৯**
জ্বর	৬৪৫	৪৪২	৪৯৩	৬৬৮	৮৩৯
আমাশয়	১০৮১	৮৫২	১২৬৯	৯৫১	১০৮৩
কাশি এবং ফুসফুস ঘটিত রোগ	২২৩	১৫৩	১৪৭	১৪৯	১৪০
কলেরা	১৮২	১৪১	১৩২৩	২৭৭৫	৮৮৯
অন্যান্য বিভিন্ন রোগ	৪৬৫	২৩৫	৩২৬	২২৭	১৪২
মোট	**২৫৯৬**	**১৮২৩**	**৩৫৫৯**	**৪৭৭১**	**৩০৯০**

তালিকাঃ অগ্নিসৎকারের জন্য কাশী মিত্র ঘাটে নিয়ে যাওয়া মৃতদেহের সংখ্যা[৬]

৩.২. প্লেগ

উনিশ শতকের শেষের দিকে প্লেগ পূর্বভারতে মহামারী হিসেবে দেখা দিয়েছিল। বিশেষত কলিকাতার বড়বাজার, চেতলা এবং ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা, বিশেষত যেখানে কুলি মজুরদের বাসস্থান

[৫] রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী, বিজ্ঞান কথা, বিশেষ কোভিড সংখ্যা, বিজ্ঞান প্রসার।

[৬] Mark Harrison, A dreadful scourge: cholera in early nineteenth-century India, Modern Asian Studies, 54(2), page 502–553.

সেইসব অঞ্চলে প্লেগ দ্রুত মহামারীর আকার ধারণ করে। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে রেলপথ আবিষ্কার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মহামারী দ্রুত গ্রামে, গঞ্জে ও শহরে বিস্তারলাভ করে। প্লেগ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার, প্রথমতঃ প্রাথমিক ভাবে প্লেগ মহামারী নিম্ন বর্গের শ্রমিক ও কুলি মজুর শ্রেণীকে আক্রান্ত করেছিল, যা পরোক্ষ ভাবে উচ্চবিত্তদের আক্রান্ত ও প্রভাবিত করেছিল। দ্বিতীয়তঃ প্লেগ মহামারীর আক্রমণ, প্রসার এবং বিস্তারের সময়কাল বাংলার উনিশ শতকের নবজাগরণের শেষের দিকে, অর্থাৎ একই সঙ্গে এক আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক মানসিকতার জন্ম ও সনাতনপন্থীদেরও তরল অবস্থান প্লেগ মহামারীকে উনিশ শতকিয় বঙ্গীয় নবজাগরণের যে আলোর বিচ্ছুরণ তাকে সরাসরি প্রতিরোধ করেছে। একদিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, অপরদিকে নব্য উদীয়মান বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ, যা আবার নির্ভরশিল নিম্নবর্গিয় সমাজের উপর। সেজন্যই প্লেগ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ঠাকুরবাড়ির পরিবার পরিজন ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও স্বক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছিল।[৭]

প্রকৃতপক্ষে, প্লেগ মহামারীকে শুধুমাত্র একটি মহামারী, মৃত্যু ও আতঙ্ক হিসেবে দেখলে হবে না, এই মহামারী ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থাকে যে প্রভাবিত করেছিল, তার কারণগুলি উপরে উল্লিখিত। রোগ ও প্রতিরোধ এই দুটি শব্দ আসলে ব্যাঞ্জনাময়। ব্যাঞ্জনাময় এই অর্থে যে, রোগ হলে তা কি আপনিই সেরে উঠবে অর্থাৎ দৈবচক্রে, নাকি রোগের কারণ অনুসন্ধান ও তার নিরাময় করছে যে সমাজ, সেই সমাজের বিজ্ঞান চেতনা এবং গবেষণা কতটা অগ্রসারিত তার উপর। অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপে যে ধরণের আধুনিক বিজ্ঞান চেতনা ও চর্চা শুরু হয়েছিল তার প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পড়েনি বা পড়তে দেওয়া হয়নি, কারণ পশ্চিমি বিজ্ঞান তখন

[৭] শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, কলকাতা, মাইতি পাবলিকেশান, পৃ. ৪৩।

শুধুমাত্র একটি উপযোগীয় বিজ্ঞান নয়, যা পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইউরোপে একসময় আদর্শ ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপীয় ঘরোয়া রাজনীতির জাতীয়তাবাদের প্রসার আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্পর্কিয় জ্ঞানের চেয়েও তা একধরনের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসন যন্ত্রের তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল যা সেই তৎকালীন সমাজের শাসক ও শাসিতের সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল। প্লেগ মহামারী রোধ করবার উপায় হিসেবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রেরও কোন একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলনা। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, এই রোগটি এমন একটি রোগ যা শুধু মাত্র গ্রামে বা গঞ্জে হয়েছে বা শুধুমাত্র শহরের কোন প্রান্তে হয়েছে, তা নয়। বরং এই রোগটির প্রসার মূলত বন্দর এলাকার কাছাকাছি বসতিগুলিতে এবং বিভিন্ন ষ্টেশন সংলগ্ন বসতিগুলিতে দেখা যাচ্ছিল যা ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছিল। ফলত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো কোন একমাত্রিক নীতি নিতে পারছিলনা যা এই মহামারীকে ক্রম হ্রাসমান করবে। ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চায় প্লেগের আলোচনা মূলত বোম্বে শহর কেন্দ্রিক এবং অধিকাংশ গবেষকেরই গবেষণার বিষয় প্লেগ রোগের আতঙ্ক ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। David Arnold এর মতে, বোম্বে শহরে প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করার কারণের মূলে বোম্বাই শহরে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা ও অধিকাংশ জনগণের মনে পশ্চিমি বিজ্ঞানের প্রতি অবিশ্বাস ও তার বদলে বিভিন্ন লৌকিক আচার বিচারের উপর বিশ্বাস প্লেগকে বোম্বে শহরে বিস্তার লাভ করতে সাহায্য করেছিল[৮]। অপরদিকে Raj Chandravarkar এর মতে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কঠোর ও বিদ্বেষ মূলক নীতি প্লেগকে মহামারীর আকার ধারণ করতে সাহায্য করেছিল অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর কঠোর বিধিনিষেধের ফলে

[৮] David Arnold, 'Plague: Assault on the Body', in *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-century India*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1993, pp. 200-39.

প্লেগ রোগ গোষ্ঠী সংক্রমণের আকার ধারণ করেছিল।[৯] Ira Klein এর মত, প্লেগ মহামারী আসলে, পশ্চিমের অপ্লেগীয় ধারণা ও ভারতীয় জনপ্রিয় জনসংস্কৃতির দ্বন্দের ফল।[১০] এ তো গেল পশ্চিমের বোম্বে শহরের কথা কিন্তু পুর্ব ভারতেও কাঠামোগতভাবে একই ধরনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এখানেও পশ্চিমি বিজ্ঞানের ব্যর্থতা ও অবিশ্বাস, অপরদিকে লৌকিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসংস্কৃতি প্লেগকে পুর্ব ভারতেও মহামারীর আকার ধারণ করতে সাহায্য করেছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে কঠোর বিধিনিষেধের ফলে ধর্মঘট, বিদ্রোহ এমনকি কলিকাতা ও তার শহরতলিতে দাঙ্গা পর্যন্ত হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় কি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র একই ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল? আসলে কি, জনসংস্কৃতির মধ্যে একটি ধারণা জন্মাচ্ছিল বা গুজব রটছিল যে মহামারী হল প্রকৃতপক্ষে উচ্চবর্গের তৈরি করা একটি ধারণা যা গরিব মানুষকে রুটি-রুজি, বেঁচে থাকার অধিকারকে বঞ্চিত করে। ঐতিহাসিক অরবিন্দ সামন্ত প্রশ্ন তুলেছেন, এই যে জনগণের মধ্যে যে গুজব ও ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল প্লেগ সম্পর্কে, তা কি যৌক্তিক এবং তথ্যগত ভাবে সঠিক?[১১] উনিশ শতকের শেষ দিকে পশ্চিমি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও এই রোগ সম্পর্কে খুব কম জানতেন। তাদের কাছে কি কোন সুনির্দিষ্ট ওষুধ ছিল প্লেগ রোগের নিষ্পত্তির জন্য? যদিও অনেক ফিরিঙ্গী ডাক্তারবাবু দাবি করতেন যে তারা এই রোগ নিরাময় করতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে একটি কথা ঐতিহাসিকগতভাবে প্রশ্ন হিসেবে উত্থাপন করা যেতে পারে যে, প্লেগ রোগ সম্পর্কে ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কিছু জানতো না এ কথা

---

[৯] Rajnarayan Chandravarkar, ‘Plague Panic and Epidemic Politics in India, 1896-1914’, in Terence Ranger and Paul Slack, eds., *Epidemics and Ideas: Essays on the Historical Perception of Pestilence,* Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp. 203-40.

[১০] Ira Klein, ‘Plague, Policy and Popular Unrest in British India’ *Modern Asian Studies,* 22, 4, (1988), p. 739.

[১১] Arabinda Samanta, ‘Living with epidemics in colonial Bengal 1818-1945’, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2018, pp 109-110.

কি সত্যিই ঠিক? কারণ, ইউরোপীয় জনগণ প্লেগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল ও তা মহামারীর আকার ধারণ করেছিল চৌদ্দ শতকে এবং অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের পতনের কারণ হিসেবে প্লেগ মহামারীর অন্যতম ভূমিকা ছিল। তা হলে এটি কিভাবে সম্ভব যে, উনিশ শতকের শেষার্ধেও পশ্চিমি চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাছে প্লেগ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা ছিল না। বিশেষত পূর্ব ভারতে বাংলায় প্লেগ যখন মহামারীর আকার নিচ্ছে তখন মানুষ যতনা ভয় পেয়েছিল মৃত্যু মিছিলে তার চেয়ে বেশী ভয় পেয়েছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দ্রুততা, অমানবিক ও অসহনীয় নীতির কারণে। যদিও ঐতিহাসিক অরবিন্দ সামন্ত দাবি করেছেন প্লেগ মহামারীর গোষ্ঠী সংক্রমণ রুখতে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা, ভ্যাক্সিনের আয়োজন, ওয়ার্ড হাসপাতালের নির্মাণ, এ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা বাড়ানো নিঃসন্দেহে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু, তা প্রয়োজনীয় অঞ্চলে নেওয়া হয়নি। ঔপনিবেশিক সরকারের এই অসাম্য উদ্যোগ জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাংলার জনগণকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, প্লেগ মহামারী রুখতে সরকার যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চাইছে তা এই মহামারী ঠেকাতে সক্ষম হবে। আর এই ব্যার্থতার কারণ হিসেবে জনমানসে গুজব, সন্দেহ, গোষ্ঠী চেতনা ও সামগ্রিক ভাবে এক মানসিক বিভ্রান্তিকর বিভাজনের জন্ম নিয়েছিল যা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে স্বদেশী বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে। আবার একথাও সত্য নয় যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে সতর্কতা মূলক পদক্ষেপগুলিতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়নি, যেমন স্মলপক্সের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো, জনপ্রিয় জনমানস ও জনসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য ছিল বলেই স্মলপক্সের ক্ষেত্রে সফলতা অধিক পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়াও ভ্যাকসিন গ্রহণের ক্ষেত্রেও জনমানসে উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার কাঙ্খিত ফল প্লেগ মহামারী প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পায়নি, তার অন্যতম কারণ দেশীয় ভেষজ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও পশ্চিমি বিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্রের

অভাব, যার ফলে সাধারণ মানুষ সেই অর্থে প্লেগ মহামারীর ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলপ্রসূতার ব্যার্থতার দিকটিকে বিশ্বাসে পরিণত করেছিল, এছাড়াও দেশজ ভেষজ চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর এক ধরণের অন্ধ বিশ্বাস জন্মেছিল যা কিছুটা উনিশ শতকিয় নবজাগরণের সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অবস্থানগত দ্বন্দ্বের সঙ্কট বলে মনে করা হয়।

চিত্রঃ বোম্বে শহরের একটি বাড়ির দেওয়ালে বৃত্ত একে প্লেগ রোগের মৃত্যুর হিসেব রাখা হচ্ছে[১২]

[১২] যতীন্দ্র কুমার সেন, একটি বিগত স্মৃতি, *দেশ*, ১৭ই জুন, ২০২১, পৃষ্ঠা ১৪

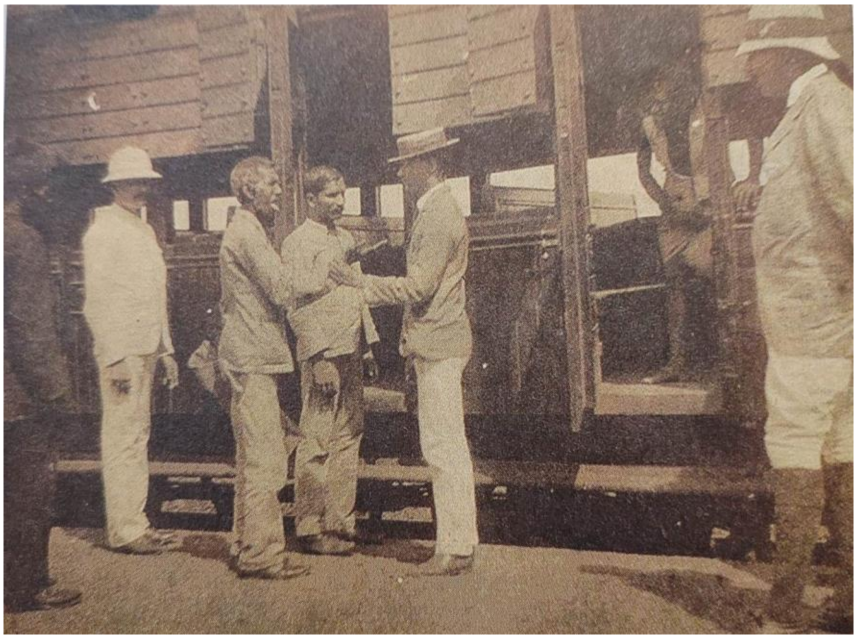

চিত্রঃ ১৮৯৭ সালে ট্রেনের যাত্রীকে পরীক্ষা করা হচ্ছে[১৩]

[১৩] যতীন্দ্র কুমার সেন, একটি বিগত স্মৃতি, দেশ, ১৭ই জুন, ২০২১, পৃষ্ঠা ১৪

চিত্রঃ উনিশ শতকের শেষের প্লেগ বিধ্বস্ত বোম্বে শহরের জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া[১৪]

৩.৩. ম্যালেরিয়া

চৈনিক সভ্যতায় ম্যালেরিয়া রোগটি প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে পরিচিত বলে মনে করা হয়। চীনের সবচেয়ে প্রাচীন চিকিৎসামূলক গ্রন্থ, “The Nei Ching or Canon of medicine” যা চার হাজার সাতশ বছর পূর্বে রচিত। সেখানে প্রথম এই রোগটির উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা আছে বারংবার খিঁচুনি দিয়ে জ্বর ও এর সাথে বৃহদাআকার প্লীহা মহামারীর ন্যায় প্রকোপ ফেলেছিল সেই সময়।[১৫] সিন্ধু সভ্যতায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান যেমন বেদ (মূলত অথর্ব বেদ), পুরাণ এর গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন প্রকার জ্বরের উপসর্গগুলির মধ্যে কিছু উপসর্গ ম্যালেরিয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[১৬] অথর্ব বেদ সংহিতার প্রথম কান্ড, পঞ্চম অনুবাক, চতুর্থ সুক্ত এর চারটি মন্ত্র-

প্রথম মন্ত্রঃ যদগ্নিরাপো অদহৎ প্রবিশ্য যত্রাকৃথন ধর্মপ্‌তো নমাংসি। তত্র ত আহুঃ পরমং জনিং স নঃ সংবিদ্বান পরি বৃদ্ধি তক্মন ॥ ১।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা— মন্ত্রটি বড় সমস্যামূলক। সূক্তানুক্রমণিকায় দেখতে পাই, জ্বর ইত্যাদি রোগ-নিবারণে এই মন্ত্র এবং এর পরবর্তী মন্ত্র-কয়েকটি প্রযুক্ত হয়। ঐকাহিক, দ্বি-আহিক (একদিন, দুদিন) প্রভৃতি জ্বর, কম্পজ্বর, সন্তত (জ্বালাযুক্ত বা সন্তাপক) জ্বর, বেলাজ্বর প্রভৃতি বিদূরিত করবার

---

[১৪] যতীন্দ্র কুমার সেন, একটি বিগত স্মৃতি, দেশ, ১৭ই জুন, ২০২১, পৃষ্ঠা ১৪

[১৫] Hoeppli, R. 1959. Parasites and parasitic infections in early medicine and science. University of Malaya, Singapore, Singapore.

[১৬] Bruce-Chwatt, L. J. 1965. Paleogenesis and paleoepidemiology of primate malaria. Bull. W. H. O. 32:363–387.

জন্য মন্ত্র-প্রয়োগের সার্থকতা। সেই অনুসারে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, সূক্তানুক্রমণিকায় তা নিম্নরূপে বিবৃত হয়েছে;

দ্বিতীয় মন্ত্রঃ যদ্যর্চির্যদি বাসি শোচিঃ শকল্যেষি যদি বা তে জনিং। হ্রূভুর্নামাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান পরি বৃদ্ধি তক্মন্ ॥ ২॥

মন্ত্রার্থ–আলোচনা –এই মন্ত্রে দুরকম সম্বোধন আছে। এক সম্বোধন–তক্মন্ (পূর্ব মন্ত্রে আমরা এই পদটির অর্থ আমনন করেছিলাম–পাপ প্রবৃত্তি); অন্য সম্বোধন দেব। মন্ত্রার্থে দুই সম্বোধন একজনকে লক্ষ্য করে প্রযুক্ত হয়েছে বলেও মনে করা যায়;–আবার দুই সম্বোধনের লক্ষ্য যে দুরকম স্বতন্ত্র বস্তু, তা-ও মনে করতে পারি। পূর্বোক্ত দুরকম অর্থে আমরা এই দুই ভাবই ব্যক্ত করেছি। একরকম অর্থে তক্মন সম্বোধনে (পূর্বের মন্ত্রের ন্যায়) পাপকে সম্বোধন করে তাকে দূর হতে বলা হয়েছে; আর, সে পক্ষে দেব সম্বোধনে দেবতার অনুগ্রহের প্রার্থনা রয়েছে। দ্বিতীয় রকম অর্থে, পাপকেই যেন মিনতি করে বলা হচ্ছে,–হে পাপ! আর আমায় কষ্ট দিও না। যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছ। এখন তুমি আমায় ত্যাগ করো।

তৃতীয় মন্ত্রঃ যদি শশাকো যদি বাভিশোকো যদি বা রাজ্ঞো বরুণস্যাসি পুত্রঃ। হ্রূভুর্নামাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান পরি বৃদ্ধি তক্মন্ ॥ ৩

"এই মন্ত্রে তক্ম পদে শীতজ্বরকে, কম্পজ্বরকে সম্বোধন করা হয়েছে, –এটাই ভাষ্যের অভিমত।"

চতুর্থ মন্ত্রঃ নমঃ শীতায় তক্মনে নমো রূরায় শশাচিষে কৃণোমি। যো অন্যেরুভয়রভ্যেতি তৃতীয়কায় নমো অস্তু তক্মনে ॥ ৪

মূলত চতুর্থ মন্ত্রার্থ আলোচনাটি সরাসরি এখানে তুলে ধরা হল- “এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তা এইরকম, শীতজনক কৃচ্ছ্রজীবনকারী রোগকে নমস্কার করি। আর শীতান্তরভাবী শোষক জ্বরকে নমস্কার করি। পরদিনে অর্থাৎ অদ্য যে শীতজ্বর আসে, দ্বিতীয় দিনে যে শীতজ্বর আসবে, তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি দিনে যে শীতজ্বর হবে, ঐকাহিক দ্বি-আহিক, ত্রি-আহিক চাতুর্থিক ইত্যাদি (এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি দিবসে) সকল প্রকার শীতজ্বরকে আমার নমস্কার প্রাপ্ত হোক। এই রকম নমস্কারে প্রীত হয়ে জ্বর আমাদের পরিত্যাগ করুক।”[১৭]

এই সূত্র ধরে মনে করা যেতে পারে প্রায় তিনহাজার বছর আগে ম্যালেরিয়া ভারতে প্রবেশ করে। বৈদিক উদ্ধৃতির কিছু আগে অর্থাৎ, প্রায় সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার বছরের পুরনো সুমেরীয়[১৮] ও মিশরীয়[১৯] প্রাচীন লিপিতে ম্যালেরিয়া ঘটিত জ্বর এবং বৃহদাআকার প্লীহার বর্ননা পাওয়া যায়। এমনকি মেসোপটেমিয়া সভ্যতার যে অঞ্চলে পত্তন ও বিস্তার লাভ হয়েছিল সেটিকেও ম্যালেরিয়া প্রবণ বলে মনে করা হয়। ৩২৩ খ্রিস্টপুর্বাব্দে, প্রায় দুই হাজার বছর পরে, আলেকজান্ডার দি গ্রেট মেসোপটেমিয়া হয়ে ভারতে আসার পথে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।মনে করা হয় উনার মত একজন সুস্থ, তরতাজা যুবক একমাত্র *Plasmodium falciparum* দ্বারাই আক্রান্ত হয়ে ম্যালেরিয়ায় মারা যান। কারণ, *Plasmodium falciparum* দ্বারা আক্রান্ত হলেই একমাত্র প্রাণহানির আশঙ্কা থেকে থাকে, তা সে মানুষ যত সুস্থ দেহের অধিকারীই হন।

---

[১৭] https://www.ebanglalibrary.com/101043০১।০৫-প্রথম-কাণ্ড-পঞ্চম-অ/

[১৮] Sarton, G. 1959. A history of science. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

[১৯] Ebbell, B. 1937. The papyrus Ebers: the greatest Egyptian medical document. Copenhagen, Denmark.

ম্যালেরিয়া শব্দটির অর্থ হল ‘বিষাক্ত বায়ু’। বিজ্ঞানের ইতিহাসের অগ্রগতির সাথে সাথে রোগ জীবাণুর ইতিহাসও আলোকিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী ম্যালেরিয়ার জীবাণুর নাম *Plasmodium* এবং তার বাহক বা মাধ্যম হল স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা। এই মশার কামড়ে মানব দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে এবং লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে থাকে। সায়েন্টিফিক্‌ আমেরিকার তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে বর্তমানে ১২৫ ধরনের ম্যালেরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া ঘটিত জ্বর মূলত স্তন্যপায়ী বিভিন্ন প্রাণী, পাখী এবং সরীসৃপদের আক্রান্ত করে থাকে। এদের মধ্যে *Plasmodium* গণের মাত্র চারটি প্রজাতি দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়। এগুলি হল *Plasmodium falciparum, Plasmodium maleriae, Plasmodium vivax* and *Plasmodium ovale.* ঐতিহাসিক ভাবে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে লিখিত দলিল পাওয়া যায় ১৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বে প্রাচীন মিশর সাম্রাজ্যে। আনুমানিক একহাজার বছর পর গ্রীক সভ্যতায় ম্যালেরিয়া রোগের পুনরায় আবির্ভাব হয়। বেশীরভাগ প্রাচীন ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপিগুলিতে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হিসেবে আদ্র বায়ুকে দায়ী করা হয়েছে। তাই ম্যালেরিয়া শব্দের অর্থ হল ‘বিষাক্ত বায়ু’।[২০]

ভারতবর্ষের এক সংস্কৃত পণ্ডিত ‘চরক সুশ্রুত’ নামক গ্রন্থে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হিসেবে কোন বিষাক্ত পতঙ্গের যোগসূত্রের সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগের প্রকৃত কারণ, উৎস ও প্রতিকার আবিষ্কার করতে ব্যার্থ হন তৎকালীন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকগণ। সপ্তদশ শতকে একদল স্প্যানিশ জাজক ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে জ্বর নিরাময়ের এক আশ্চর্য ঔষধের সন্ধান পান। কিছু নির্দিষ্ট গাছের বাকল মিশ্রিত রস পান করার মাধ্যমে ভারতীয় কবিরাজগণ জ্বর নিরাময় করতেন। তারা এই গাছের বাকল ইউরোপে নিয়ে যান। পরবর্তিকালে পেরুর ভাইসরয় কাউন্টেস অফ সিংকোন,

[২০] https://www.scientificamerican.com/article/when-was-malaria-first-di/

ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলে তারা সেই বাকলের রস তাঁকে প্রয়োগ করেন। আশ্চর্যজনক ভাবে তিনি আরোগ্য লাভ করলে তার নামানুসারে গাছের নাম রাখা হয় সিঙ্কোনা।[২১]

মুঘল শাসনের বাংলায় আধুনিক জনস্বাস্থ্যের ধারণা ও পরিকাঠামো না থাকায় ব্রিটিশ সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকারের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার S. C. Majumdar এর মতে, যদি জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে দ্রুত প্রশাসনিক উদ্যোগ না নেওয়া হয় তা হলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সংক্রামক ব্যাধি রোধ করা অসম্ভব হবে এবং বিশেষত গৌর বাংলায় প্রাক ব্রিটিশ শাসনের সময় যে রকম আঞ্চলিক পরিবেশ ছিল তার আবার পুনর্বিভাব হতে পারে।[২২] জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাক্ ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক পর্বে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদদের কাছেই গ্রহণযোগ্য ও গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল, কিন্তু যখন ব্রিটিশ বাংলায় জনস্বাস্থ্য ও মহামারী ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে অবহেলার কারণ রইল না তখন তারা জন্ম-মৃত্যুহার ও ভারতীয় জনসমাজের শ্রেণীবিভাগের দিকেও সক্রিয় ভাবে মনোনিবেশ করছিল। অবশ্য এর পিছনে দুটি কারণ হতে পারে। এক, প্রশাসন চালাতে ভারতীয় বিশেষত বাঙালি সমাজে একটি বর্গীয় শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন ছিল। দুই, এই শ্রেণীবিভাগের মাধ্যমেই তারা কোন শ্রেণীর জনস্বাস্থ্যের 'সুস্বাস্থ্যের' প্রয়োজন তা তাদের ভাবনাচিন্তার মধ্যে এসেছিল।[২৩] কারণ সংক্রামক ব্যাধি ভারতে অবস্থানকালিন ব্রিটিশ নাগরিকদেরও মৃত্যুহারে প্রভাব ফেলেছিল। উনিশশতক ও বিংশশতকে মৃত্যুহার ব্রিটিশ শাসন যন্ত্রকেই প্রভাবিত করেছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের উত্থান ইউরোপীয় ব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল, যা অনেক ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ

---

[২১] https://www.lib.cam.ac.uk/rcs/projects-exhibitions/products-empire-cinchona-short-history

[২২] S. C. Majumdar, Rivers of the Bengal Delta (Calcutta, 1942), p. 77.

[২৩] Ira Klein, Malaria and mortality in Bengal, 1840-1921, Indian Economic and Social History Review, 9, no. 2, 1972, p. 133.

বিজ্ঞানীদের অবদান বলেই ঔপনিবেশিক শাসকরা মনে করত। ১৮৭১ থেকে ১৯২১ সালের সেন্সাসে ভারতীয় জন সংখ্যা বৃদ্ধি খুব আশানুরূপ ছিল না। এমনকি বিশ্বের জন সংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখেও তা আশা ব্যাঞ্জক নয়। জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি শুধুমাত্র জনস্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, কারণ জনস্বাস্থ্য আবার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর নির্ভিরশীল অনেকাংশে। তাই অর্থনৈতিক উন্নতির সূচকগুলি ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২৪] ব্রিটিশ প্রশাসন এই জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণকে চিহ্নিত করতে জন্ম ও মৃত্যুহারের কারণকে সামাজিক আর্থিক এবং পরিবেশগত পরিবির্তনকেই দায়ী করেছিল। সেই সময় ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থাৎ মৃত্যুহার কমানোর মত আভ্যন্তরিন ক্ষমতা ছিল। কারণ ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের মত বৃহদাকারে পপুলাশন মাইগ্রেশনের সমস্যা ছিল না যা সমসাময়িক অন্যান্য দেশে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় জনসংখ্যা ক্রম হ্রাসমান হচ্ছিল কারণ ম্যালেরিয়া, দূর্ভিক্ষ, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, আন্ত্রিক যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়েছিল। সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে ম্যালেরিয়াই গ্রামীণ বাংলাকে সর্বচ্চ আঘাত করেছিল। ব্রিটিশ শাসনে গ্রামীণ বাংলায় তিনভাগের মধ্যে দুই ভাগ মৃত্যুর জন্য দায়ি ম্যালেরিয়া। যশোর জেলায় ম্যালেরিয়ায় দুহাজার মানুষের মৃত্যুর পরিসংখ্যান মেডিকেল সার্ভিস গেজেটে পাওয়া যায়। নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় জটিল সংক্রামক জ্বরের পাঁচভাগের মধ্যে দুই ভাগের কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর। ঢাকাতে সেই সময় বেশীরভাগ পরিসংখ্যানে প্রায় আটহাজার মৃত্যু ম্যালেরিয়াতে হয়েছিল বলে উল্লেখ করা আছে।[২৫]

---

[২৪] Morris D. Morris, "Towards a Reinterpretation of Nineteenth Century Indian Economic History," Journal of Economic History, XXIII (1963), pp. 606-618, particularly p. 611. See

[২৫] C. A. Bentley, Report on Malaria in Bengal (Calcutta, 1916), pp. 6-9. (for both graph)

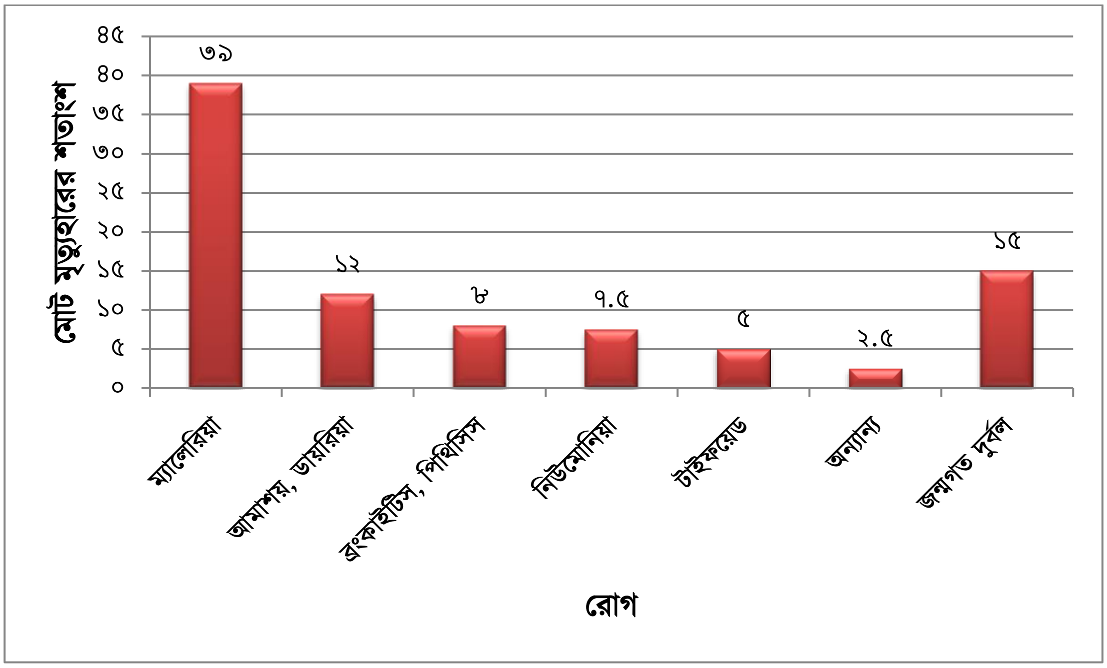

যশোর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ

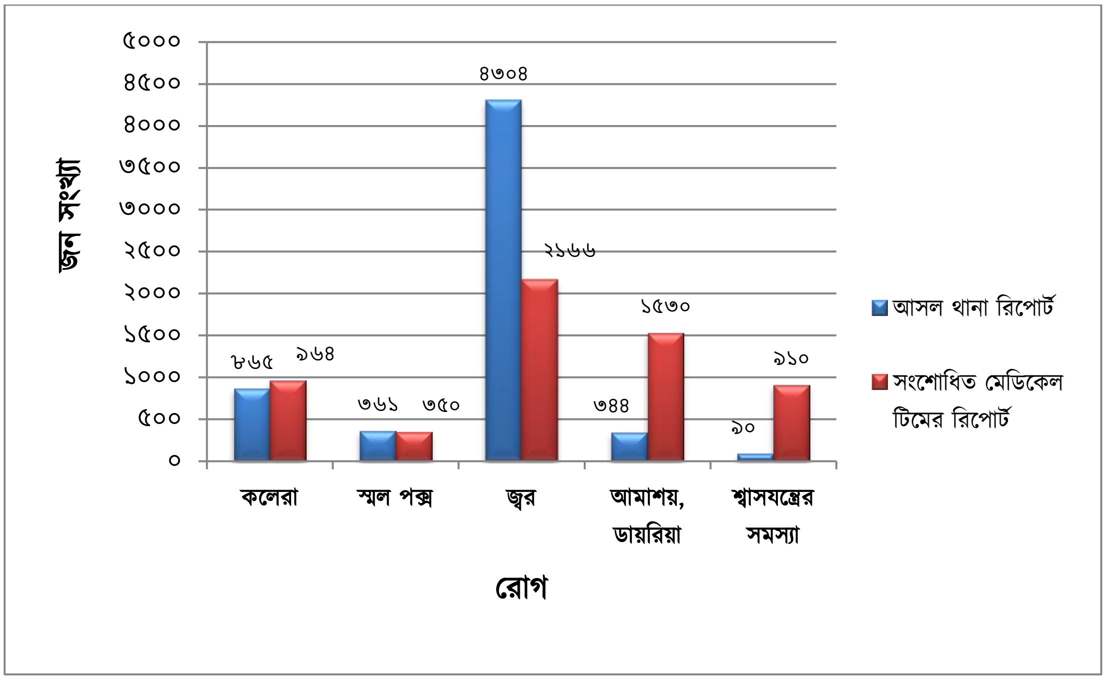

ঢাকা

ম্যালেরিয়ায় প্রধানত শিশু ও গর্ভবতি মহিলারাই বেশী আক্রান্ত হয়েছিল, যার ফল স্বরূপ জন্মহার ব্যাপক ভাবে কমে যাচ্ছিল। জনৈক ব্রিটিশ অফিসারের মতে, ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ সালে হুগলীতে জনসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি কমে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তাই নয় ম্যালেরিয়ার ফলে মহিলাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রজনন ক্ষমতা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, অনেকেই বন্ধ্যাত্বের শিকার হয়েছিল। এই অধিক মৃত্যুহার ও কৃষি সমাজের মধ্যে একটি সমানুপাতিক সম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল যা ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে কাম্য ছিল না।[২৬] বাংলায় ম্যালেরিয়া ঐতিহাসিকদের কাছে অধিক আকর্ষনীয় ও বহুমাত্রিক গবেষণার দাবি রাখে, তার কারণ Charles A Bentley (১৯০৭ থেকে ১৯২৫), তিনি স্যানিটারি কমিশনের কমিশনার ছিলেন এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলার দায়িত্ব সামলে ছিলেন। Bentley ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত প্রকরণগ্রন্থ, পুস্তিকা রচনা করেন। Bentley এর ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণার প্রধান বিশেষত্ব হল, জনঘনত্ব বিশ্লেষণ করা, ভৌগোলিক সীমা ও জনঘনত্বের মধ্যে একটি সুস্থিত সম্পর্ক স্থাপন করা এবং ম্যালেরিয়ার ফলে কিভাবে অর্থনীতির অবক্ষয় হচ্ছিল তা অনুধাবন করা।[২৭] তাত্ত্বিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন ভারতীয়দের দেহে অনাক্রম্যতা দুর্বল হওয়ায় সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বেশী , যদিও এটি প্রমাণিত নয় যে ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অনাক্রম্যতাই মুখ্য কারণ।[২৮] একথা সত্য যে ম্যালেরিয়াই বাংলায় প্রথম মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছিল, বিশেষত যশোর, হুগলী, নদীয়া জেলায়

[২৬] Ira Klein, Malaria and mortality in Bengal, 1840-1921, Indian Economic and Social History Review, 9, no. 2, 1972, p. 135.

[২৭] Bentley, C.A., Director of Public Health, to the General Director, IHB, RF, New York, 19 June 1924, Box 201, RG 5, Series 1.2, Bengal 466, Folder 2560.

[২৮] Ira Klein, Malaria and mortality in Bengal, 1840-1921, Indian Economic and Social History Review, 9, no. 2, 1972, p. 136.

ম্যালেরিয়া রোগীর আক্রান্তের সংখ্যা সর্বচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। ঐতিহাসিকরা মনে করতেন পশ্চিমবঙ্গ পুর্ববঙ্গের তুলনায় পরিবেশগত কারনে স্বাস্থ্যকর অঞ্চল কিন্তু অদ্ভুত ভাবে এই বঙ্গেই ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উদাহরন স্বরূপ ১৯১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সাত শতাংশ জনসংখ্যা ম্যলেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। অপরদিকে পুর্ববঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক কম। মোট জনসংখ্যার তিরিশ শতাংশ ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।[২৯]

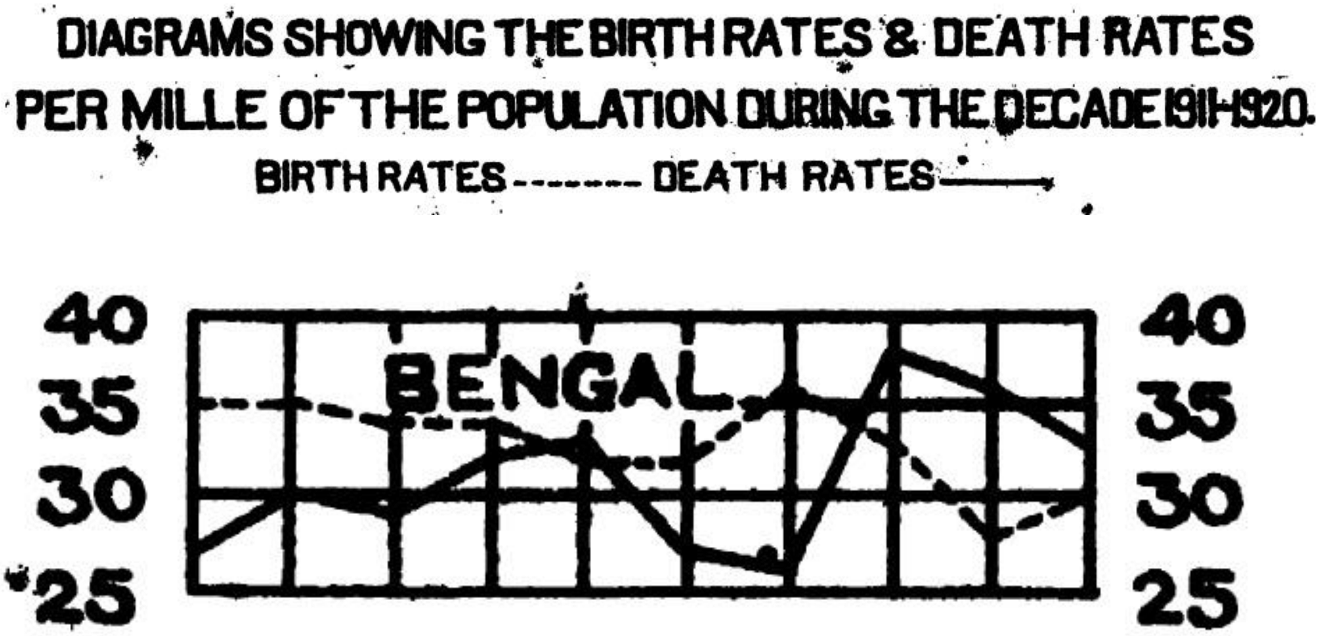

চিত্রঃ বাংলার জনসংখ্যার জন্মমৃত্যু হার ১৯১১-১৯২০[৩০]

[২৯] Census of India, 1921, V, Part 1, pp. 49-55; Parliamentary Papers, Cmd. 2047, LXIV, 1904, "General Report on the Census of India," 1901, pp. 47-53; Bentley, Malaria and Agriculture, p. 103.

[৩০] Census of India, Volume-I, 1924, p.14.

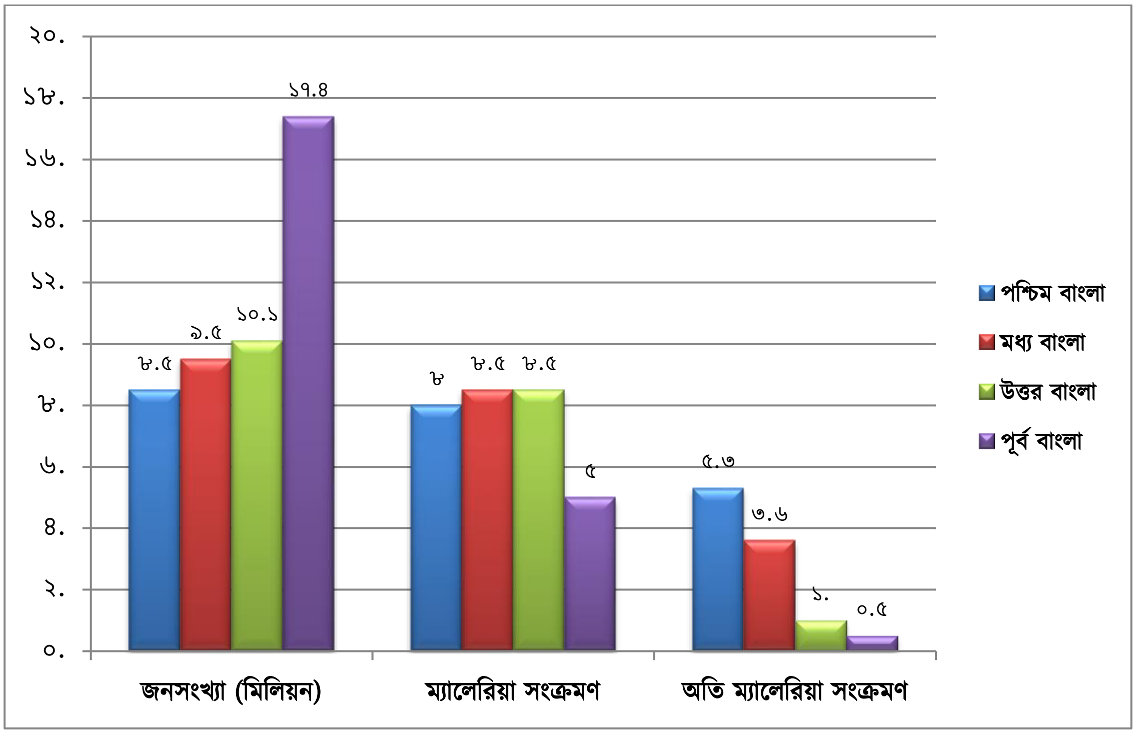

চিত্রঃ বাংলায় অঞ্চল ভিত্তিক ম্যালেরিয়া ও অতি ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ

উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে বর্ধমান জেলা একটি স্বাস্থ্যকর জেলা হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে, যদিও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বর্ধমান জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল সর্বচ্চ। এমনকি উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধে ম্যালেরিয়া সহ অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য বর্ধমান এ নিয়ে আসা হত। ১৮৬৮ সালে বর্ধমানকে "A good reputation for salubrity" এর আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। একই সময় মেদিনাপুর জেলাও ম্যালেরিয়ার কবল থেকে অনেকাংশে মুক্ত হয়েছিল। সিভিল সার্জেন্ট Dr. Sheridan ব্যাখ্যা করেছেন মেদিনাপুর জেলা একটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে নদীয়া জেলায় সবচেয়ে বেশী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল, সেই নদীয়া জেলাও একটি স্বাস্থ্যকর জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল ("famous as health resort")। এমনকি Warren Hastings সহ ব্রিটিশ প্রশাশনিক কর্তারা নদিয়াতে তাদের খামারবাড়ি নির্মান

করেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসন মনে করত যে সব অঞ্চলে তাদের পশ্চাদসরণ হয়েছে যেমন ব্যান্ডেল, হুগলী, চুঁচুড়া সেখানে জনস্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল।[৩১]

৩.৪. কলেরা

মহামারীর সামাজিক ইতিহাসে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ও তার প্রসার সুদূর প্রসারি, যা মহামারীর ইতিহাসের বৃত্তায়নকেই সম্পূর্ণ করে।[৩২] গত পঞ্চাশ বছর আগেই কলেরা রোগের প্রভাব এবং তার যে একটি সামাজিক ইতিহাস আছে সে সম্পর্ক ইতিহাসের পাঠকের কাছে আনেন ঐতিহাসিক Asa Briggs।[৩৩] কলেরা সম্পর্কে অসাধারণ গবেষণা করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোসেনবার্গ।[৩৪] তিনি দেখিয়েছেন রোগ জীবাণুর ইতিহাস মানব উন্নয়নের মধ্যে (Human development) মানুষের যে আর্থিক সক্ষমতা তার সাথে রোগ প্রতিরোধ ও জীবাণু বংশ বিস্তারের সম্পর্ক আছে।[৩৫] ঐতিহাসিক ম্যাকগ্রিউ রাশিয়াতে কলেরা রোগের সামাজিক ইতিহাস মিয়ে বহু চর্চিত ও মূল্যবান গবেষণা করেছেন।[৩৬] ঐতিহাসিক ডুরে ব্রিটেনে কলেরা রোগের সামাজিক ও রোগ জীবাণুর ইতিহাসে যে

---

[৩১] Bentley, Report on Malaria, pp. 30-33.

[৩২] Arabinda Samanta, ‘Living with epidemics in colonial Bengal 1818-1945’, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2018, pp 55.

[৩৩] Briggs, Asa, ‘Cholera and Society in the Nineteenth Century’, *Past and Present,* no. 19, 1961, pp. 76-96.

[৩৪] Charles E. Rosenberg, The Cholera Years the United States in 1832, 1849 and 1866, The University of Chicago Press, 1987

[৩৫] Ibid.

[৩৬] Roderick E. McGrew, Russia and the Cholera, 1823-1832 Hardcover – January 1, 1965, University of Wisconsin Press, January 1, 1965

ইউরোপীয়করণ তাঁর বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ করেছেন। উপরিউক্ত ঐতিহাসিকরা মূলত অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন মহামারীর তাৎক্ষণিক বিপর্যয় ও তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া।[৩৭] এ প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক তথ্য দেওয়া প্রয়োজন যে কলেরা মহামারীরও একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা আছে। উনিশ শতকে কলেরা সম্পর্কে একটি শব্দ চালু ছিল- "এশিয়াটিক কলেরা", যার কেন্দ্রস্থল হল ভারতবর্ষ। মনে করা হত কলেরা মহামারীর আদি মাতৃভূমি হল ভারতবর্ষ ("habitual dominion")। ভারতবর্ষের অপরিচ্ছন্ন জলাভূমি ও জঙ্গল অধিক মাত্রায় থাকার ফলে তা রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে দিয়ে ইউরোপে পৌঁছেছিল বলে মনে করা হয়।[৩৮] ভারতীয় প্রেক্ষিতে আরোও বলা যায় উপনিবেশায়ন ও তার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার কিভাবে সমানুপাতিক নয় বরং ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্কে সম্পর্কায়িত, আর তা নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন ঐতিহাসিক ডেভিড আরনল্ড।[৩৯] পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক ইরা ক্লেইন দীর্ঘ মহামূল্যবান ঐতিহাসিক গবেষণা করেছেন।[৪০] কিন্তু, তাদের গবেষণার মূল কাঠামোই হল যে আর্থ সামাজিক ও পরিবেশের সঙ্গে মহামারীর সম্পর্ক। এখানেই ঐতিহাসিক অরবিন্দ সামন্ত প্রশ্ন তুলেছেন যে, একজন রোগী কিভাবে মহামারীকে দেখছেন ও মহামারী তো শুধু রাষ্টীয় নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধ নয়, মহামারী কোথাও ব্যক্তি ও সমূহের মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল সেই সঙ্কটাপর্ণ সামাজিক অবস্থার প্রতিবিম্ব তৎকালীন বহু ঐতিহাসিকের

---

৩৭ Michael Durey, The Return of the Plague: British Society & the Cholera, 1831-32, Humanities Press Intl, October 1st 1979.

৩৮ Asa Briggs, Cholera and Society in the Nineteenth Century, *Past & Present*, Volume 19, Issue 1, April 1961, Pages 76–96, https://doi.org/10.1093/past/19.1.76

৩৯ David Arnold, 'Cholera and Colonialism in British India', *Past and Present*, no. 113, 1986, pp. 118-51.

৪০ Ira Klein, 'Imperialism, Ecology and Disease: Cholera in India, 1850- 1950', *The Indian Economic and Social History Review*, vol. 31, no. 4, 1994, pp. 491-518; 'Death in India, 1871-1921', *Journal of Asian Studies*, vol. XXXII, no. 4, pp. 639-59.

গবেষণায় অনুপস্থিত। ঐতিহাসিক সামন্ত প্রশ্ন তুলেছেন উনিশ শতকের যে আধুনিকতার বয়ান বা উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে যে চলমান প্রক্রিয়া সেখানে কি কলেরা মহামারী কোন প্রণিধানযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল? এরপর তিনি আরও বলছেন এই কলেরা মহামারী সম্পর্কে সনাতন ভারতীয় সমাজ কি ব্যবস্থা নিয়েছিল বা পুনর্বিবেচনা করেছিল যাতে করে পূর্বত সনাতন সমাজের যে দেহ ও মনের ধারণা, শরীর ও পরিবেশের সম্পর্ক তা কি নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়ার সম্ভবনা তৈরি হয়েছিল? কারণ উনিশ শতকেই পরোক্ষ ভাবে জীবাণুর সংজ্ঞা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছিল যেখানে, জীবাণু শুধুমাত্র একটি দেহের শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ার মধ্যে নয়, তা দেহের গভীরতর আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানকেও প্রভাবিত করেছিল এই দেহ সম্পর্কিয় জ্ঞানের উন্নততর ধারণা তৎকালীন ভারতীয় সমাজকে নতুন সঙ্কটে ফেলেছিল।

রোগ প্রতিরোধে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকা কেবল অতীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই ঔপনিবেশিক পর্বেই এক ধরণের দ্বৈতখাত বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্য চিন্তা গড়ে উঠতে থাকে (অমর্ত সেন, জ দ্রেজ, কুমার রানা, স্বাস্থ্য চিন্তা, প্রতিচী ট্রাষ্ট) যা উপনিবেশ উত্তর স্বাধীন রাষ্ট্রকেও প্রভাবিত করেছে পরোক্ষ ভাবে। বিশেষত, মিসেল ফুকোর "বায়ো পাওয়ার" ধারণার উত্থানের পিছনে মহামারী ও জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের ভূমিকাকে আলাদা করে সনাক্ত করা হয়েছে। পরাধীন থাকার কারণে উপনিবেশ দেশ সমূহ এই বায়ো পাওয়ারের সুবিধা পায়নি বা আদায় করতে পারেনি।[৪১] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল যখন লর্ড হেস্টিংগস এর উত্তারাধিকার লর্ড আমহার্স্ট ভারতবর্ষে এলেন। তিনি দেখলেন ভারতবর্ষে কলেরা মহামারীর আকার নিয়েছে। ১৮১৮ এর মারাঠা যুদ্ধে কলেরা মহামারী ভারতবর্ষকে বিধ্বস্ত করে তুলেছিল আর তখনই বলা যেতে পারে প্রথমবারের জন্য

[৪১] সাহিত্য, অতিমারি ও সমাজ, বিনায়ক সেন, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, খণ্ড ৩৮, বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৭।

ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের কাছে এই মহামারী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঐতিহাসিকভাবে কলেরা শুরু হয়েছিল দক্ষিণ এশিয়ায় তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন সংস্কৃত বইতে যেখানে কলেরাকে “সিতাঙ্গ” ও “বিসুচি” এই শব্দগুলি দ্বারা অভিহিত করা হয়[৪২]।এর ভারতীয় নাম হল “murree”, অর্থাৎ মারাত্মক সংক্রামণ। একই ভাবে ইংরেজি শব্দ ল্যাতিন “mori” থেকে ইংরেজি “murrain” শব্দটি এসেছে বলে মনে করা হয়। সংস্কৃত শব্দে কলেরার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল “বিসুচিকা”। ম্যাক ফারসন ১৮৭২ সালে কলেরা রোগকে মনে করেছিলেন পাকস্থলি ও অন্ত্রের সমস্যা। উনিশ শতকেই সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ ও প্রাচ্য বিশারদ ডঃ এইচ্ এইচ্ উইলসন কলেরাকে স্প্যাসমোডিক কলেরা বলে মনে করেছিলেন[৪৩]। ডঃ মার্টিন হগ মনে করেছিলেন কলেরা কোন একটি একমাত্রিক সংজ্ঞা ছিলনা। কলেরা রোগের প্রকোপ ও বিভিন্ন পর্যায়, তার বিভিন্ন নামকরণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়-

সংস্কৃত নাম	**উপসর্গ**
বিসূচিকা	বমি ও রেচক পদার্থ
অলসিকা	খিল ধরা
বিলম্বিকা	শারীরিক পতন বা কোলাপ্স্
দন্ড শালিকা	অনড় অবস্থা

[৪২] F. Hewitt, *The History of British Settlements in India*, London: no pub., 1855, pp. 272-4, cited in *Extracts from Records of Past Epidemics in India, 1912*, National Archives of India (hereafter NAI), New Delhi.

[৪৩] John K. Macpherson, *Annals of Cholera: From the Earliest Periods to the Year 1817*, London: Ranken and Drury, 1872, p. 9.

তালিকাঃ কলেরা রোগের প্রকোপ ও তার বিভিন্ন শারীরিক পর্যায়[৪৪]

এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন আমলেই এর চিকিৎসা বলা যেতে পারে এর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। ডঃ ওয়াইস এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সুশ্রুত প্রস্তাবনা করেছিলেন, এক জটিল পাঁচন মিশ্রণের ঔষধ পান করলে এই রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। সেগুলি হল- হরিতকি ভেজানো জল, বচের মূল, হিঙ চূর্ণ, কুর্চি (কুটজ, ইন্দ্রযব, ইন্দ্রজৌ, বৎসক, কলিঙ্গ, প্রাবৃষ্য, শক্রপাদপ, সংগ্রাহী, পান্ডুরদ্রুম, মহাগন্ধ, কোটিশ্বর নামেও এটি পরিচিত[৪৫]) ফুলের বীজ, লাল রসূন, সৈন্ধব লবণ ও অতিবিষা (আতইচ) এর সমপরিমাণ মিশ্রণ চূর্ণ গরম জল সহযোগে[৪৬]।অপরদিকে চরক (আরো এক বিখ্যাত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক) কলেরা রোগের উপশম নিরুপম করার আর একটি উপায় সম্পর্কে অভিহিত করেন। যা হল আফিম ও কালো মরিচের মিশ্রণ। এটি পান করলে কঠিন জ্বর থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব।[৪৭]

১৭৬১ থেকে ১৭৮১ সালের মধ্যে কলেরা মহামারী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু, ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা গেল না। অপরদিকে একটি বিতর্ক শুরু হল এটি মহামারী না অতিমারি। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন এটি মূলত একটি মহামারী যা নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যাকায় সীমাবদ্ধ ছিল।[৪৮] মূলত গাঙ্গেয় উপত্যাকায় তীর্থযাত্রিদের মাধ্যমে এই মহামারী শহরাঞ্চলে ছড়িয়েছিল। প্রথম কলেরা মহামারী হিসেবে দেখা গেল ১৮১৭ সালের আগস্ট মাসে কুম্ভ

---

৪৪ Ibid.

৪৫ https://bn.wikipedia.org/wiki/কুর্চি

৪৬ T.A. Wise, *Commentary on the Hindu System of Medicine*, London: Forgotten Books, 1845, p. 330.

৪৭ Macpherson, op. cit., p. 26.

৪৮ J.N. Hays, *Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History*, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2005, p. 193.

মেলায় উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যাকায় এবং তা যশোর শহরে ছড়িয়ে পড়ল যা উত্তর পূর্ব কলকাতা থেকে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত।[৪৯] যশোর জেলা এমনিতেই প্রচুর জলাভূমি ও নিকাশি ব্যবস্থা কম থাকায় কলেরা মহামারীর সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রচুর পরিমাণে বাতাসে জলীয় বাস্পের বৃদ্ধি ও নিকাশি ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের বায়ুর চলমানতার কম হওয়ার কারণ হল গাঙ্গেয় অঞ্চলের প্রচুর বৃষ্টি ও প্লাবন, যার ফলে রোগ জীবাণুর প্রাদুর্ভাব অন্যান্য জেলার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৫০] যশোর থেকে এই মহামারী কলিকাতা শহরে পৌঁছায়।যদিও কলিকাতা তখন নেটিভ বা ব্ল্যাক টাউন ও মফঃস্বল এই দুই বর্গে বিভক্ত ছিল। কলিকাতা থেকে তা দ্রুত ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়ে। একমাত্র আউধ ও রোহিলখন্ড ব্যতিক্রম। পুরো আগস্ট মাস জুড়ে কলেরা মহামারী দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ভাগলপুর, মুঙ্গের, নাটোর ও সিলেট অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করে তুলেছিল। ১৫ ই সেপ্টেম্বর বালাসোর, পূর্ণিয়া, কটক, ১৭ ই সেপ্টেম্বর বক্সার, ১৮ ই সেপ্টেম্বর ছাপড়া ও গাজীপুর, ৫ ই নভেম্বর মির্জাপুর, বুন্দেলখন্ড এবং সবশেষে ৮ ই নভেম্বর সিন্ধ অঞ্চলের সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় ডিভিসনে কলেরা মহামারীর প্রাদূর্ভাব লক্ষ্য করা যায়।[৫১]

---

[৪৯] Hewitt, op. cit.

[৫০] Arabinda Samanta, *Malarial Fever in Colonial Bengal: Social History of an Epidemic*, Calcutta: Firma KLM, 2002.

[৫১] Frederick A. Corbyn, *Treatise on the Epidemic Cholera, as it has Prevailed in India; Together with the Report of the Medical Officers, Made to the Medical Boards of the Presidencies of Bengal, Madras and Bombay, for the Purpose of Ascertaining a Successful Mode of Treating that Destructive Disease; And a Critical Examination of All the Works which have Hitherto appeared on the Subject*, Calcutta: Bengal Establishment, 1832. p. 6, T 11417, OIOC, BL, London.

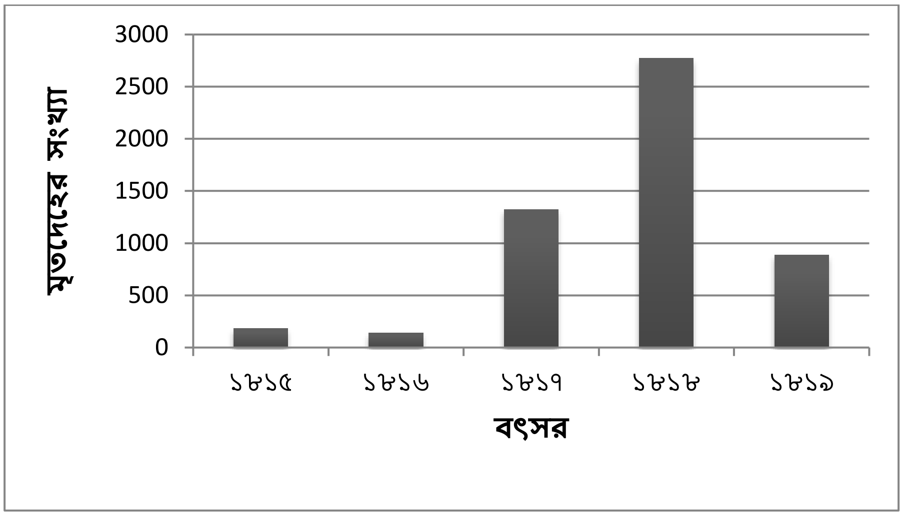

অগ্নিসৎকারের জন্য কাশী মিত্র ঘাটে নিয়ে যাওয়া কলেরায় আক্রান্ত মৃতদেহের সংখ্যা[৫২]

[৫২] Mark Harrison, A dreadful scourge: cholera in early nineteenth-century India, Modern Asian Studies, 54(2), page 511.

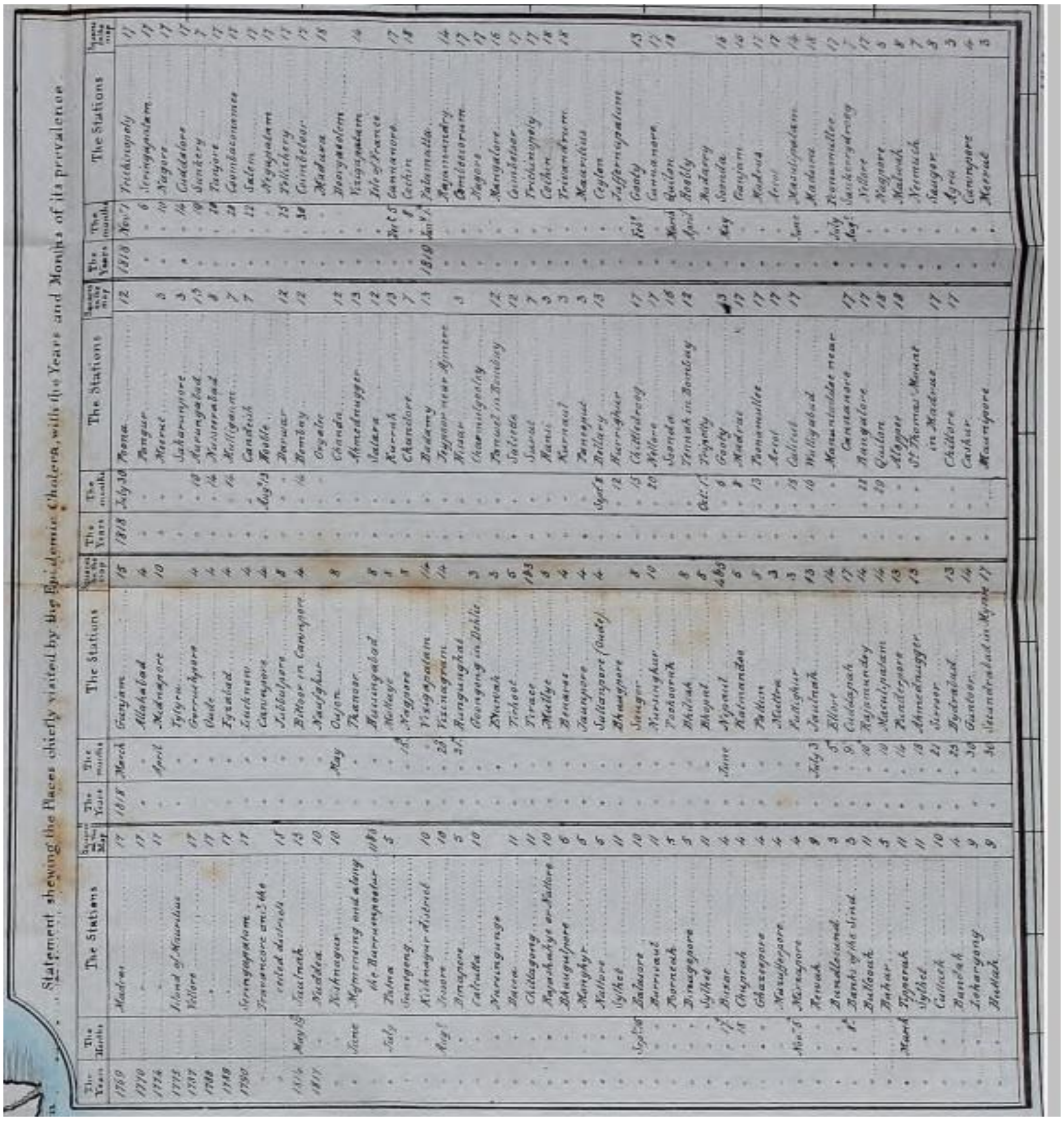

চিত্রঃ যে স্থানগুলি মূলত মহামারী কলেরা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, বছর ও মাস সহযোগে তার বিবরণ[৫৩]

[৫৩] Frederick A. Corbyn, *Treatise on the Epidemic Cholera, as it has Prevailed in India; Together with the Report of the Medical Officers, Made to the Medical Boards of the Presidencies of Bengal, Madras and Bombay, for the Purpose of Ascertaining a Successful Mode of Treating that Destructive Disease; And a Critical Examination of All the Works which have Hitherto appeared on the Subject*, Calcutta: Bengal Establishment, 1832., T 11417, OIOC, BL, London.

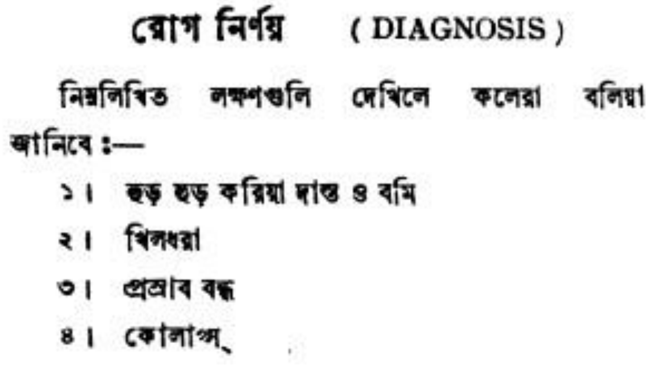

রোগ নির্ণয় (DIAGNOSIS)

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখিলে কলেরা বলিয়া জানিবে :—

১। হুড় হুড় করিয়া দাস্ত ও বমি

২। খিলধরা

৩। প্রস্রাব বন্ধ

৪। কোলাপ্স্

চিত্রঃ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কলেরা রোগের নির্ণয়[৫৪]

---

[৫৪] শ্রী অরুণ কুমার মুখপাধ্যায়, সচিত্র কলেরা চিকিৎসা, পৃষ্ঠা ১৭, ১৩৩০, মানসী প্রেস, কলিকাতা।

R হাইড্রারজ সাবক্লোর— ১/৬ গ্রেণ

ক্যাম্ফার— ১/৬ গ্রেণ

সোডি বাইকার্ব্ব— ২ গ্রেণ

সুগার অফ মিল্ক— ৩ গ্রেণ

এক মাত্রার পুরিয়া। অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর এক একটি পুরিয়া দিবে—৮ পুরিয়া—তাহার পরে একঘণ্টা অন্তর, যতক্ষণ না দাস্তের রং সবুজ বা হলদে হয়।

যদি পেটফাঁপ থাকে, তবে উপরিউক্ত পুরিয়ার সহিত অয়েল সিনামন ১/২ ফোঁটা বা মেন্থল ১/৬ গ্রেণ মিশাইয়া দিবে।

চিত্রঃ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কলেরার প্রথম স্টেজের চিকিৎসা[৫৫]

রোগীকে যদি দ্বিতীয় অবস্থায় প্রথম পাও তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দেখিতে হইবে যে ইন্ট্রাভিনাস স্যালাইন চিকিৎসার প্রয়োজন কি না? যদি দেখ—

(১) হাতে নাড়ী পাওয়া যায় না, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১০৫৪ এর কম নহে

(২) রোগী অস্থির, নীলবর্ণ ও খিল ধরিতেছে

(৩) যদি দেখ রক্তের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১০৬০এর উপর হইয়াছে (নাড়ী ভাল থাকা সত্বেও)

(৪) যদি দেখ ২৪ ঘণ্টা প্রস্রাব বন্ধ—

তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইন্ট্রাভিনাস সেলাইনের বন্দোবস্ত করিবে।

উপরিউক্ত লক্ষণগুলির যে কোন একটি পাইলেই ইন্ট্রা-ভিনাস দিতে হইবে।

চিত্রঃ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কলেরার দ্বিতীয় স্টেজের চিকিৎসা[৫৬]

[৫৫] শ্রী অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, সচিত্র কলেরা চিকিৎসা, পৃষ্ঠা ২১, ১৩৩০, মানসী প্রেস, কলিকাতা।

[৫৬] শ্রী অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, সচিত্র কলেরা চিকিৎসা, পৃষ্ঠা ২৩, ১৩৩০, মানসী প্রেস, কলিকাতা।

কলেরায় স্যালাইন কিরূপে তৈয়ারী করিতে হয়।—কলেরায় তিন প্রকার স্যালাইন ব্যবহৃত হয়, যথাঃ—এলক্যালাইন, হাইপারটনিক ও রেক্ট্যাল।

এলক্যালাইন।

℞ সোডিয়াম ক্লোরাইড বা
টেব্‌ল্ সল্ট—৬০ গ্রেণ
সোডি বাইকার্ব—১৬০ গ্রেণ
ডিষ্টিল্‌ড্ জল—১ পাইণ্ট

চিত্রঃ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কলেরার স্যালাইন তৈরির ফর্মুলা[৫৭]।

হাইপার টনিক।

℞ সোডিয়াম্ ক্লোরাইড—১২০ গ্রেণ
ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড—৪ গ্রেণ
ডিষ্টিল্‌ড্ জল—১ পাইণ্ট

একত্রে ১০ মিনিটকাল ফুটাও ও তুলা দিয়া পূর্ব্বের মত মত বোতলে ছাঁকিয়া ফেল।

যদি পল্লীগ্রামে ডিষ্টিল্‌ড্ জল না পাওয়া যায়, তবে যে কোনও পরিষ্কার জল তুলার ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া দশ মিনিটকাল ফুটাইয়া লইলেই চলিবে।

চিত্রঃ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কলেরার হাইপার টনিক স্যালাইন তৈরির ফর্মুলা[৫৮]

[৫৭] শ্রী অরুণ কুমার মুখপাধ্যায়, সচিত্র কলেরা চিকিৎসা, পৃষ্ঠা ২৭, ১৩৩০, মানসী প্রেস, কলিকাতা।

[৫৮] শ্রী অরুণ কুমার মুখপাধ্যায়, সচিত্র কলেরা চিকিৎসা, পৃষ্ঠা ২৮, ১৩৩০, মানসী প্রেস, কলিকাতা।

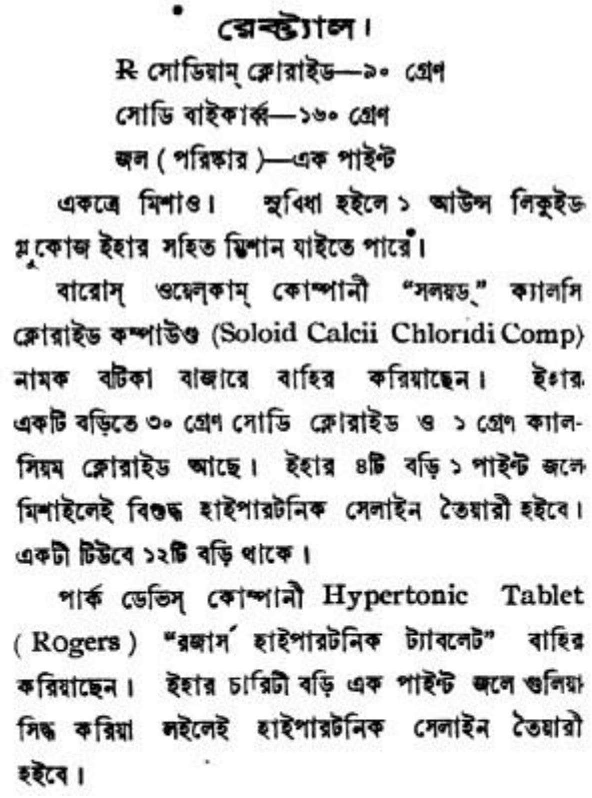

রেক্ট্যাল।

R সোডিয়াম্ ক্লোরাইড—৯০ গ্রেণ

সোডি বাইকার্ব্ব—১৬০ গ্রেণ

জল (পরিষ্কার)—এক পাইণ্ট

একত্রে মিশাও। সুবিধা হইলে ১ আউন্স লিকুইড গ্লুকোজ ইহার সহিত মিশান যাইতে পারে।

বারোস্ ওয়েলকাম্ কোম্পানী "সলয়ড্" ক্যালসি ক্লোরাইড কম্পাউণ্ড (Soloid Calcii Chloridi Comp) নামক বটিকা বাজারে বাহির করিয়াছেন। ইহার একটি বড়িতে ৩০ গ্রেণ সোডি ক্লোরাইড ও ১ গ্রেণ ক্যাল-সিয়ম ক্লোরাইড আছে। ইহার ৪টি বড়ি ১ পাইণ্ট জলে মিশাইলেই বিশুদ্ধ হাইপারটনিক সেলাইন তৈয়ারী হইবে। একটী টিউবে ১২টি বড়ি থাকে।

পার্ক ডেভিস্ কোম্পানী Hypertonic Tablet (Rogers) "রজার্স হাইপারটনিক ট্যাবলেট" বাহির করিয়াছেন। ইহার চারিটী বড়ি এক পাইণ্ট জলে গুলিয়া সিদ্ধ করিয়া লইলেই হাইপারটনিক সেলাইন তৈয়ারী হইবে।

চিত্রঃ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে কলেরার রেক্টাল স্যালাইন তৈরির ফর্মুলা[৫৭]

৩.৫. স্মলপক্স

গুটি বসন্ত বা স্মল পক্স (একটি ভাইরাস বাহিত রোগ) ভাইরাসের সাথে মানুষ সহবাস করেছে প্রায় তিন হাজার বছর। বেশকিছু মিশরীয় মমির দেহ থেকে এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে যা তিন হাজার বছরের কাছাকাছি প্রাচীন। এরপর চতুর্থ শতকের বেশ কিছু চিনা প্রাচীন পুঁথিতে এর বিবরণ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতকে প্রথম এই ভাইরাসটি চীন ও কোরিয়া থেকে জাপানে প্রবেশ করে বাণিজ্যের হাত ধরে। কিন্তু ইতিহাসের অভিধানে এই স্মলপক্স মহামারীর রূপ ধারণ করে যখন চিন

[৫৭] শ্রী অরুণ কুমার মুখপাধ্যায়, সচিত্র কলেরা চিকিৎসা, পৃষ্ঠা ২৯, ১৩৩০, মানসী প্রেস, কলিকাতা।

আর ইউরোপের রোমান সভ্যতার জনঘনত্ব ধারন ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ক্রমবর্ধমান হিউম্যান মুভমেন্ট এর দরুন মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণ হু হু করে বেড়েছে।

চিত্রঃ মিশরের পঞ্চম রামসেসের মমিকৃত মাথা (মৃত্যু ১১৫৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে), মস্তকের গুটিকাকার ক্ষতগুলি দেখে মনে করা হচ্ছে গুটি বসন্তের কারণে এগুলি হতে পারে (স্মিথ ১৯১২)।[৬০]

স্মলপক্স প্রাচ্য থেকে ইউরোপে প্রবেশ করে ৭১০ A.D তে। দেখা যায় প্রাচীন গ্রিসে স্মলপক্স ও মিসল্ এর কোন অতীত ইতিহাস এর আগে ছিল না। পাঁচজন ইউরোপীয় সম্রাট এর মৃত্যু হয় স্মল পক্সের ভাইরাসের দ্বারা। আর ১৫২০ সালে Hernando Corte's নামক এক স্পেনিয়র এর হাত ধরে আমেরিকায় প্রবেশ করে স্মল পক্স। পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায় 'অ্যাজটেক' ও 'ইনকা'র আদিম জনগোষ্ঠী। সম্প্রতি কিছু বিচ্ছিন্ন আদিম জনগোষ্ঠী যেমন এস্কিমো, এছাড়া নিউগিনি

[৬০]https://www.cdc.gov/smallpox/history/history.html#:~:text=Highlights%20from%20History%3A,of%20western%20Africa%2C%20bringing%20smallpox. Photo courtesy WHO.

ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু জনগোষ্ঠীর উপর থাবা বসায় স্মলপক্স, কিন্তু এই বিধ্বংসী ঝড় অল্পের উপর হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এরা রক্ষা পেয়েছে।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় সাহিত্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে প্রচুর গবেষণাধর্মী ও গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাচূর্যতাও বেশি। আর একটি বিশেষ তাৎপর্য লক্ষণীয় যে অধিকাংশ লেখায় এক বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ আছে। স্মলপক্স একটি প্রাণঘাতী ভাইরাস যা তৎকালীন গবেষকদের লেখায় উঠে এসেছে। উপনিবেশিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় তার সংকট ও বিভিন্ন লেখায় এটি আলোচিত ও সমালোচিত দুই হয়েছে।[৬১] আর একদল গবেষক ও ঐতিহাসিকদের লেখায় স্মলপক্সের আর্থ সামাজিক ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব প্রাধান্য পেয়েছে অর্থাৎ অসুখ বিসুখ রোগ জ্বালা শুধুমাত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হবে না, প্রাক ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক আমলে স্বাস্থ্য, খাদ্য বন্টন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও স্মলপক্সের আলোচনার অন্যতম প্রেক্ষিক ও তা গুরুত্বহীন নয়।[৬২]

হলওয়েল- একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক, যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরি করতেন, তার মতে স্মল পক্স এর আবির্ভাব ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকেই। তথ্য হিসেবে তিনি বলেছিলেন অথর্ব বেদে তার উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে হলওয়েল এর দাবিকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন Hirsch (১৮৮৩) এবং Hopkins (১৯৮৩)। কিন্তু এই মতের বিরোধিতা করেছেন ভারত নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিকোলাস (১৯৮১)। তাঁর মতে ভারতবর্ষে স্মলপক্স জনিত চিকিৎসা সংক্রান্ত যেসব নথি

---

[৬১] Anil Kumar, *Medicine and the Raj*: *British Medical Policy in India, 1835- 1911*, New Delhi: Sage, 1998.

[৬২] Poonam Bala, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective*, New Delhi and London: Sage, 1991.

পাওয়া গেছে তাতে স্মলপক্সকে 'মসূরিকা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই 'মসূরিকা'- এই শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে অথর্ব বেদের অনেক পরে মূলত খ্রীস্ট পরবর্তী যুগে। 'মসূরিকা' শব্দটির অর্থ হল একপ্রকার চর্ম রোগ। স্মলপক্সের যে উপসর্গ তার থেকে এর উপসর্গ কিছুটা ভিন্ন।[৬৩]

অনুমান করা যায়, ৩২৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীতে স্মল পক্সের দ্বারা অধিকাংশ সৈন্য আক্রান্ত হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন মিশরীয় বণিকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও স্মল পক্সের দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে স্মল পক্সের বিস্তার বেশি হয়েছিল। নদনদীর বিস্তার বাণিজ্য বিস্তারের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় স্মল পক্স গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৬৪]

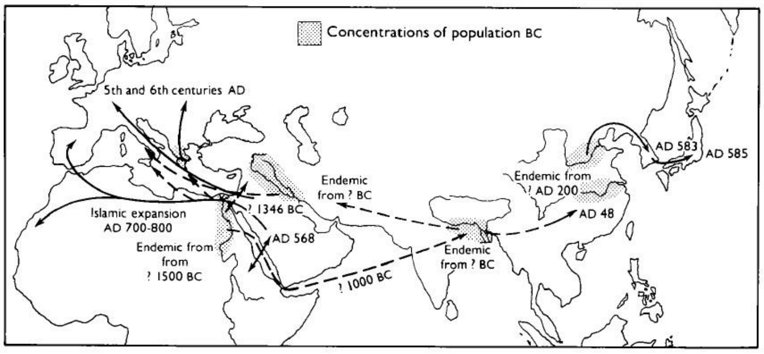

"Plagues": ? smallpox	Writers or books	Place	Date
Hittites 1346 BC	Suśruta	India	? BC
Syracuse 595 BC	Ko Hung	China	AD 340
Athens 430 BC	Ahrun	Alexandria	AD 622
Antonine AD 165	Vagbhata	India	AD 600–700
Mecca AD 568	Al-Razi	Baghdad	~ AD 910
	Ishinho	Japan	AD 982

[৬৩] Holwell, J.Z. (1 767) *An account ofthe manner ofinoculating for small pox in the* East *Indies,* London, College of Physicians. Reprinted in: Dharampal (1971) *Indian science and technolofy in the e&teenth century: some contemporay ~uropeanac counts,* ~elhiI,m pex ~ndiap, p. 143-163.

[৬৪] Fenner, Frank, Henderson, Donald A, Arita, Isao, Jezek, Zdenek, Ladnyi, Ivan Danilovich. Et al. (1988). Smallpox and its eradication / F. Fenner ... [et al.]. World Health Organization. Chapter 5, pp- 214. https://apps.who.int/iris/handle/10665/39485

চিত্রঃ প্রাচীন বিশ্বে স্মল পক্স কোন পথে বিস্তার লাভ করেছিল তার একটি ঐতিহাসিক আনুমানিক মানচিত্র।

স্মলপক্স নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুই ধরণের মনভাব লক্ষ্য করা যায়। একটি হল স্মল পক্সের বিজ্ঞান সম্মত ধারণা। অপরতি হল স্মল পক্সের সাথে জরিত বিবিন্ন লকাচার, আঞ্চলিক দেব্দেবির আবির্ভাব ও তার থেকে মুক্তির পথ হিসেবে অলৌকিকতার আশ্রয় নেওয়াএবং লক্ষ্যনিয় এই বিশ্বাস যতটা অমল পক্সের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ততটা অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। শীতলাকে কেন্দ্র করে যেভাবে বদ্ধমূল বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল তার ফলে ভ্যাক্সিন ব্যবস্থা সক্রিয় হতে দির্ঘ সময় লেগেছিল। স্মল পক্সের ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন রালফ ডাব্লিউ নিকলাস, ডেভিড আর্নল্ড, মাইকেল ওরবয়েস, মার্ক হ্যারিসন এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য[৬৫,৬৬,৬৭]। আলোচ্য ঐতিহাসিকরা মনে করেন উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় রুগী ও চিকিৎসকের মধ্যে যে অলিখিত চুক্তি থাকে যেখানে রুগীর বিশ্বাস আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আর চিকিৎসকের বা চিকিৎসা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা এই বিমুর্ত ইচ্ছার প্রকাশ স্মল পক্সের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না বরং স্মল

৬৫ Ralph W. Nicholas, 'The Goddess Sitala and Epidemic Smallpox in Bengal', *Journal of Asian Studies*, vol. XLI, 1981.

৬৬ David Arnold, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth Century India*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1993, p. 13

৬৭ Sanjoy Bhattacharya, Mark Harrison and Michael Worboys, *Fractured States: Smallpox, Public Health and Vaccination Policy in British India, 1800-1947*, New Delhi: Orient Longman, 2005, p. 31

পক্ষে আক্রান্ত রুগীরা দেবী শীতলাকে বেশী গ্রহণ যোগ্য মনে করছে যার ফলে ভ্যাক্সিনেশন ব্যবস্থার প্রতি এক অবিশ্বাস জন্ম নিচ্ছে।[৬৮]

[৬৮] Harish Naraindas, 'Care, Welfare, and Treason: The Advent of Vaccination in the 19th Century', in *Contributions to Indian Sociology*, 32, 1, 1998, pp. 67-96.

চিত্রঃ বিশ্বে স্মল পক্সের সাথে যুক্ত দেব, দেবী এবং সাধুরা। বাম দিকে উপরে শীতলা মাতা ও ডান দিকে চৈনিক দেবদেবী, বাম দিকে নীচে এক জাপানী দক্ষ তীরন্দাজ যিনি স্মল পক্সের দানবকে হত্যা করেছিলেন ও ডান দিকে আফ্রিকান দেবতা[৬৯]।

[৬৯] Fenner, Frank, Henderson, Donald A, Arita, Isao, Jezek, Zdenek, Ladnyi, Ivan Danilovich. Et al. (1988). Smallpox and its eradication / F. Fenner ... [et al.]. World Health Organization. Chapter 5, pp-219-223. https://apps.who.int/iris/handle/10665/39485

Diagram showing the death-rates from SMALL-POX per 10,000 of population during the year 1891-92.

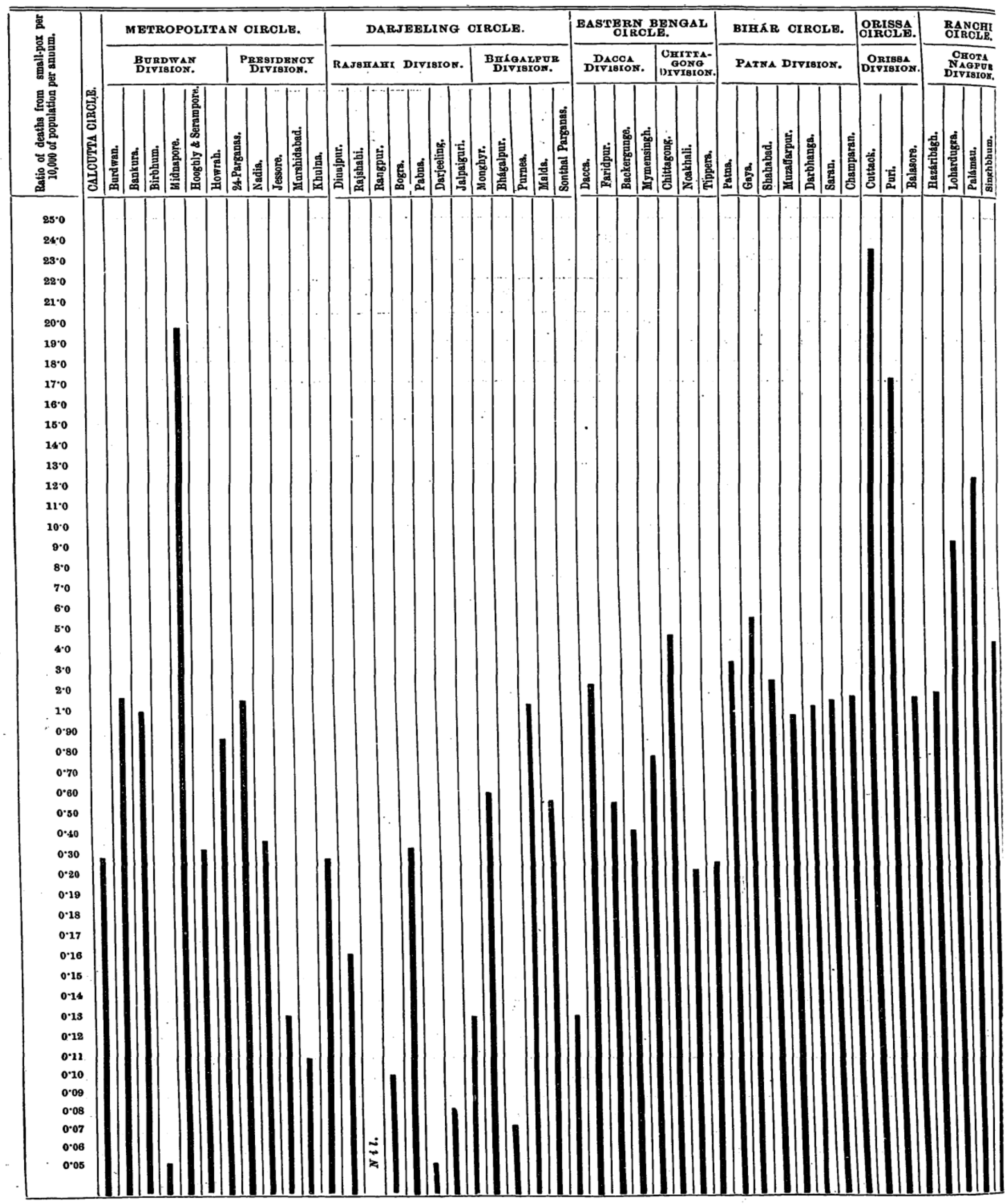

Diagram showing the proportion of population protected during the seven years 1885—92.

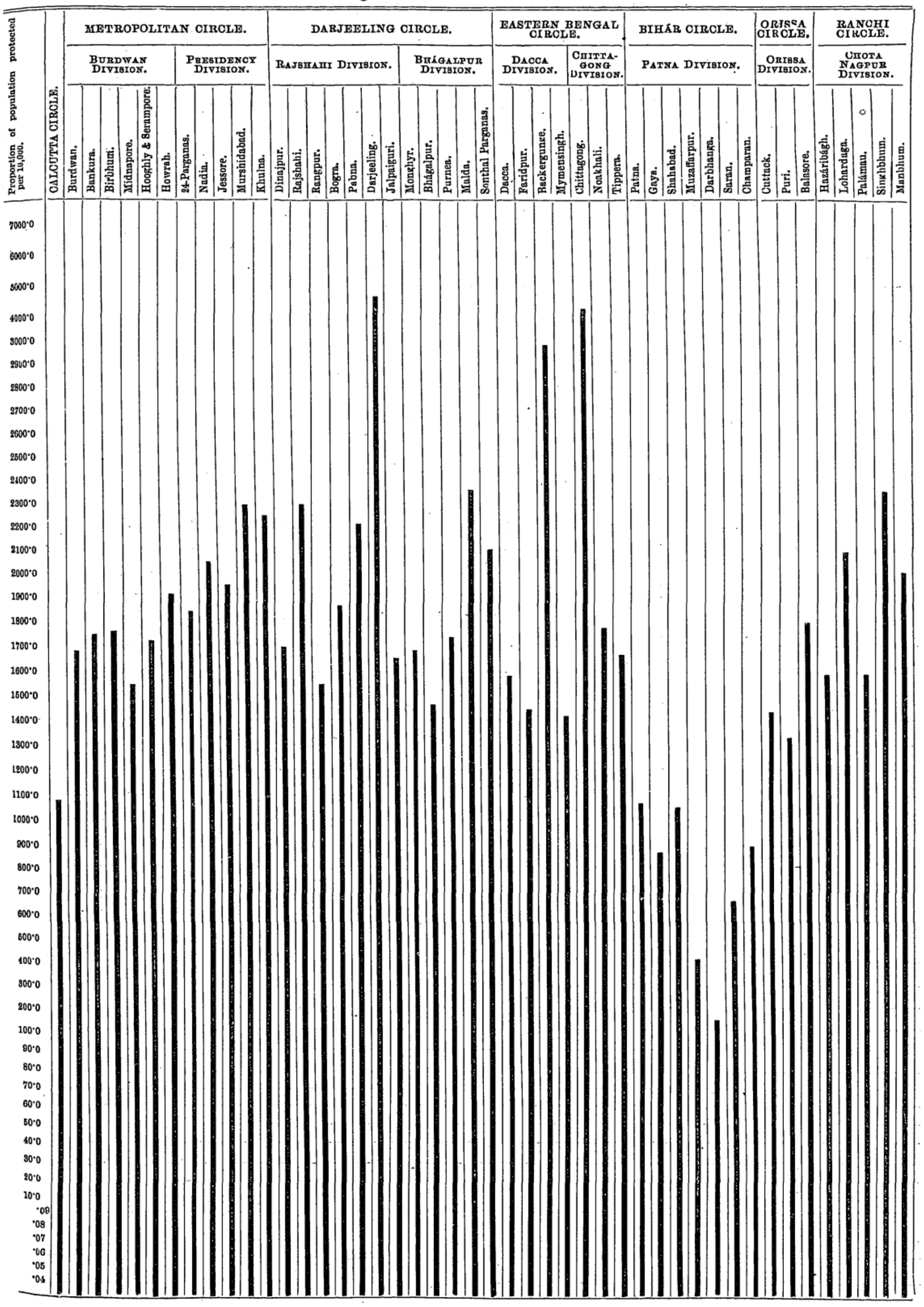

C

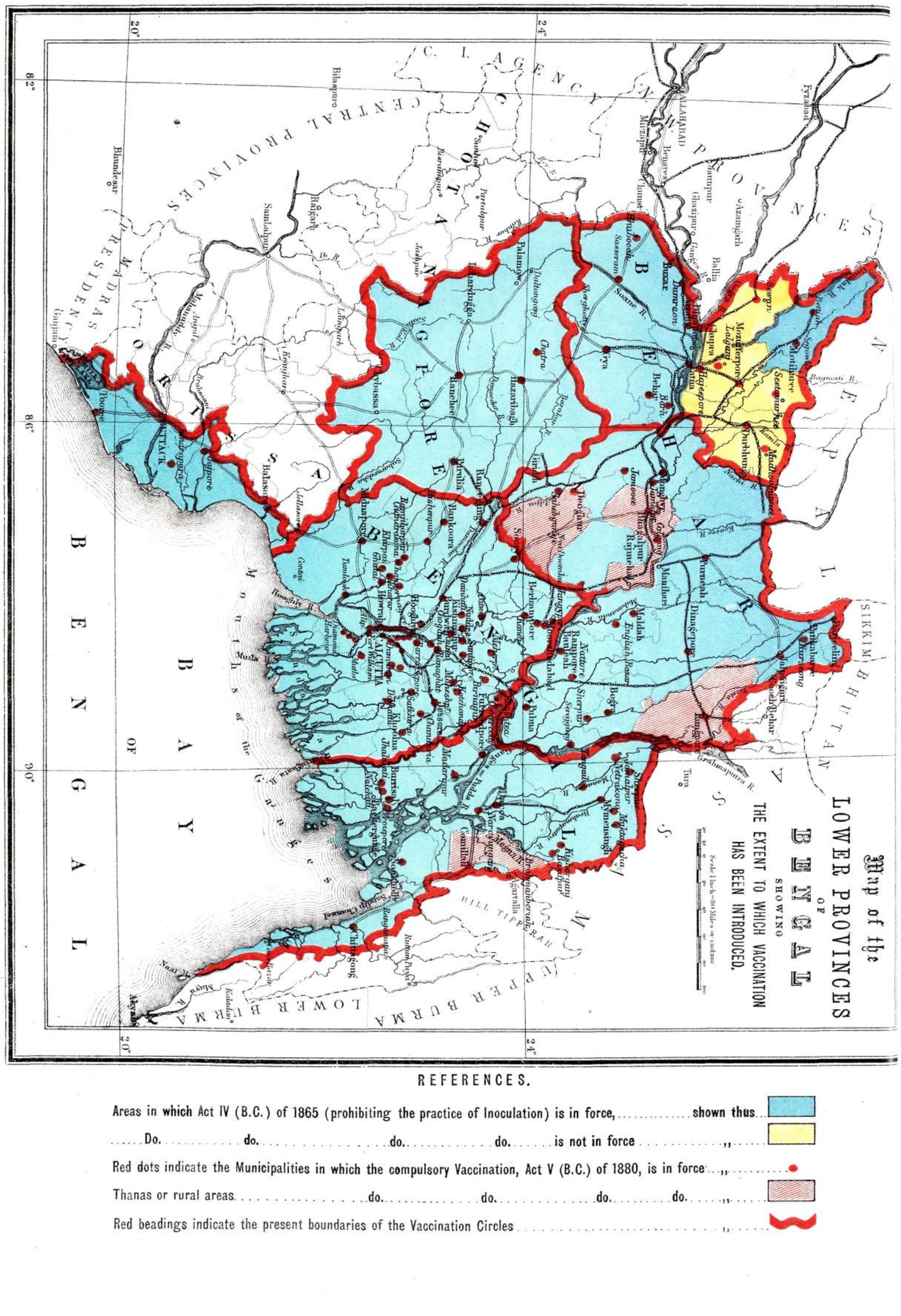

REFERENCES.

Areas in which Act IV (B.C.) of 1865 (prohibiting the practice of Inoculation) is in force,..............shown thus...

......Do.............do...................do..............do.......is not in force ....,,......

Red dots indicate the Municipalities in which the compulsory Vaccination, Act V (B.C.) of 1880, is in force....,,..........

Thanas or rural areas...................do...............do...............do...........do......,,......

Red beadings indicate the present boundaries of the Vaccination Circles..............................,,......

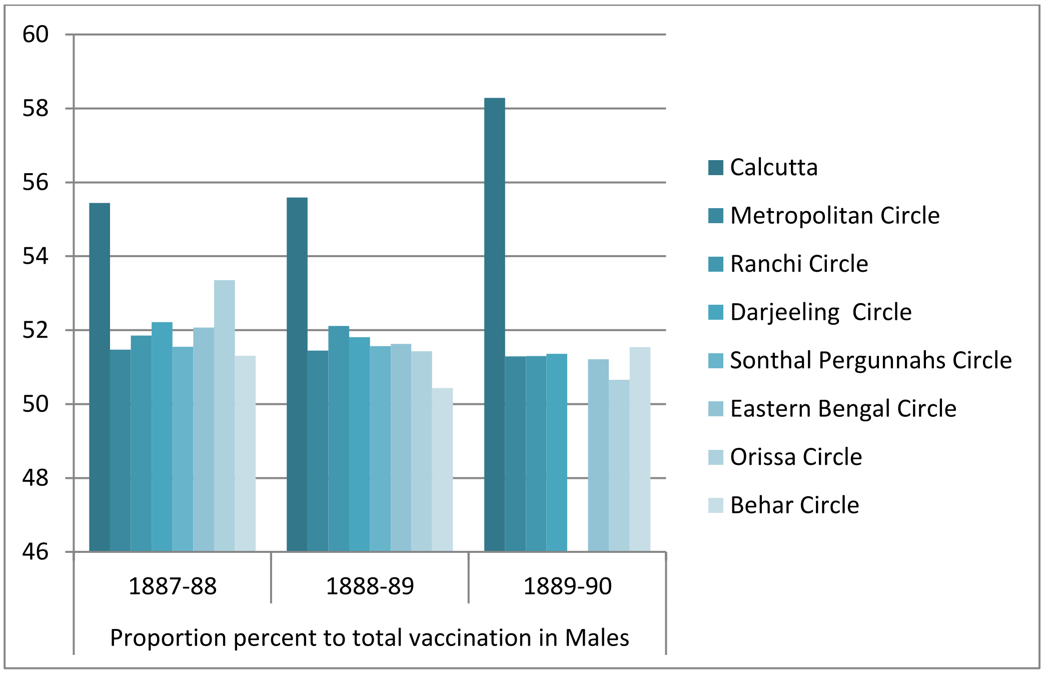
60
58
56
54
52
50
48
46
1887-88
1888-89
1889-90
Proportion percent to total vaccination in Males
Calcutta
Metropolitan Circle
Ranchi Circle
Darjeeling Circle
Sonthal Pergunnahs Circle
Eastern Bengal Circle
Orissa Circle
Behar Circle

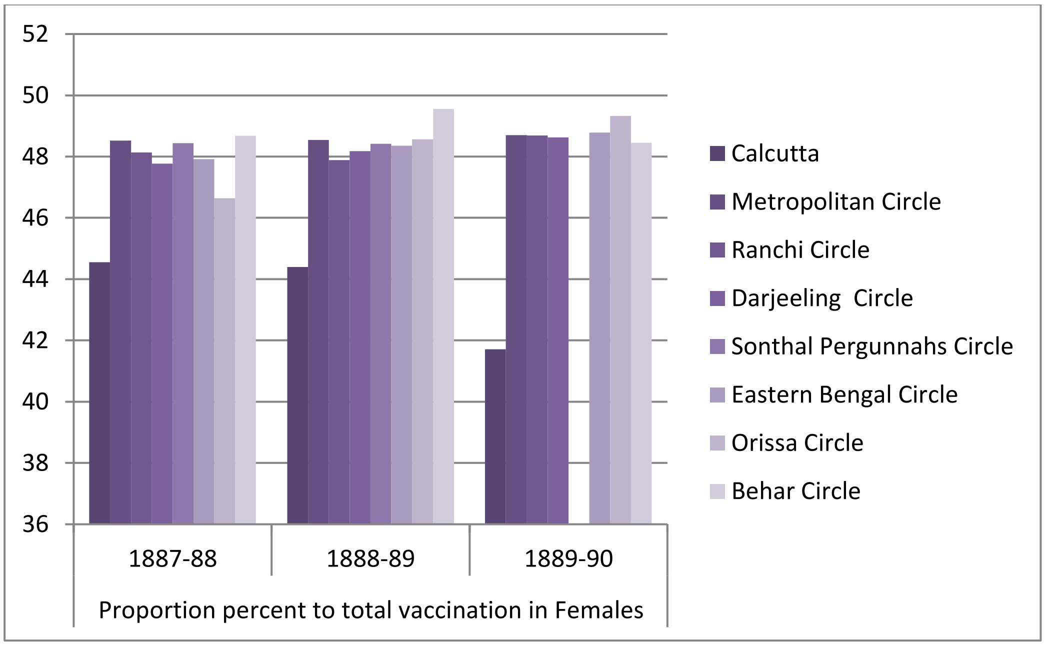
52
50
48
46
44
42
40
38
36
1887-88
1888-89
1889-90
Proportion percent to total vaccination in Females
Calcutta
Metropolitan Circle
Ranchi Circle
Darjeeling Circle
Sonthal Pergunnahs Circle
Eastern Bengal Circle
Orissa Circle
Behar Circle

৩.৬. রোগ সংক্রমণ এবং টীকাকরণ সম্পর্কীয় ধারণার বিশ্ব প্রেক্ষাপট

টীকাকরণ সম্পর্কিয় ধারণাটি শারীরিক অনাক্রম্যতার সাথে সম্পর্যুক্ত। বিশ্ব ইতিহাসে অনাক্রম্যতা সম্পর্কে প্রথম ধারনা পাওয়া যায়, পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধের মহান ঐতিহাসিক থুকিদিদিসের বর্ণনায়। এথেন্সের প্লেগ সম্পর্কিয় বিবরণীতে (৪৩০ BC) তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যারা প্লেগ মহামারী থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে, তারাই প্লেগ আক্রান্ত অসুস্থ মানুষকে সেবা করবে, কারণ তারা দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হচ্ছে না। যদিও এরপর প্রায় দুই হাজার বছর পেরিয়ে অনাক্রম্যতা বিষয়টি সফল ভাবে চিকিৎসা পদ্ধতিতে স্বীকৃতি পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কি ও চীনারা ইচ্ছাকৃতভাবে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টা চালায়।

বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে গুটিবসন্তের পুঁটি থেকে প্রাপ্ত শুকনো ত্বকগুলি নাকের মধ্যে অথবা চামড়ায় ছোট ছোট কাটা অংশের মধ্যে প্রবেশ করানো হতো। ১৭১৮ সালে,লেডি মেরি ওয়ার্টলি মন্টেগু, কনস্টান্টিনোপলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী স্থানীয় জনসংখ্যার উপর এই পদ্ধতির ইতিবাচক প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং তার নিজের শিশুদের উপর এই কৌশলটি প্রয়োগ করেছিলেন। ১৭৯৮ সালে এডওয়ার্ড জেনার পর্যবেক্ষণ করেন গোয়ালারা যারা গো-বসন্ত দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিল তাদের গুটিবসন্তের অনাক্রম্যতা মারাত্মক ছিল, এডওয়ার্ড জেনার এই বিষয় থেকে ধারণা করেছিলেন গো-বসন্ত এর সংক্রামিতের থেকে তরল উপস্থাপক অর্থাৎ কাউপক্স পাস্টুল মানুষের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে তাদের গুটিবসন্ত থেকে রক্ষা করতে।

এই ধারণাটি পরীক্ষা করার জন্য, তিনি একটি আট বছরের ছেলেকে কাউপক্স পাস্টুল দিয়ে টিকা দিয়েছিলেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুটিকে পরে গুটিবসন্তে আক্রান্ত করেছিলেন। পূর্বাভাস অনুযায়ী, শিশুটি গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়নি। গুটিবসন্ত থেকে রক্ষা পেতে জেনারের টেকনোলজির কৌশলটি

গোটা ইউরোপ জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে বিভিন্ন কারণবশত যেমন নির্দিষ্ট রোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগের বিষয়ে জ্ঞানের প্রকৃত অভাবে এই কৌশলটি অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শুরু হয় একশ বছর আগে থেকে। এরপর বিজ্ঞানে যেটি প্রায়শই ঘটে থাকে, অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মেলবন্ধন অনাক্রম্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে, কলেরার বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতার ইতিহাসের সূচনা হয়। লুই পাস্তুর ফাউল কলেরার ব্যাকটেরিয়ার কৃত্রিমভাবে বংশবিস্তারে সফল হয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে এই ব্যাকটেরিয়াকে যদি মুরগীর মধ্যে প্রয়োগ করা হয় তবে মুরগীগুলি কলেরা আক্রান্ত হয়। গ্রীষ্মাবকাশ থেকে একবার ফেরার পর পাস্তুর তার পুরানো তৈরি করা ব্যাকটেরিয়া গুলি দিয়ে কিছু মুরগীকে আক্রান্ত করেন। মুরগী গুলি অসুস্থ হয়ে পড়ে কিন্তু আশ্চর্জনক ভাবে তারা আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। পাস্তুর তখন নতুন ভাবে ব্যাকটেরিয়ার কৃত্রিম বংশ বিস্তার করে এবং কিছু তাজা মুরগীকে আক্রান্ত করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু, কাহিনী অনুসারে, নতুন মুরগীর সরবরাহ সেই সময় সীমিত ছিল, এবং সেইজন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন পূর্বের আক্রান্ত করা মুরগীগুলি, যেগুলি পুরানো ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্তের পরেও সুস্থ হয়ে উঠেছিল।এবার আরও আশ্চর্যজনক ভাবে দেখা গেল মুরগীগুলি কলেরা রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া থেকে সম্পুর্ন সুরক্ষা লাভ করেছে। পাস্তুর অনুমান করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে বেশীদিন হয়ে গেলে কলেরার ক্ষতিকারক রোগজীবাণুগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে ও মারা যায় এবং এই জাতীয় প্রশমিত জীবাণুগুলিকে রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য পরিচালিত করা যেতে পারে। তিনি এই প্রশমিত জীবাণুগুলিকে ভ্যাকসিন (ল্যাটিন ভ্যাকা শব্দের অর্থ "গরু") নামে অভিহিত করেন, জেনার এর কাউপক্সের কাজের প্রতি সম্মান জানিয়ে। পাস্তুর এই গবেষণাকে অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেছিলেন ও দেখিয়েছিলেন যে একটি ক্ষতিকর জীবাণুকে প্রশমিত বা দুর্বল করে তাকে ভ্যাকসিন হিসেবে প্রয়োগ করা সম্ভব। ১৮৮১ সালে Pouilly-le-Fort এ একটি পরীক্ষায়, পাস্তুর

ভেঁড়ার একটি দলকে প্রথমে তাপ দ্বারা প্রশমিত অ্যানথ্রাক্স ব্যাসিলাস (Bacillus anthracis) দিয়ে টিকা দিয়েছিলেন এরপর তিনি টিকা দেওয়া ভেঁড়া এবং কিছু টিকা না দেওয়া ভেঁড়াকে বিষাক্ত ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত করেন। সমস্ত টিকা দেওয়া ভেঁড়াগুলি জীবিত থাকে কিন্তু টিকা না দেওয়া ভেঁড়াগুলি মারা যায়। এই পরীক্ষাগুলি মূলত ইমিউনোলজি বা অনাক্রম্যতার ইতিহাসের সূচনা করে। **১৮৮৫** সালে, পাস্তুর তার প্রথম ভ্যাকসিনটি একজন মানুষকে দিয়েছিলেন, একটি অল্প বয়স্ক ছেলে, যাকে একটি পাগল কুকুর বারবার কামড় দিয়েছিল। ছেলেটির নাম জোসেফ মিস্টার এবং তাকে প্রশমিত রেবিস ভাইরাসের টিকা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তিনি পাস্তুর ইনস্টিটিউটের একজন অভিভাবক হন।[৭০]

চিত্রঃ লুই পাস্তুর ও প্রথম টিকা দেওয়া মানুষ জোসেফ মিস্টার[৭১]

[৭০] Kuby Immunology, 6th edition

[৭১] চিত্র সূত্রঃ https://www.awesomestories.com/asset/view/LOUIS-PASTEUR-MEETS-JOSEPH-MEISTER-Louis-Pasteur-and-the-Rabies-Virus

পরিশেষে যে আলোচনাগুলির উপর ভিত্তি করে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করা যায় তা হল, সামাজিক চয়ন পদ্ধতি বা সোশাল চয়েস থিয়োরি। এটি একটি আধুনিক তত্ত্ব যা মূলত অর্থ শাস্ত্রের বিষয় হলেও পরবর্তীকালে এই তত্ত্ব সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষত, বিপুল পরিসংখ্যানকে যদি সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বুঝতে হয় তখন সামাজিক চয়ন পদ্ধতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক চয়ন পদ্ধতি বা সোশাল চয়েস থিয়োরির আধুনিক সংজ্ঞাকার বা জনক হলেন Kenneth Arrow।[৭২] তাঁর সামাজিক চয়ন পদ্ধতির মূল কথা হল অসমতার মধ্যে একধরনের ভারসাম্য খোঁজা। এই সামাজিক চয়ন পদ্ধতি বিংশ শতকে এমন একটি দার্শনিকতার জন্ম দিয়েছিল যা স্বাধীন হবে এমন রাষ্ট্র, স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন রাষ্ট্র এবং পরবর্তি কালে স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাস যখন লেখা হয় তখন এই পদ্ধতি ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবীদ এবং দার্শনিকদের ব্যপক ভাবে প্রভাবিত করে, যার মধ্যে অন্যতম হলেন অমর্ত্য সেন। এই সামাজিক চয়ন পদ্ধতিকে তিনি তাঁর স্বকীয় গবেষণার মাধ্যমে আরোও এগিয়ে নিয়ে যান এবং পরবর্তিকালে তিনি নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হন। এই পদ্ধতির মূল ধারণা হল, এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা বা এমন একটি যৌক্তিক ব্যবস্থার আলোচনা ও নীতি প্রণয়ন করা যেখানে নীতি, ন্যায় এবং স্বাম্যতা প্রাধান্য পাবে এবং যেখানে এক যৌক্তিক অধিকার তৈরি হবে যা রাষ্ট্রের থেকে কাম্য। এই প্রসঙ্গে বলা যায় অমর্ত্য সেনের ১৯৪৬ এর দূর্ভিক্ষ-এর উপর গবেষণায়ও সামাজিক চয়ন পদ্ধতির প্রভাব

[৭২] Kenneth J. Arrow, Social Choice and Individual Values, Yale University Press, 1963 3rd edition.

দেখা যায়।[৭৩] পরবর্তিকালে যখন স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক কাজ করেন বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যে বিভিন্ন ধরণের রোগ জন্ম নিয়েছিল, যে বিপুল জনসংখ্যার মৃত্যু হয়েছিল এবং যে দূর্ভিক্ষ হয়েছিল তা নিয়ে যখন গবেষণা করা হয়, সেখানেও এই সামাজিক চয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ হয়েছে বা হচ্ছে বলা যেতে পারে। অমর্ত্য সেনের মতে সমস্যা সমাধানের নতুন ব্যবস্থাপনা দিয়ে সামাজিক উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন দেশের সব লোককে তার মধ্যে ধরবার চেষ্টা হয়। "অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ কাঠামোকে অনুধাবন করতে পারেনি বলেই ভারতীয় সমাজকে বারে বারে দূর্ভিক্ষ, মহামারীর সম্মুখীন হতে হচ্ছিল এবং মৃত্যু হারও খুবই বেশী ছিল। কিন্তু এমন নয় যে ঔপনিবেশিক দেশগুলি তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তা সমাধান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।[৭৪] অমর্ত্য সেন এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিলেতে ভীষণ খাদ্যাভাবের ভয় দেখা দিয়েছিল। দেশের সরকার এ নিয়ে খুবই চিন্তিত হলেন- তারা এমন একটা অবস্থা চাননি যেখানে কিছু লোক না খেতে পেয়ে মারা যাবে বা অসুস্থ হবে। এইসময় ভারতে অবশ্য এরকমটাই ঘটেছিল- বাঙলার দূর্ভিক্ষে ত্রিশলক্ষ লোক মারা গেলেন। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে বাঁচাতে কিছু না করলেও নিজেদের দেশে তারা ঠিক করলেন যে যুদ্ধের সময় রেশনিং চলবে। রেশনিং এবং কন্ট্রোল ভারতেও ঢোকানো হয়েছিল, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র যাতে যুদ্ধের সময় কলকাতায় অশান্তি না হয় তার জন্য, ফলে রেশন কার্ড পাওয়ার অধিকার ছিল শুধু কলকাতার লোকেদের এবং তাদের খুব কম দামে খাবার দিতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার ঠিক করলেন, গ্রামাঞ্চল থেকে, যতই দাম পড়ুক, খাবার কিনে তাতে ভর্তুকি দিয়ে সস্তায় কলকাতায়

---

[৭৩] Amartya Sen, Poverty and Famines An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press, Chapter 1st pp 1-8, 6th pp 52-85.
[৭৪] Ibid.

খাবার দিতে হবে। তার ফলে কলকাতার লোকেরা খাদ্যের ব্যাপারে আগের থেকে বেশী নিরাপত্তা পেলেন, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে চালের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেল, যাদের রোজগার ততটা বাড়েনি বা একেবারেই বাড়েনি তারা মারা পড়লেন, কিন্তু ইংল্যান্ডে এমনটা যাতে না হয় তা নিয়ে সবাই চিন্তিত ছিলেন।[৭৫] তখন দেশ চালাচ্ছিলেন ওয়র ক্যাবিনেট। সেখানে কন্সারভেটিভদের মধ্যে যেমন ছিলেন চার্চিল, তেমনই ছিলেন অ্যানুরিন বেভান, ছিলেন স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্টস- এর মত বামপন্থী লিবারালরাও। সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন, সবাইকে রেশন কার্ড দেওয়া হবে, সস্তায় খাবার দেওয়া হবে। তার ফলে যুদ্ধের সময় যখন খাবারের মোট জোগান সবচেয়ে কম হল তখন ইংল্যান্ডের গরীব লোকেরা ভরপেট খাবার সুযোগ পেলেন। এরফলে, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। যুদ্ধের আগের দশকে ইংল্যান্ডের মানুষের গড় পরমায়ু বেড়েছিল এক থেকে দেড় বছর, যুদ্ধের দশকে সেটা বাড়ল ছয় থেকে সাত বছর। এর থেকে এই শিক্ষাটা পাওয়া গেল যে, রেশনিং আর কন্ট্রোল দিয়ে সবাইকে সমচক্ষে দেখার মধ্যে স্বাস্থ্যের উন্নতির বড় সম্ভাবনা আছে। এরপর ক্রমশ ন্যাশানাল হেলথ সার্ভিস এবং ওয়েলফেয়ার স্টেটের দিকে ইংল্যান্ড এগিয়ে গেল, সেদিকে ক্রমশ গেল ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ইত্যাদি দেশগুলি,[৭৬] অর্থাৎ, অধ্যাপক সেনের ধারণা থেকে একথা বলা যায় সামাজিক ব্যবস্থা যদি যৌক্তিক এবং সমতার উপর ভিত্তি করে অবস্থায়িত হয় তাহলে, সংকটময় বিপর্যয় এড়নোর সম্ভাবনা আছে। মার্ক্স তাঁর শেষ লেখা, ‘ক্রিটিক অফ দ্যা গোথা প্রোগ্রাম’-এ বলেছেন, সকলের জন্য সমতার ব্যবস্থা এখনই করা যাবে না, সেটা করতে হবে ভবিষ্যতে। কিন্তু গোথা প্রোগ্রামে যে বলা হয়েছিল, লোককে উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী টাকা দিলে আর কিছু ভাবার দরকার নেই- মার্ক্স বললেন যে সেটা ভুল। তাঁর মত ছিল, ‘প্রত্যেকের কাছ থেকে তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী নেওয়া’- এই নীতি এখনই

[৭৫] অভাব সুচিন্তা ও সমদৃষ্টির, সাক্ষাৎকারে বললেন অমর্ত্য সেন, আনন্দবাজার পত্রিকা, ০৮ জুন ২০২১, ০৫:৩৮।
[৭৬] Ibid.

কার্যকর করে ফেলা সম্ভব না হলেও, সেই লক্ষে এগোনোর জন্য কি করা যায় তা নিয়ে এখনই ভাবতে হবে। এই চিন্তাগুলি ইউরোপীয়দের মাথায় ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁরা কথাটা তুললেন যে এখন রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে সামাজিক সুব্যবস্থা ও সমতার দিকে নজর রেখে এগোনোর একটা চেষ্টা করা যায়।[৭৭] অমর্ত্য সেনের গবেষণা বিশেষত তাঁর ‘পভার্টি এন্ড ফেমিনস’ গ্রন্থটি শুধুমাত্র দূর্ভিক্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসকেই চিহ্নিত করে না, ইতিহাসের কার্য-কারণ তত্ত্বকেও এক বহুমাত্রিক আণুবীক্ষণিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে, যা উনিশ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার যে পদ্ধতি তাকেও প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করায়।

[৭৭] Amartya Sen, Home in the World A Memoir, Penguin UK, 2021, Chapter 10th, 11th & 13th.

চতুর্থ অধ্যায়

ঔপনিবেশিক বাংলায় মৃত্যুর সামাজিক ইতিহাস

৪.১. পটভূমিকা

ঔপনিবেশিক বাংলায় সামাজিক ইতিহাসে মৃত্যু আলোচনা করতে গেলে সতীদাহ প্রথা বোধহয় সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য ও এর মধ্যে দিয়ে শাসক ও শাসিতের যে সম্পর্ক তাকে নতুনভাবে দেখার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কারণ, সতীদাহ প্রথা সারা ভারতবর্ষেই বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন নামে, বৈচিত্রময় ঐতিহাসিক কাঠামোয় প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাংলার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সতীদাহ প্রথার আলোচনা শুধুমাত্র ঐতিহাসিকতা দিয়ে বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, সতীদাহ প্রথা একটি কুসংস্কার, যা রদ হয়েছিল রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর সহযোগী ও ব্রিটিশদের দ্বারা এটুকু বললেই বোধহয় পুরোটা বলা হয় না। কারণ, সতীপ্রথার সাথে মৃত্যু, পিতৃতান্ত্রিক শোষণ, শোক, বাসনা ও দেহের সমাপ্তি ইত্যাদি দার্শনিক বর্গগুলি কখনও সরাসরি কখনও ভাষা, শাস্ত্র ও চেতনার অন্তরালে আলো ছায়া-ময় হয়ে উপস্থিতির জানান দেয়। মৃত্যুর সামাজিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই অধ্যায়ে আমি প্রথমে আলোচনা করেছি, আধুনিক ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায় কিভাবে সতীদাহ প্রথা রদের মাধ্যমে আধুনিকতার সন্ধান করেছিলেন। উনিশ শতকের বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা সতীদাহ প্রথাকে একটি ধর্মীয় আচার, বিচার, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। কিন্তু সতীপ্রথা তো একটি মৃত্যুরই গল্প, আর এখানেই রামমোহন রায় শাস্ত্র সংস্কারের উর্দ্ধে গিয়ে দয়া, শ্রদ্ধা, ভালবাসার বর্গগুলিকে এনেছেন অনুভূতির মাধ্যমে। রামমোহন রায় সতীপ্রথা রদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত শোক থেকে সমূহ শোকের প্রতি সন্ধান করেছেন আর তাঁর এই বিচিত্রগামী মৃত্যু চিন্তাই উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে বহুমাত্রা যোগ করেছে।

উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসকে মৃত্যুর চোখ দিয়ে দেখলে ঔপনিবেশিক শাসনের যে দমন ও আধিপত্য তার বিরুদ্ধে দেশীয় শুদ্ধ চেতনা ইউরোপীয় আধুনিকতা ও বাংলার ঐতিহ্যের আদলে যে তৈরি হচ্ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আরও দেখিয়েছি, উনিশ শতকের চিন্তাবিদরা কিভাবে মহামৃত্যুর সন্ধান করেছিলেন এবং এক ধরনের ধর্মীয় মৃত্যু সংস্কৃতি নির্মাণের মাধ্যমে স্বমৃত্যুর ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন। কলিকাতা সমাজের বিভিন্ন বাবু ও জমিদারেরা কিরকম ভাবে মারা যেতে চান, তাঁর বর্ণনারও একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। এ সময়ে থিওসফিক্যাল সোসাইটি, ব্রাহ্মসমাজ ও আরও অনেক সভা, সমিতি তৈরি হচ্ছিল যেখানে পরলোক চর্চা, প্রেতচর্চা, প্ল্যানচেট, তান্ত্রিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই অধ্যায়ে আরও দেখিয়েছি রবীন্দ্রনাথ যেমন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত আধুনিকতার সন্ধান করছিলেন, অপরদিকে বিবেকানন্দ আধুনিক যুবসমাজকে দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করার কথা বলছেন, যা পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দ থেকে সুভাষ চন্দ্র বসুকে এবং একইসঙ্গে বাংলার বহু বিপ্লবীদের প্রভাবিত করেছে। গান্ধীজীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও মৃত্যু বরণ করার যে সম্পর্ক তার নব্য রাজনৈতিক দর্শন তৈরি হচ্ছে। কিছুটা বলা যেতে পারে, স্বদেশী আন্দোলনে মৃত্যু বরণ করার যে গৌরব তৈরি হয়েছিল তা গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড সেই গৌরবের উজ্জ্বলতাকে অন্তর্মুখীন করে তোলে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন মৃত্যু-কেন্দ্রিক গল্প উপন্যাস ও তার ঐতিহাসিকতাকে সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করেছি এবং এই উনিশ শতকেই পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিকদের মধ্যে মৃত্যু ও তার পরবর্তী অনুষঙ্গগুলিকে নিয়ে যে চর্চার ঢেউ উঠেছিল তার তরঙ্গ ভারতেও এসেছিল, তাকে ইতিহাসের সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করেছি। বিশেষত আলোচনা করেছি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও তাঁর চেতনা সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের একের পর এক ব্যক্তিগত মৃত্যু শোক কিভাবে সমগ্র বাঙালি সমাজকে এক উত্তরণের পথ

দেখাচ্ছে ও পরোক্ষভাবে ইতিহাস চেতনাকেও প্রভাবিত করেছে তাও দেখিয়েছি। আসলে, শোক পালনের মধ্যে যে এক আত্মাভিমান আছে তা ঔপনিবেশিক আধিপত্যের যে আধুনিকতা তাকে প্রতিরোধ করে এবং চিন্তা চেতনার স্তরগুলিকে জ্ঞানকাণ্ডের আদিকল্পের দিকে উত্তরণ ঘটায়।

৪.২. রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭২ সালের ২২শে মে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে। তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তার প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত দিল্লির মোঘল বাদশা ফারুকশিয়ারের সময়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সুবেদারের আমিনের কাজ করতেন। এই কাজের সুত্রেই তাঁদের পরিবারে "রায়" পদবীর প্রচলন বলে মনে করা হয়। প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজবিনোদ রায় ছিলেন রামমোহনের পিতামহ। ব্রজবিনোদ রায়ের পুত্র রামকান্তের তিনটি বিবাহের মধ্যে মধ্যমা পত্নী তারিণীর এক কন্যা এবং দুই পুত্র হলেন জগমোহন এবং রামমোহন। রামমোহনের পৈত্রিক বংশ বৈষ্ণব হলেও তার মায়ের বংশে তন্ত্রসাধনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। রামমোহনের জন্মের কিছুদিন পর রামকান্ত রায় পৈত্রিক বাসস্থান ছেড়ে পার্শ্ববর্তী লাঙ্গুল পাড়া গ্রামে সপরিবারে উঠে যান।[১]

রামমোহনের শিক্ষার আরম্ভ রাধানগর গ্রামেই হয়েছিল। নবাব দরবারে চাকরি করতে গেলে আরবি-ফারসি শিক্ষার প্রয়োজন। রামমোহনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল পাটনায়। রামমোহন তারপর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কাশীতে গেলেন। এখানে রামমোহন কতদিন ছিলেন সঠিক

[১] Mallye, O''L.S.S., and Monmohan Chakraborty, Bengal District Gazetters, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1912, Pp. 178-179।

জানা নেই। অ্যাডাম সাহেব বলেছেন, কাশীতে রামমোহন দশ বছর ছিলেন। বেদবেদান্ত, মীমাংসা, স্মৃতিশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র তখন তাঁর নখদর্পণে।[২]

রামমোহন রায়ের রচনাবলী পাশ্চাত্য সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে। তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ আরবী ভূমিকা সংযুক্ত ফার্সী পুস্তিকা 'তুহ্ফাৎ-উলমুওহা-হিদিন' (১৮০৩-০৪) সে সময়ে এদেশের বিদগ্ধ মহলে অবশ্য যথেষ্ট আলোড়ন ও বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। জরাথ্রুষ্টীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এর যথেষ্ঠ বিরূপ সমালোচনা করা হয়, এবং রামমোহন সম্ভবতঃ কোনো মুসলমান মিশ্র 'জওয়াব্-ই-তুহফাৎ উলমুওহাহিদিন' শীর্ষক এক পুস্তিকা লিখে কড়া ভাষায় এই সমালোচনার উত্তর দেন। তা সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত মূল পুস্তিকাখানির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইউরোপীয় বিদ্বানদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না, তাঁরা সাধারণভাবে রামমোহনের এই প্রথম প্রকাশিত রচনার অস্তিত্ব বিষয়ে অবগত ছিলেন মাত্র। এটির বক্তব্য তাঁরা সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারেন ১৮৮৪ খ্রীঃ মৌলবি ওয়েবইদুল্লা আলওবেইদ্ কৃত প্রামাণিক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর। অপরপক্ষে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক রামমোহনের ইংরেজি গ্রন্থগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির পাশ্চাত্য পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে দুই শ্রেণীর রচনা ছিল এবং তাদের আকর্ষণ ছিল মূলত দুই গোষ্ঠীর পাঠকের কাছে[৩]।

আসলে উনিশ শতকে শাস্ত্রচর্চায় বাঙালির মধ্যে নতুন করে আগ্রহ দেখা গেল। রামমোহনকে তাই শুধু বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার (১৮১৫) লিখতে হল তাই নয়, তাঁকে একাধিক উপনিষদের বাংলা এবং ইংরেজি অনুবাদ করতে হয়। এই অনুবাদের পিছনে ছিল একদিকে

---

২. পার্থ সেনগুপ্ত, বিজিত কুমার দত্ত, আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন রায়, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, তৃতীয় মুদ্রন ২০০২, পৃ ২-৫।

৩. রামমোহন রায় ও উজ্যান বুর্নফ, দিলীপকুমার বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ ৯১।

প্রাচীন এবং সহজ প্রাপ্য নয় এমন কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে বাঙালি ও সেইসঙ্গে খৃষ্টান মিশনারিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা, এবং প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের আধুনিকীকরণের প্রয়াস। প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চা প্রয়োজন, কিন্তু শাস্ত্রের সব কথাই আক্ষরিকভাবে গ্রাহ্য নয়। শাস্ত্র বিচারে রামমোহন 'Correct reasoning and the dictates of common sense' এর ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি জানেন উচ্চতম সত্য লৌকিক যুক্তির সাহায্যে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় – 'The reasoning which leads men to certainty in things within its reach, produces no effect on question beyond its comprehension'। আমাদের মনে রাখতে হবে সাকারবাদী অনুষ্ঠানপ্রিয় হিন্দুদের সঙ্গে রামমোহনকে যেমন যুদ্ধ করতে হয়েছে, তেমনি ইংরেজ মিশনারি যাঁরা 'ধর্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস' করতেন, তাঁদের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদে লিপ্ত হতে হয়েছে।[৪]

রামমোহন রায় 'Against the Idolatry of all Religions'-এ বলেছেন "My Constant reflection on the inconvenient, or, rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindoo idolatry, which more than any other pagan worship destroys the texture of society together with compassion for my countryman - have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error; and by making them acquainted with the Scriptures enable them to contemplate, with true devotion, the unity and omni presence of nature's God".[৫]

---

৪. অলোক রায়, উনিশ শতক বঙ্গীয় নবজাগরণের স্বরূপ, প্রমা প্রকাশনী, পৃঃ ১৫।

৫.Mary Carpenter, The Last Days in England Rajah Rammohan Roy, London, E.T. whitfield, 17s Strand w.c. 1875. Pp. 5.

১৮২০ সালে রামমোহন প্রকাশ করেন তাঁর খ্রীষ্টোপদেশের সার সংকলন ‘The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness’ এবং ফলস্বরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে সুদীর্ঘ বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত যাজকগণের সঙ্গে। এই বিতর্ক প্রসঙ্গে ১৮২০ থেকে ১৮২৩ এর মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটে গ্রন্থ- ‘An Appeal to Christian Public’ (১৮২০), ‘Second Appeal to the Christian Public’ (১৮২১) এবং ‘Final Appeal to the Christian Public’ (১৮২৩)। এই গ্রন্থগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার নব্য খ্রীষ্টীয় ত্রিতত্ত্ববাদী, কিছুটা উদারবাদী, মধ্যবিত্ত ইউরোপীয়ানদের প্রভাবিত করেছিল। পি. ফালোঁর (রামমোহনের দৃষ্টিতে খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম) মতে, রামমোহন যীশুখৃষ্টকে অসাধারণ ধর্মপ্রবক্তা বলে মনে করতেন। খৃষ্ট যে ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, সকল মানুষের সামনে এক উৎকৃষ্ট, নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শ উপস্থিত করবার জন্য- এই কথা রামমোহন সর্বান্তঃকরণে মানতেন। ‘The Pereepts of Jesus’ নামে ১৮২০ খ্রীঃ প্রকাশিত গ্রন্থে রামমোহন সুস্পষ্ট ভাষায় খৃষ্টের উপদেশসমূহ ও খৃষ্টের ব্যক্তিগত জীবন সাধনার অনন্ত মূল্য ও শ্রেষ্ঠতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। তাঁর দৃঢ় ধারণাও ব্যক্ত করেন যে, তৎকালীন ভারতীয় সমাজজীবনে গোষ্ঠীর নৈতিক অবনতি এবং হিন্দু ধর্ম সাধনার গ্লানির প্রতিকার করতে হলে খৃষ্টের ‘Precepts’ খুবই উপকারী হবে। তাতে সর্বজনগ্রাহ্য একেশ্বরবাদ (Monotheism) গ্রহণীয় হবে। খৃষ্ট প্রচারিত মানবসেবার আদর্শ ও জাতি শ্রেণী নির্বিশেষে ঈশ্বর সন্তান বলে সকল মানুষের সমান মৌলিক যোগ্যতার স্বীকৃতি দূর করবে প্রচলিত পৌত্তলিকতা-জনিত অনেক কুসংস্কার, জাতিভেদ-জনিত হিন্দু সমাজের অনৈক্য ও দুর্বলতা। খৃষ্ট ধর্ম না হোক, স্বয়ং খৃষ্টের বাণী রামমোহনের মতে এক দেশকালাতীত সর্বজনীনতার দাবি রাখে। যুক্তিসংগত, সুষ্ঠ ও উন্নত নীতিবোধ সহায়ক বহু আনুষ্ঠানিকতা

প্রতিকূল ও আন্তরিক সত্যনির্ভর আত্মনিবেদন, ‘The Precepts of Jesus’ রামমোহনের গভীর শ্রদ্ধার বস্তু ছিল।

অন্যান্য নিবন্ধে একটি প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক তা হল, রামমোহনের মানসবোধে ‘ব্যক্তিগত মূল্যবোধ' আর “অনুশাসন' এই দুটি দার্শনিক প্রত্যয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুশাসন রামমোহনের তার্কিক মানসকে আরো আলোকিত করেছিল। সে প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হবে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো অনুশাসন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, না সমূহের অভিজ্ঞতা তার ওপর নির্ভর করছে রামমোহনের মৃত্যুচেতনা বা প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে মৃত্যচেতনা, যেখানে সহমরণ, সতীদাহ, অনুমরণ তার্কিক যুক্তি গভীরতার স্বীকৃতি দাবী করে।

কিন্তু রামমোহন খ্রীষ্টধর্মে মূল ভাবনার অনুরাগী হয়েও খ্রীষ্টধর্মের সমালোচনাও করতেন। তাঁর মতে খৃষ্ট বিশ্বাসীরা পিতা-পুত্র, পবিত্র আত্মা নামে ভিন্ন তিনজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরত্বের সমান অধিকারী বলে প্রচার করে, পরে ব্রহ্মের অখন্ড ও অপার ঐক্যর মধ্যে বহুদেবতাবাদ প্রক্ষিপ্ত করেছে; তাঁরা অযৌক্তিকভাবে ত্রিত্ববাদ প্রবর্তন করে আবার যীশুর উপর দেবত্ব আরোপ করে বহুদেবতাবাদ বা পৌত্তলিকতার মারাত্মক দোষে দুষ্ট হয়ে চিন্তার স্থানচ্যুতি ঘটায়। পি ফাঁলোর মতে, তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য কথা ছিল খৃষ্টের স্বরূপ নির্ণয় কিংবা খৃষ্টধর্মীদের বিশ্বাসের বস্তুতন্ত্রী সত্যাসত্যের বিচার নয়, বরং খৃষ্টের বাণী ও উপদেশের বিশ্বজনীন নৈতিক উপযুক্ততা ও উপকারিতার ঘোষণা। তাঁরই মতে, ধর্মবিশ্বাস বড়ো কথা নয়। ধার্মিকতাই বড়ো কথা। তিনি বলেছেন, বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে ওই সমস্ত চিন্তাতীত ও রহস্যময় তত্ত্বের আলোচনা বাদ দিয়ে মনুষ্য সৃষ্টের আদর্শের ও মানবোচিত যুক্তি সম্মত ঐক্য বিরাজ করবে। যীশুখৃষ্ট যে “কে” বা “কী” ছিলেন, তা সর্বাগ্রে অবধানযোগ্য

নয়। তিনি যে তাঁর বাণী প্রচারে ও ব্যক্তিগত আচার ব্যবহারে কোন শিক্ষা মানুষকে দান করে গিয়েছিলেন, সেটাই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন।[৬]

লেখক রামমোহন রায় ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ এর মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন,

- বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)
- বেদান্তসার (১৮১৫)
- কেনোপনিষৎ (শাংকরভাষ্যনুযায়ী বঙ্গানুবাদ সমেত, ১৮১৬)
- ঈশোপনিষৎ (১৮১৬)
- কঠোপনিষৎ (বঙ্গানুবাদ সমেত ১৮১৭)
- মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (শাংকরভাষ্যনুযায়ী বঙ্গানুবাদ সমেত, ১৮১৭)
- গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮)
- মুন্ডকোপনিষৎ (শাংকরভাষ্যনুযায়ী বঙ্গানুবাদ সমেত, ১৮১৯)
- আত্মানাত্মবিবেক (১৮১৯)

এই পর্বে ও পরবর্তী দশকে মুদ্রিত, ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক ও সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাক্রান্ত বিচার গ্রন্থগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মূল বাংলায় প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন তাঁর এই শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থগুলির ইংরেজি অনুবাদও করে যাচ্ছিলেন, "বেদান্তসার-এর অনুবাদ (An Abridgement of the Vedanta... শিরোনামে) প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে ১৮১৬ সালে। ১৮১৭ খ্রীঃ রামমোহনের অনুরাগী বন্ধু ও এককালীন উপরওয়ালা মনিব জন ডিগবী লন্ডন থেকে An

৬. দিলীপ কুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, পৃ. ৭।

Abridgement of the Vedanta a Cena (Kena) upanishad এর যুগ্মসংস্করণ প্রকাশ করেন।

এই বৎসরই An Abridgment of the Vedanta ইংরেজি থেকে জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়ে Auffosung des Wedant. গ্রন্থ (Jena/Kena upanishad) নামে প্রকাশিত হয়। সতীদাহ সংক্রান্ত রামমোহনের কলকাতায় প্রকাশিত দুখানি গ্রন্থের ইংরেজি ভাষান্তর মুদ্রিত হয়েছিল ১৮১৮ ও ১৮২০ তে। এর পর তিনি ১৮৩০ সালে 'Abstract of the Arguments regarding the burning of widow alive' নামক তৃতীয় একখানি গ্রন্থ ইংরেজিতে কলকাতায় প্রকাশ করেন। তাছাড়া ইংলন্ডে প্রিভি কাউনসিলে বেন্টিঙ্ক-এর সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুদের আবেদনের শুনানি চলাকালীন রামমোহন ইংলন্ডে সতীদাহ - উচ্ছেদের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লন্ডন থেকে ১৮৩১ সালে প্রকাশ করেন তার সতীদাহ সংক্রান্ত সর্বশেষ গ্রন্থ 'Some Remarks in Vindication of the Resolution Passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifice in India'.[৭]

৪.২.১. সতীদাহ ও রাজা রামমোহন রায়

রঘুনাথপুরে রাজা রামমোহন রায়ের বসতবাটির প্রবেশের দ্বার পেরোলেই সতীদাহ বেদী, ওখানে দাঁড়ালে যে কারোর গায়ে কাঁটা দেবে। অজানা শিহরণের মধ্যেই বেদীর উপর খোদাই করে লেখা চোখে পড়ে- "১৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন অত্র প্রথম সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।" রামমোহন তাঁর প্রিয় বৌদিমনি অলকমঞ্জরীর সহমরনে মানসিকভাবে

৭. দিলীপ কুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রবোধচন্দ্র সেন জন্মশতবর্ষ স্মাঁরক গ্রন্থ, সম্পাদক ভবতোষ দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৯১-৯২।

খুব ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর মনের অবস্থার সঙ্গে মৃতদেহের সামনে গৌতম বুদ্ধ অথবা নিপীড়িত ক্রীতদাসদের সামনে আব্রাহাম লিঙ্কনের উপস্থিতি বা অবস্থানের সঙ্গে তুলনীয়, যা নলিন গাঙ্গুলি তাঁর ইংরেজিতে লেখা 'Raja Rammohan Roy' বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন - "In 1811 Alakmanjari, the widow of his elder brother, Jagamohun, followed her husband to the funeral Pyre. She was much esteemed and loved by Rammohan Roy, and tried his utmost to save her, but was unsuccessful. He saw with his own eyes the whole heart rending affair. The flames leaped up ferociously, the drums were beaten madly, so that the cries of the unfortunate woman could not be heard, her effort to rise up were suppressed by long bamboo poles held across her and she was smothered to death. The heart of the future reformer was stirred to its depth at the sight of this inhuman orgy, and like Gautama before the dead bodys or Lincoln before the driven slaves, he (Rammohan) vowed to put a stop to this shocking wickendness as for as it should lie in his power to do so".

১৮১৮ খ্রীঃ সতীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রায় অনেক ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রামমোহনের আন্দোলনের সবচেয়ে সার্থক দিক হল, তিনি উদারনীতি, অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটিকে শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে নয় বরং লৌকিক (General) যুক্তির মাধ্যমে সমাজের সামনে পেশ করেছিলেন।[৮]

---

৮. গৌতমকুমার দাস, সতীদাহ প্রথা এক মধ্যযুগীয় বর্বরতা, সোপান কলকাতা, পৃ. ৭৮-৭৯।

১৮১৮ খ্রীঃ থেকেই মিশনারিদের পত্রিকা 'Friend of India' প্রকাশিত হতে শুরু করে। মিশনারিরা বিপুল উৎসাহে তাদের পত্রিকায় মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের সতীবিরোধী বক্তব্যগুলি বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করতে থাকে। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতেও সতীপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। ফলতঃ শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজ এই ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা সতীদাহের মতো অপপ্রথাগুলিকে মিশনারিরা হিন্দুমধর্মের অঙ্গ বলে মনে করেই নিন্দাবাদ করত। রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজ সতীপ্রথাকে প্রাচীন ঐতিহ্য হিসাবে বজায় রাখতে চাইছিল। এর উচ্ছেদ প্রয়াস তাদের কাছে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ বলে মনে হয়েছিল। অপরপক্ষে উদারভাবাপন্ন ভারতীয়রা অপপ্রথাগুলিকে যা প্রকৃত হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য তা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা অনাচার বলেই মনে করেছেন এবং রামমোহনের প্রগতিশীল আন্দোলনের সহায়তা করে সমাজকে কলুষমুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছেন। ১৮১৭ পরিমার্জিত সরকারি আইনটি রক্ষণশীল মহলকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে এরা সরকারের কাছে এই আইন বন্ধ করার জন্য আবেদন জানান। রামমোহনের নেতৃত্বে প্রগতিশীল সমাজ বিরোধিতা করলেন।[৯]

কলকাতার দ্বিতীয় প্রোটেস্ট্যান্ট বিশপ Reginald Heber সতীপ্রথা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে শ্রীরামপুরে মিশনারি Joshua Marshman কে তার অভিমত জানাতে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে Marshman-এর বক্তব্য হল, সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আগের মতো প্রতিপত্তি নেই। শিক্ষিত সমাজের একাংশ রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে সতীপ্রথা প্রতিরোধে সংগঠিত হচ্ছেন এবং এটি যে হিন্দুদের কোনোও ধর্মগ্রন্থ দ্বারা অনুমোদিত হয় তা এখন অনেকেই

৯. বারিদবরণ ঘোষ, ব্রাহ্ম সমাজ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিউ এজ. পৃ. ১১।

জেনে গিয়েছেন - 'Which is how well known to be not commanded by any of the Hindoo Sacred books।' সুতরাং সতীপ্রথার উচ্ছেদ করলে কোনও প্রতিরোধের আশঙ্কা নেই।[১০] সরকারি যে কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে Heber এ বিষয়ে আলোচনা করলেন, তারা যুক্তি দেখালেন বর্তমানে স্বেচ্ছায় সতী হতে ইচ্ছুক - এই মর্মে আবেদন করে সদ্যোবিধবাকে ম্যজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। যদি আইন করে প্রথাটি বন্ধ করা যায় তা হলে সরকারকে না জানিয়ে প্রকাশ্যে সতী হওয়া চলতেই থাকবে; আরও বলার কথা হল, মিশনারিরা যদি হিন্দুদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চায়, তা হলে তা সরকারের অগোচরে করলেই ভালো হবে। বরং খ্রিষ্টান বিদ্যালয় স্থাপন করে দেশীয়দের খ্রিস্টীয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। সর্বত্র খ্রিষ্টান বিদ্যালয় স্থাপিত হলে সতীপ্রথা আপনা থেকেই উঠে যাবে 'When Christian Schools have been became universal the Sutte will fall may itself'।[১১]

১৮২০ খ্রীঃ নিজামত আদালতের দ্বিতীয় বিচারপতি Courtney Smith সতীপ্রথা উচ্ছেদের উপর জোর দিয়ে তার রিপোর্টে লিখলেন সতীপ্রথার প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো আমাদের সরকারের পক্ষে কলঙ্কজনক। অবিলম্বে এটির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা উচিত আর এর ফলে কোনও প্রকার বিবাদও দেখা দেবে না। - 'My Opinion is that the toleration of the practice of Sutte is reproach to our government and that the entire and immediate abolition of it would be attended with no sort of danger.'[১২]

---

১০. D. D. Reginald Heber, Narative of a Journey through the upper provinces of India, London, P. 73.

১১. D. D. Reginald Heber, Narative of a Journey through the upper provinces of India, London, P. 74.

১২. সুব্রতা সেন, সতীপ্রথা ও পণপ্রথার উৎস ও বিবর্তনের সন্ধান, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃঃ ১৭০।

সরকার যেভাবে আইনের মাধ্যমে কিছু সতীকে বৈধ ও কিছু সতীকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন তাতে ভবিষ্যতে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার ছত্রছায়ায় সতীপ্রথার মূল এমনভাবে গভীরে প্রোথিত হয়ে যাবে যে তার উচ্ছেদ করা নিতান্তই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

ব্যাপাটিস্ট মিশনারি Willium Ward ১৮১৮ খ্রীঃ ইংল্যান্ডে গিয়ে তার গ্রন্থে (A view of the History, ১৮১০ এ প্রকাশিত) সতীদাহের ঘটনাগুলি যে সত্য তা দৃঢ়ভাবে জানাতে থাকেন এবং ১৮২১ এ ভারতে ফিরে আসবার সময় তার আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের বন্ধুদের উদ্দেশ্য 'Farewell letters' নামক এক পত্রগুচ্ছ প্রকাশ করে আসেন। এই পত্রাবলীতে সতীপ্রথার নামে ভীত ও অনিচ্ছুক বহু সংখ্যক বিধবাকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করার ঘটনা এবং একই দিনে মাতৃ পিতৃহীন হওয়া তেরো হাজার অনাথ শিশুর ক্রন্দনরোল ও তীব্র আর্তির বিষয় মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরা হয়। ব্রিটিশ সরকারকে দোষারোপ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য হল এইসব ভয়ংকর ঘটনার প্রতি মানুষের বিশেষত খৃষ্ট সমাজের অভিনিবেশ জাগ্রত করা।[১৩] মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রাজা রামমোহনের পুস্তিকায় বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করা হল - সতীদাহ, সতীর স্বজনবর্গের পক্ষ থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, কোনও শাস্ত্রের নির্দেশ এর পিছনে নেই। 'Friend of India'-র মতে এই সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য নতুন কোনও আইনের দরকার নেই, হত্যাপরাধে যে আইন কার্যকর আছে তার দ্বারাই এই প্রথা বন্ধ করা যাবে। ইংল্যান্ডে উদারমনা বহু মানুষের কাছে 'Friend of India' সতীদাহের মর্মবিদারক বৃত্তান্ত পৌঁছে দিয়ে সে দেশে সতীবোরিধী জনমত গঠনে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

[১৩]. Friend of India, Quertarly Vol. II Serempore, 1822m, P. 273.

Wiberforce এর উত্তরসুরি Weymouth-এর জনপ্রতিনিধি Social Reformist দলের Thomas Fowell Buxton ১৮২৩ খ্রীঃ ‘House of Commons’ এর সভায় উপস্থিত হয়ে Bedford-এর ২৪০০ জনের স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পত্রসহ সতীপ্রথা উচ্ছেদের পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করলেন। নানা প্রতিবাদের ফলস্বরুপ Court of Directors এক চিঠির উত্তরে জানান সরকারি আইন ও হস্তক্ষেপে সতীদাহের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, সতীপ্রথা সর্বসম্মত ধর্মীয় প্রথা নয়। সুতরাং Court of Directors ভারতে সরকারের কাছে এই প্রশ্নটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছে এবং ওই প্রসঙ্গে নিজেদের আন্তরিক সহযোগিতার আহ্বান জানানো হচ্ছে।[১৪]

রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বে সতীদাহ বিষয়ে ইংরেজ কোম্পানি সরকারের তরফে কি কি পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল সেই বিষয়ে অর্থাৎ নির্মম সতীদাহ প্রথার বর্বরতা বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একাধিক উত্তর দিয়েছেন - রাজা রামমোহন রায়ের আগে গভর্নমেন্ট সতীদাহ নিবারণের জন্য সময়ে সময়ে চেষ্টা করেছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালের শেষভাগে প্রথম সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা হয়েছিল। তিনি ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৮০৫ খ্রীঃ ৫ই ফেব্রুয়ারি, তার আদেশানুসারে, ডাওডেস ওয়েল সাহেব রেজিষ্টার গুড সাহেবকে সতী রদ করার জন্য পত্র লিখেছিলেন। তার সারমর্ম এই – “মন্ত্রীসভাধিস্থিত মাননীয় গভর্নর জেনারেল কর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হয়ে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে বিহারের প্রতিটি ম্যাজিস্ট্রেটের পাঠানো চিঠির যে প্রতিলিপি আপনার নিকট পাঠালাম, তা আপনি নিজামত আদালতের বিচারপতিকে দেবেন। দেখতে পাবেন ওই পত্রে লেখা হয়েছে যে, কোনও স্ত্রীলোক তার স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে নিজ দেহ ভস্মীভূত করার চেষ্টা করলে,

[১৪]. Calcutta Review, p 240.

ওই আদালত জাগ্রত আছে যে, এদেশীয় লোকের ধর্মমত, আচার ব্যবহার এবং সংস্কার সবকিছু জেনে, নীতি সুবিবেচনা ও দয়াধর্মের সঙ্গে যতদূর সঙ্গত হতে পারে এবং সকল অবস্থায় কার্যত যতদূর সম্ভব, ততদূর পর্যন্ত তাদের সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ব্রিটিশ সরকারের একটি প্রধান নিয়ম। নিজামত আদালতকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে আদালত যেন প্রথমে পন্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করে নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন যে, এই প্রথা হিন্দু ধর্মানুমোদিত কী না? যদি এই প্রথা হিন্দুধর্মের অনুমোদিত না হয়, তাহলে গভর্নর জেনারেল আদেশ করতে পারেন যে এখুনি না হলেও সহমরণ প্রথা সময়ে রদ হতে পারে। যেকোন প্রকারে হোক, যাতে সহমরনযোগ্যতা স্ত্রীলোকদেরকে মাদক দ্রব্য ও ঔষধ সেবন করানো না হয়। এরূপ করা অনাবশ্যক, অল্প বয়স বা অন্য কোন কারণে, হিতাহিত নিবারণে অক্ষমা স্ত্রীলোকদেরকে মৃত্যু গ্রাস হতে রক্ষা করার উপায় অবলম্বন করা উচিত।[১৫] রামমোহনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তার অভিমুখ প্রধানত দুটি। এক, তাঁর ধর্মভাবনা - তিনি কতটা হিন্দু ছিলেন? দুই, আধুনিকতা নিয়ে তার অবস্থান। এই দুটি বিষয়ের সঙ্গেই তাঁর মৃত্যুচিন্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথম বিষয়টি তার জীবদ্দশাতেই তাকে যথেষ্ট উৎপীড়িত করেছিল এবং তার কারণও সহজেই অনুমেয়। বেদ, উপনিষদ তন্ত্রশাস্ত্রকে আয়ত্ত করে এবং একই সঙ্গে ইসলামিক, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্ঠীয় ধর্মের মূল শাস্ত্রাদি অধ্যায়ন করে তিনি প্রত্যয়ী কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। একটি হল, সবধর্মই আসলে একেশ্বরবাদী এবং সেই কারণে ধর্মে ধর্মে সংঘাত নয়, প্রয়োজন সমন্বয়। অপরটি হল, ধর্মীয় আচার বিচার অনুশাসনই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পাঁচিল তুলে দিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করে। আর এই যুক্তি আশ্রয় করে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন হিন্দুধর্ম যে পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দেয় তার বিরুদ্ধে। বিষয়টি আরও

[১৫]. গৌতম কুমার দাস, সতীদাহ প্রথা, ডাওডস ওয়েল, বিচার বিভাগীয় অধ্যক্ষ, ১৮০৫, ৫ই ফেব্রুয়ারি, পৃঃ ১১০।

জটিল রূপ ধারণ করল সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার প্রশ্নে রামমোহনের অবস্থানকে কেন্দ্র করে। সনাতন হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিরা স্বভাবই যেমন খড়্গহস্ত হলেন অপর দিকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিভূরা তাঁর এই বলিষ্ঠ উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে কার্পণ্য করেননি। ওয়েন্ডি ডনিগার তাঁর 'The Hindus : An Alternative History' (2009) বইতে দেখিয়েছেন যে, এই রাজপুরুষদের এক বড় অংশ মনে করতেন যে সতীদাহ প্রথা হিন্দু ধর্মের নৈতিক অনুসঙ্গ এবং সেই কারণে এই প্রশ্নে তাঁদের হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। অর্থাৎ তাঁরা চালিত হয়েছিলেন যে ভাবনার দ্বারা তার মূল কথাটি ছিল নৈতিক আপেক্ষিকতাকে মান্যতা দিয়ে হিন্দু অস্মিতার বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং এই ভাবনা প্রতিষ্ঠা করা যে ব্রিটিশরা পরধর্মে হস্তক্ষেপ করে না। কারন, তারা যথেষ্টই উদারনীতিবাদী। অপরদিকে ইউলিয়াম বেন্টিঙ্ক এর মতো রাজপুরুষও ছিলেন, যাঁরা এই প্রথার অবলুপ্তির মাধ্যমে উদারনীতিবাদের অভিব্যক্তি হিসেবেই নিজেকে গণ্য করেছিলেন।[১৬]

৪.২.২. মৃত্যু, দেহ, রাজনীতি ও সতীপ্রথা

মৃত্যুসম্পর্কে রামমোহনের চিন্তাধারা তাঁর রচিত গানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এর কয়েকটি উল্লেখ করা যায়। সতীপ্রথা অবলুপ্তি আসলে মৃত্যু দেহ ও বৃহৎ অর্থে সামাজিক রাজনীতির গর্বে এক নতুন চেতনার জন্মগ্রহণ করেছিল। নারীর শরীর পোড়ানোর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের আলোকায়নের যে বর্গটি চিহ্নিত হয়েছিল তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

---

[১৬]. শোভনলাল দাশগুপ্ত, রামমোহন প্রসঙ্গ ও বর্তমান ভারত, দেশ পত্রিকা, ১৭মে ২০২২, পৃঃ ২৩।

ক) এই হল এই হবে এই বাসনায়

দিবানিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়।

মরে লোক প্রতিক্ষণে দেখে তবু নাহি জানে

না মরিব এই মনে, কি আশ্চার্য্য হায়।

খ) মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর

অন্যে বাক্যে কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর

যার প্রতি যত মায়া, কিংবা পুত্র কিবা জায়া,

তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।

গ্রহ হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজনস্তব্ধ,

দৃষ্টিহীন নাড়ী, ক্ষীন, হিম কলেবর।

অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,

বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

গ) একদিন যদি হবে অবশ্য মরন

এত আশা বৃদ্ধি কেন এতদ্বন্দ্ব কি কারণ।

ঘ) গ্রাম করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে।

তথাপি বিষয়মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জনে।

ঙ) অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন

ভ্রান্তও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।[১৭]

রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে দর্শন এবং মৃত্যুচেতনা এই দুটি বিষয়কে আলাদা বর্গে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সতীদাহ প্রথা, সহমরণ এগুলি সামাজিক ধর্মীয় প্রথা হলেও সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা দুটি মৃত্যু সম্পর্কিত বীভৎসতার প্রতিফলন। ইতিহাসের কার্য-কারণ তত্ত্বে সতীদাহ প্রথার সঙ্গে রামমোহনের সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপ যতটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ততটা রামমোহনের দার্শনিকতাকে ঐতিহাসিকতার উত্তরণ হিসাবে দেখা হয়নি। ঊনবিংশ শতকে রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর সামাজিক ইতিহাসে অবদান ও ধর্মীয় অবস্থানের সমালোচনা করা হলেও তাঁর সতীদাহ প্রথা রদ ও বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারের বিরোধ করার পশ্চাতে যে দার্শনিকতা (কার্য কারন তত্ত্ব নয়) নির্মান করেছিলেন তা একমাত্রিক নয় বরং বলা যেতে পারে বহুমাত্রিক। ‘সতীদাহ প্রথা’ রদের মাধ্যমে শুধুমাত্র একটি কুসংস্কার প্রথার রদ নয় বরং এক প্রকার ‘সর্বনামের’ সন্ধান করা যেখানে ‘আমি’র মধ্যে সামাজিকতার শর্তগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে ‘মৃত্যু’ আর সংখ্যার মধ্যে এক গভীর যোগ আছে। রামমোহন রায় এই যোগের বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইছিলেন। রণজিৎ গুহ তাঁর ‘দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা’ বইতে এই বিষয়ে অভূতপূর্ব দার্শনিক আলোচনা করেছেন। Mary Carpenter, এর The Last Days in England the Raja Rammohan Roy, Calcutta: The Rammohan Library; 1915 গ্রন্থে রামমোহনের শেষের মৃত্যুকালীন দিনগুলির এক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করবো রামমোহনের শেষদিনগুলিতে তাঁর সংস্কার ব্যবস্থার মধ্যে সীমিত যুক্তির অসীম

---

১৭. কৃষ্ণা রায়, ধ্যান বা মন্ত্র চেয়ে গান স্পর্শ করে সহজে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০শে জুন ২০২২।

চেতনার সন্ধান করেছিলেন তা সমসাময়িক ইতিহাস বিরল। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে রামমোহনের দর্শন নিয়ে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত মূল্যায়ন হয়নি। একমাত্র ঐতিহাসিক রনজিৎ গুহ 'দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা বইতে তাঁর অভূতপূর্ব দার্শনিকতার প্রত্যয়ের যে স্তর তার শুধুমাত্র দার্শনিক ব্যাখ্যা নয় বরং দার্শনিকদের মধ্যে যে তরঙ্গহীন চেতনা, কল্পনা অনুভূতি থাকে তা অনুসন্ধান করেছেন।[১৮]

রামমোহন ইংল্যান্ডে গেছিলেন *আলবিয়ান* জাহাজে ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে, ইংল্যান্ড থেকে কলকাতার এক ইংরেজ বন্ধু মি. গাউনকে তিনি একটি চিঠি লেখেন। এই বন্ধু রামমোহনকে তাঁর জীবনের একটি বিবরণ লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই চিঠির মধ্যে সেই জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে রামমোহন লেখেন। ইউরোপ দেখার জন্য রামমোহনের মানসিক ইচ্ছা ও প্রত্যাশা কিভাবে পরিপূর্ণ হল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি চিঠিতে রামমোহন লিখেছেন,

"My expectation having been at length realised in November, 1830, I embarked for England, as the discussion of the East India company's Charter was expected to come on, by which the treatment of the natives of India, and its future government, would be determined for many years to come, and an appeal to the king of Council, against the abolition of the practice of burning widows, was to be heard before the Privy Council; and his majesty the Emperor of Delhi had likewise commissioned me to bring before the authorities in England certain encroachments on his

---

[১৮]. রণজিৎ গুহ, দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা, তালপাতা, ২০১০।

rights by the East India Company. I accordingly arrived in England in April, 1831”.[১৯]

১৮৩৩ সালে রামমোহন ব্রিস্টলে স্টেপলটন গ্রোভ-এ মিস ক্যাসের অতিথি ছিলেন। এই সময়ে ১১ই সেপ্টেম্বর স্টেপলটন গ্রোভে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় যাতে বহু সম্মানিত শিক্ষিত বিদ্বৎজনের সঙ্গে রামমোহন মিলিত হয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন; ভারতীয় ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এটি তাঁর সর্বশেষ আলোচনা সভা।[২০]

হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহনের জেহাদ ঘোষণায় যারপরনাই আহ্লাদিত হয়েছিলেন শ্রীরামপুরের খ্রিষ্টান মিশনারিরা। তিনি অচিরেই হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান বনে যাবেন, এই ভাবনায় তাঁরা শান দিতে শুরু করলেন ঠিকই, কিন্তু সেক্ষেত্রেও হিসাবে মিলল না। রামমোহনের প্রত্যয়ী ঘোষণা যে তিনি খ্রিষ্টধর্মের একেশ্বরবাদী ভাষ্য ছাড়া অন্য কোন ভাষ্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন, কারণ রামমোহনের যুক্তি সমান্তরাল, এক রৈখিক নয়, মাঝে মাঝে Pause আছে (ব্রেখটিয়ান Pause বলা যেতে পারে)। ফলত, খৃষ্ট ধর্মের প্রচলিত ভাষ্য ঈশ্বরের যে তিনটি অভিব্যক্তির (ঈশ্বর বা পিতা, শিশু বা পুত্র এবং পবিত্র আত্মা) কথা বলে, তাঁকেও তিনি বর্জন করেছেন। এখানে তাঁর ভাবনা চিন্তাটা একটু অন্যরকম। যুক্তিকে আশ্রয় করে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচলিত ভাষ্যকে প্রতিহত করার এই ভাবনার প্রসার ঘটাতে গিয়ে রামমোহন গভীরভাবে সম্পৃক্ত হলেন একেশ্বরবাদী খ্রিষ্টীয় ভাবনার

---

১৯. Marry Carpenter, THe Last Days in England of the Rajah Rammohan Roy. Calcutta: The Rammohan library and from Reading Ramms, 1915.

২০. শিবাণী রায়, প্রয়াণপথের ভারতপথিক রামমোহন, প্রয়াণকথা স্মরণকথা, সম্পাদক, সুব্রত রায়চৌধুরী, তথ্যসূত্র, ১৫ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৪১৭, পৃঃ ১১।

(Unitarianism) প্রবক্তাদের সঙ্গে যা প্রবলভাবে রুষ্ট করেছিল খ্রিষ্টান মিশনারীদের। আর এই ব্যাপারে ইংরেজ শাসকদের এক বড় অংশের সদস্যরা তার বিরোধীতা করেছিল।[২১] এই বক্তব্যর মধ্যে এক ধরণের একমাত্রিকতা আছে। রামমোহনের যে বেদান্ত দর্শন তার মধ্যে বহু স্বর সবল ও দুর্বলভাবে বিরাজমান। কোনটা, কাকে, কখন, কীভাবে ছাপ, প্রতিচ্ছাপ রাখছে তা নির্ভর করেছে রামমোহনের বাস্তবতা আর তাঁর স্মৃতির ন্যায় অন্যায় বোধের উপর। এখানেই অমিয় প্রসাদ সেন, বলছেন, “আধুনিক ভারতে রামমোহন রায় নিঃসন্দেহে প্রথম চিন্তক, যিনি ধর্ম ও সমাজের মতো আপাত বিচ্ছিন্ন ধারণার মধ্যে এক সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে, সমাজের সীমানার বাইরে ধর্ম অস্তিত্বহীন। ধর্মের কাজ সমাজকে সংগঠিত করা, তাকে সুদৃঢ় এক বন্ধনে বেঁধে রাখা। মূর্তি পূজা ও বহু ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মত থেকে কখনও তিনি সরে আসেননি। রামমোহনের মতে এগুলি সমাজের বিন্যাস (Texture) কে বিনষ্ট করে। মূর্তি পূজা ও বহু ঈশ্বরবাদ এবং সংশ্লিষ্ট আচার অনুষ্ঠান ভারতীয় হিন্দু সমাজের সংস্কৃতিগত ঐক্যকে ক্রমাগত বিঘ্নিত করে চলেছে। এটাই ছিল তার বক্তব্য। রামমোহনের দৃষ্টি মানসে এই দুটি ধারণা থেকেই জন্ম নেয় সঙ্কীর্ণতা ও অহঙ্কার, অসহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িকতা। ১৮১৬ সালে প্রথম হিন্দু হিসেবে রামমোহন রায়ের ‘Hinduism’ শব্দটি উচ্চারণ করা কোনও আকস্মিক ঘটনা ছিল না। সেই সময়ে হিন্দু ধর্মে নানা মত, পথ, বিশ্বাস, আচার প্রচলন ছিল। তবে রামমোহন ‘Hinduism’ শব্দটি ব্যবহার করে দুটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন। এক, তিনি এই শব্দের দ্বারা হিন্দু সমাজে এক ধরনের একতার ধারণা বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। দুই, রামমোহন এই শব্দের মাধ্যমে তাঁর জীবনের অন্যতম

---

[২১]. শোভনলাল দাশগুপ্ত, রামমোহন প্রসঙ্গ ও বর্তমান ভারত, দেশ পত্রিকা, ১৭মে ২০২২, পৃঃ ২৩।

এক লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন - তাঁর ধর্ম সংস্কারের অভিপ্রায়।[২২] যিনি আন্তরিকভাবে ধর্মীয় সংস্কার এবং আন্তরিক সংবেদনশীলতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। হিন্দুধর্মকে ঊনবিংশ শতকের ইউরোপীয় Morality আর ভারতীয় ঐতিহাসিকতার কালিক দূরত্বে বিচার করতে চেয়েছিলেন।[২৩] ঐতিহাসিক মহুয়া সরকারের মতে, রামমোহনের 'সংস্কার ভাবনার পশ্চাতে দুটি দিক ছিল। এক, ধর্মীয়, দুই বৌদ্ধিক। ধর্মীয় আর বৌদ্ধিক চেতনার গভীর সামাজিক সম্পর্ক আছে। Charles Heimsath এর মতে, রামমোহনের ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক সংস্কারের সমানুপাতিক।[২৪] রামমোহন কখনই চাননি তাঁর পরিচিতি ধর্মীয় আঁধারে গড়ে উঠুক। বরং বৌদ্ধিক পরিচিতির উপর তার আগ্রহ বেশী ছিল।[২৫] Max Muller ও Monier Williams এর মতে, রামমোহন রায় ছিলেন আন্তরিকভাবে একজন প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তাবিদ।[২৬] মুঘল আমলের 'সুল-ই-কুল' ধর্মীয় তত্ত্ব থেকে রামমোহন রায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে আকবর আর রামমোহনের ধর্মীয় চেতনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[২৭] ঐতিহাসিক মহুয়া সরকারের মতে,

---

২২. অমিয় প্রসাদ সেন, স্মরণে রামমোহন, দেশ, ২০২২ ১৭মে, পৃঃ ১৫।

২৩. Mahua Sarkar, First Partha Dutta Memorial Leature: Rammohan Roy, vission of a Grand Symbiosis (1772-1833), Sidhukanho - Birsha University, Journal of History, Vol.1, Isst. 2021 p. 1.

২৪. C. H. Heimsatn, Indian Nationalism and Hindu Social Reform: The Dynamics of Indian modernisation, 1773-1885, Princeton, 1964, Introduction.

২৫. মহুয়া সরকার তদেব.

২৬. Iqtidar Alam Khan, 'Akbar and His India: Personality Traits and world outlook: A critical Reappraisal', in Irfan Habib ed. Akbar and His India, New Delhi: Oxford University Press, 1997, Pp. 79-96.

২৭. Tuhfat-ul-Muwahiddin, translated by Moulavi Obaidullah cl obide, reprinted in ninetieth century studies No, 1973 Calcutta, Also Himani Banerji, Raja Rammmohan Roy,

আকবর ও রামমোহনের সামাজিক চিন্তার মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা বলা যেতে পারে সামাজিক সংস্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তির বিশেষ ভূমিকা ছিল সেই জন্যই বোধ হয় রামমোহনের সামাজিক সংস্কারের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বজনীন মানবতাবাদের তফাৎ লক্ষ্য করা যায়।[২৮]

রামমোহনের ধর্মীয় চেতনা অভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় চেতনার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। এক্ষেত্রে রামমোহনের বেদান্ত ধারণার কথা বললে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তবাদ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। অদ্বৈতবাদ মূলত অধিবিদ্যা (Meta Physics)-এর বহু দেবদেবীর ধারণাকে গুরুত্ব বা প্রাধান্য দেয় না । রামমোহনের মতে অদ্বৈতবাদ সমগ্র ইন্দ্রিয়গোচর অভিজ্ঞতার ধারণার জন্ম দেয়। এই অভিন্নতাই রামমোহনের অখন্ড সাংস্কৃতিক আভিজাত্যবোধকে জাগিয়ে তুলেছিল যা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক মাত্রা পায়। হিন্দুদের তাদের বিশ্বাসের জগৎ থেকে সরিয়ে এনে (আধুনিক) ইউরোপীয় ধ্যানধারণায় দীক্ষিত করা যে কি কঠিন ব্যাপার ছিল সেটা যাঁরা জানেন তাঁরা প্রায় ধরেই নেন যে (হিন্দু মানসে) এ ধরণের পরিবর্তন ঘটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই শ্রেণীর লোকেদের কাছে রামমোহনের মত একজন ব্রাহ্মণ যিনি সমুদ্রপার হয়ে ইংল্যান্ডে এসেছেন এবং ভারতীয় বহু দেববাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্য রচিত তার গ্রন্থাবলীর এক সংস্করন রচনা করেছেন স্বয়ং - ব্যতিক্রম বলেই গণ্য হবেন। এ কথা অবশ্যস্বীকার্য, ভারতে ইংরেজ শাসনের আদিপর্ব থেকে সরকার পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের ফলে যে ব্রাহ্মণগণ পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন রামমোহন তাঁদের মধ্যে

---

argument for social reform and paradigm of tradition and modernity in Granthana, Indian Journal of Library Studies, Vol. 4 No. 1, p.4.

২৮. Mahua Sarkar, First Partha Dutta Memorial Leature: Rammohan Roy, vission of a Grand Symbiosis (1772-1833), Sidhukanho - Birsha University, Journal of History, Vol.1, Isst. 2021 p. 2.

প্রসিদ্ধতম। কিন্তু শুধুমাত্র রামমোহন রায়ই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা নয়; যখন স্যার উইলিয়াম জোন্‌স সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলনের উৎসাহে রাধাকান্ত দেব, শর্বরী ত্রিবেদী প্রভৃতি ব্রাহ্মণপন্ডিতগণের কাছে পাঠ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন, তখন থেকেই ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক বোঝা পড়ার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই বোঝাপড়াকে কিভাবে স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করা যায় জোন্‌স তাঁর পরবর্তিগণকে সে পথও দেখিয়েছিলেন।[২৯]

যেদিন এক ইংরেজ এক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন সেদিন থেকে হিন্দুদের পক্ষে বোঝা সহজ হল যে তারা বহু শতাব্দী ধরে যে সব সামাজিক বিধিব্যবস্থা, লোক ব্যবহার ও ভাবধারা বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে আসছেন, তাদের শাসককূলের মধ্যে সেগুলি অনুশীলন করবার আন্তরিক আগ্রহ বিদ্যমান। অপরপক্ষে (হিন্দুদের) সেই অতি জটিল সমাজ ব্যবস্থা ও একই পরিমন্ডল উদ্ভব হেতু তৎসহ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত ধর্ম বিশ্বাস, ব্যবহার বিধি ও রীতিনীতির মর্ম অবগত হয়ে ইংরেজগণও বুঝলেন ইতিহাসে হিন্দুসভ্যতার অসাধরণ দীর্ঘ স্থায়িত্বের কারণ কি? সেই সঙ্গে তাদের এ ধারনাও জন্মালো যে, মহাকাল এ যাবৎ এ সমূহকে রক্ষা

[২৯] [উইলিয়াম জোন্‌স (১৭৪৬ - ১৭৯৪)- অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুভাষাবিদ ইংরেজ মনীষী; ভারতে প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ পথিক। ১৭৮৩ খ্রীঃ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন এবং পরের বছর (১৭৮৪) গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ এর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে (১৭৯৪) পর্যন্ত জোন্‌স এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন। সমগ্র এশিয়া খন্ডের জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য বিষয়ক অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে পরবর্তী দুই শতাব্দীকালে এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবোজ্জ্বল। ভারতবর্ষে দেশীয় পন্ডিতদের সহায়তায় তিনি সংস্কৃতি ভাষাও উত্তমরূপে শেখেন। এক্ষেত্রে তার ঈশোপনিষদ সমুসংহিতা, শকুন্তলা, হিতোপদেশ, ও গীত গোবিন্দ-র ইংরেজি অনুবাদ এবং বহু সংখ্যক গবেষণামূলক নিবন্ধ তাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।']

করে এসেছেন একমাত্র সেই কাল প্রভাবেই ভবিষ্যতে এগুলির হয় সংস্কার না হয় বিলুপ্তি সম্ভব হতে পারে। এই বোঝাপড়ার ফলে ভারতবর্ষের লাভ হয়েছিল। তার ধর্ম ও ব্যবহার বিধির সংরক্ষণ, আবার এরই ফলে ইংল্যান্ড ভারতবর্ষের উপর তার অধিকার বেশ পাকাপোক্তভাবেই কায়েম করে নিতে পেরেছিল এবং ইউরোপীয় পন্ডিত সমাজ এই আশ্চর্য দেশের সৌঠালী ও সাহিত্য অনুশীলনের দ্বারা এর (সমগ্র) সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কেননা ব্রাহ্মণগণও যখন দেখলেন (শাসক) ইংরেজরা তাদের কাছে পাঠ গ্রহণে স্বীকৃত, তখন তাঁরাও ইংরেজের শিষ্য হতে বিলম্ব করলেন না। কলকাতায় তাঁদের তত্ত্বাবধানে যে অসংখ্য সংস্কৃত ও বাংলা পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে তাঁদের ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে লাভবান হওয়ার ব্যগ্রতা এবং জগতের সম্মুখে নিজেদের সাহিত্যিক ঐশ্বর্যের পরিচয় দেবার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট। এই বিদ্বান ব্রাহ্মণ রামমোহন রায় যিনি এই ভাষা অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে লেখেন আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করবার জন্য হিব্রু ও গ্রিক চর্চাতেও যথেষ্ঠ আগ্রহ দেখিয়েছেন।[৩০]

সহমরণ, সতীদাহ প্রথা রদ ও বিভিন্ন সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে রামমোহন রায়কে বিভিন্ন উপায়ের অবলম্বন নিতে হয়েছিল। আলোচ্য নিবন্ধে রামমোহনের ধর্মচিন্তার একটি দিক দেখানো হয়েছে। সতীদাহ প্রথা রদ তো একদিনে বা কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়নি। তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছিল। রামমোহনের আগে দেশীয় সমাজের কাঠামো এবং শিকড় নিয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে কেউ ভাবেনি। তাই সমস্যা আর সমাধান কোনোটাই প্রচলিত ধারণা ছিল না বরং রামমোহন রায় সমস্যাটাকে বিশেষত যেখানে ধর্মীয় চেতনার প্রশ্ন জড়িয়ে সমস্যাকে একটু মোটা দাগে বোঝাতে চেয়েছেন। তারপর তার সমাধান করা যাবে, এই রকমই একটি

৩০. দিলীপ কুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রবোধচন্দ্র সেন জন্মশতবর্ষ স্মাঁরক গ্রন্থ, সম্পাদক ভবতোষ দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৯৯।

বিন্যাস তার মাথায় কাজ করেছিল। সতীদাহ প্রথা একটি কুসংস্কার, রামমোহন রায় তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং রদ করেছিলেন এইটুকু বলে দিলে সতীদাহ ও রামমোহন কোনটাই ভালভাবে বোঝা যাবে না। সতীদাহ প্রথার সঙ্গে অনেকগুলি প্রতিশব্দ জড়িয়ে আছে, যথা 'মৃত্যু', 'হত্যা', 'দেহ', 'অগ্নিদাহ', 'আত্মহত্যা', 'শোক', 'উত্তরণ' এগুলি সতীদাহের আলোচনার অনুসঙ্গ হিসাবে আসবেই। বৃহৎ অর্থে বলা যেতে পারে মৃত্যু ও তার চেতনার লগ্ন-বিলগ্নের সম্পর্ক। কিন্তু এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা উচিৎ, শুধুমাত্র পন্ডিতি দিয়ে রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করেননি বা বিরোধিতা করেননি। রনজিৎ গুহ তার দয়া রামমোহন ও আমাদের আধুনিকতায় গ্রন্থে দেখিয়েছেন- প্রেম, দয়া, করুণার মাধ্যমে রামমোহন শাস্ত্রীয় যৌক্তিক বয়ানকে অতিক্রম করছেন এবং সমস্যাকে কখনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নিকটে রেখে সমাধান করছেন বা বয়ান তৈরী করছেন যৌক্তিক স্মৃতির বিস্তৃতির দূরত্বে। আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য, রামমোহনের ধর্মীয় চিন্তার বা আধুনিকতার পাশাপাশি 'সংগীতের ব্যবহার'। 'ব্যবহার' কথাটা এইজন্য বললাম তার কারণ, ব্রাহ্ম সংগীত (শব্দ আর সুর) এর ব্যবহার রামমোহনের সমাজ সংস্কারের একটি কৌশল বলা যেতে পারে। শব্দ ভুলে গেলেও অনেক সময়ে স্মৃতিতে সুর থেকে যায়। এক্ষেত্রে রামমোহনের পরে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর উত্তরসাধক বলা যেতে পারে। রামমোহন রায়ের গানের শব্দগুলির মধ্যে একধরনের মৃত্যুর ভাবাদর্শ খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মে সংগীতের ব্যবহার করেছিলেন বলে তাঁকে যথেষ্ঠ সমালোচিত হতে হয়েছিল, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মাদ্রাজের সেইন্ট জর্জ কলেজের প্রধান ইংরেজি শিক্ষক শংকর শাস্ত্রী লিখিত এক ইংরেজি পত্রের উত্তর।[৩১] 'এই পত্রে শংকর শাস্ত্রী বলতে চেয়েছেন, "ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা গুণবাচক চিহ্নের অর্চনার মত যেসব ক্রিয়াকর্ম বেদ

[৩১]. শঙ্কর শাস্ত্রীর পত্রখানির তারিখ ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৬, Madras Courier-এ মুদ্রিত হয়েছিল ৩১ ডিসেম্বর ১৮৯৬ সংখ্যা।

অনুমোদন করেছে, সেগুলি মানুষের চিত্রকে ঈশ্বরের অসীম পরিপূর্ণ স্বরূপের অভিমুখী করবার উপায়বিশেষ; সুতরাং রামমোহন রায় সেগুলি বর্জন করে ভুল করেছেন। পাঠকবর্গ সম্ভবতঃ শাস্ত্রীয় যুক্তিগুলির ধরণ ও গঠনবিন্যাস সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হবেন। রামমোহন পরিচালিত ধর্মমন্ডলী কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে 'Madras courier' পত্রিকায় বলা হয়েছিল "আমরা শুনেছি হিন্দুধর্মের সমস্ত বড় বড় পার্বন উপলক্ষে রামমোহন রায় স্থাপিত 'আত্মীয়সভা'-র অধিবেশন বসে। এর উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র সভার সদস্যগণকে দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখাই নয়, বেদবিহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে তাদের বিশ্বাসে নতুন করে শক্তি সঞ্চার করাও বটে। এইসব অধিবেশনে তাদের অপেক্ষাকৃত কুসংস্কারচ্ছন্ন দেশবাসীর মত তাঁরা নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করে থাকেন। যদিও তাদের সঙ্গীতগুলি তাঁদের নিজস্ব ভাবধারার প্রকাশক।" এই বিবৃতির উপর শংকর শাস্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তা হল : "এ পর্যন্ত বেদের শিক্ষা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার থেকে বোঝা যাবে, আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে না পারলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না; যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, প্রায়শ্চিত্ত, পূজা, শাস্ত্রপাঠ এবং শাস্ত্রের অর্থগ্রহণ ও অর্থবিচার ছাড়া সেই বিশুদ্ধীকরণ অসম্ভব। কিন্তু সভানুষ্ঠান বা গীত, বাদ্য, নৃত্যাদি স্থূল ঐহিক আমোদ প্রমোদের মধ্যে গণ্য; শাস্ত্র এগুলিকে মন বিশুদ্ধ করবার উপায় বলে স্বীকার করেননি। প্রশ্ন হতে পারে একেশ্বরবাদের তত্ত্ব প্রকাশই যদি এই গীত বাদ্য প্রভৃতির লক্ষ্য হয় তবে তার দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হতে পারবে নাই বা কেন? উত্তরে আমি বলব, সংসারে প্রত্যেক কর্ম সম্পন্ন হয় তার নিজস্ব নিয়ম অনুসারে, যেমন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দুধ বা ঐ জাতীয় কোন পানীয়ের একান্ত প্রয়োজন, বালির দ্বারা তা সাধ্য নয়। তৃষ্ণা শান্তির উপায়গুলি মানুষ তার অভিজ্ঞতা ও লোক ব্যবহার থেকেই জানতে পারে। কিন্তু মনোরাজ্যের অবগত ও অদৃশ্য বৃত্তিসমূহের শুদ্ধীকরণ কখনই মানুষের নিজস্ব বুদ্ধির সাহয্যে সাধিত হতে পারে না। তা একমাত্র ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট প্রজ্ঞার দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং এর

জন্য (প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রনির্দিষ্ট) যজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত, পূজাবিধি প্রভৃতি বর্জন এবং তার পরিবর্তে নৃত্যগীত বাদ্যাদির প্রবর্তন কোনও ধর্মমতের পক্ষেই স্বীকার্য হতে পারে না।" সমালোচনার জবাব রামমোহন এইভাবে দিয়েছেন "আমি স্বীকার করছি ঈশ্বরোপাসনা কালে নৃত্যের অনুমোদন শাস্ত্র করেননি। তদনুসারে আমাদের উপাসনার নৃত্যের ব্যবহার আমরা কদাচি করিনি। 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রে আমাদের উপাসনায় নৃত্যানুষ্ঠানের যে উল্লেখ করা হয়েছে, তার একমাত্র কারণ এ বিষয়ে সম্পাদক ভুল খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু উপাসনায় একেশ্বরবাদমূলক সংগীত ব্যবহারের সমীচীনতার প্রশ্নে আমি পত্রলেখক মহোদয়ের দৃষ্টি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১১৪ ও ১১৫ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ের প্রতি আকর্ষণ করতে চাই। যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরধ্যান উপলক্ষে কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যবহারই অনুমোদন করেনি, ইতরজন রচিত গানকেও পাঙক্তেয় বলে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া এটাও তো স্পষ্ট যে কোনও হৃদয়গ্রাহী ভাব সাধারণ প্রচলিত ভাষ্যমাধ্যম অপেক্ষা গানের সুরে বসানো কাব্যের মাধ্যমে মানুষকে অধিক আকুল করে।[৩২, ৩৩]

---

[৩২]. [যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার এই দুটি শ্লোকের উল্লেখ রামমোহন দ্বিতীয়বার করেছেন তার 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩) নামক পত্রিকায় । উপাসনায় সংগীত ব্যবহারের জন্য কেবল মাদ্রাজের শংকর শাস্ত্রী নন, কলকাতায় তাঁর প্রতিপক্ষগণও তাঁর উপর যথেষ্ঠ কটাক্ষ করেন। 'প্রার্থনাপত্র' নামক রচনাটিতে তিনি উত্তরে দশনামা সন্ন্যাসীদের অনেক গোষ্ঠী গুরু নানকের সম্প্রদায়, দাদুপন্থী, কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বীদের উদাহরণ দেখিয়ে বলেছেন "ভাষ্‌বাক্যই তাঁহাদের উপদেশের দ্বারা এবং ভাষাগণাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে।" যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (৩। ১১৪-১৫)। এর উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় এই : "ঋগগাথা পাণিকাদক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকাঃ। গেয়মেতত্তদভ্যাসকরণানেমাক্ষ সংজ্ঞিতম্। বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি।" লক্ষ্য করবার বিষয় ঋগগাথার পাশাপাশি পানিকা ও দক্ষবিহিতা নামক দুই শ্রেণীর অবৈদিক গীতিকে উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকে 'ব্রহ্মগীতিকা' বা ব্রহ্মবিষয়ক গান বলা হয়েছে। এর সঙ্গে রামমোহন কর্তৃক প্রচলিত 'ব্রহ্মসংগীত' অভিধার সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।]

[৩৩]. দিলীপ কুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রবোধচন্দ্র সেন জন্মশতবর্ষ স্মাঁরক গ্রন্থ, সম্পাদক ভবতোষ দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১০৫-১০৬, ১১৭।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে রামমোহনের সমাজসংস্কার এর পশ্চাতে যে যুক্তিবোধ বা বলা যেতে পারে বোধের যুক্তির আধারে 'সংগীত' বিশেষত 'সুর' একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা বিমূর্ত মাধ্যমে যা ঐতিহাসিক কালিকতাকে চক্রবৃত্তকারে সন্ধান করতে পারে। অনেকবছর পরে আর এক ভারতীয় মনীষী বা বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে রামমোহনের উত্তর সাধক রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে বলছেন -"সংগীত কৌশল প্রকাশের স্থান নহে, ভাব প্রকাশের স্থান, যতখানিতে ভাবপ্রকাশের সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত, যাহা কিছু কৌশল প্রকাশ তাহা সংগীত নহে, তাহার অন্য নাম। এক প্রকার কবিতা আছে তাহা সোজা দিক হইতে পড়িলেও যাহা বুঝায়, উল্টা দিক হইতে পড়িলেও তাহাই বুঝায়। সেরূপ কবিতা কৌশল প্রকাশের জন্যই উপযোগী, আর কোনো উদ্দেশ্য তাহাতে সাধন করা যায় না। আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগ-রাগিনী রচনা শুরু করা হইত, যখন আমাদের রাগরাগিনীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগ রাগিনী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না।[৩৪]

সংগীতের পক্ষে এত সওয়াল করার কারণ হল রামমোহন রায়ও সংগীতকে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে দেখেননি। সংগীতের 'ভাব' তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমাজ সংস্কার কিছু গ্রন্থ আর প্রবন্ধ লিখলেই হয়ে যায় না। সতীদাহের মত, প্রাচীন প্রথা রদ করার

[৩৪] রবীন্দ্রঠাকুর, সংগীতচিন্তাঃ সংগীত ও ভাব, বেথুন সোসাইটিতে বক্তৃতা, ১২৮৮ ৯ বৈশাখ, বিশ্বভারতী, ১৮৮১ ১৯ এপ্রিল, পৃঃ ৭-৯।

জন্য নতুন ভাষা, ভাব, সংস্কৃতিক চিহ্নের জন্ম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তা না হলে সংস্কারের ক্রমপ্রসারতা থাকবে না, আর ক্রমপ্রসারতার মধ্যে একটা মেরুতে নিভৃতে ব্যক্তির বিমূর্ততা, অন্য আর একটা মেরুতে সমূহের বিমূর্ততা অবস্থান করে। আরও একবার রবীন্দ্রনাথের সংগীত চিন্তা প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথের সংগীত চিন্তা খুবই দরকারী বা জান্তব দর্শনচিন্তা, তার মধ্যে শুধু সংগীত নয় ঐতিহাসিক চেতনা কিভাবে রক্ষিত হয় সেটা জানা প্রয়োজন। চেতনার মধ্যে ব্যক্তিগত আর সমূহের মধ্যে কী সীমা অসীমতা আছে তা বোঝা অত্যন্ত জরুরি। এখানে রবীন্দ্রনাথ সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা প্রবন্ধে বলেছেন : "স্পেনসর সংগীতের (The origin and function of music) শরীরগত কারণ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঁধা কুকুর যখন দূর হইতে তাহার মনিবকে দেখে, বন্ধনমুক্ত হইবার আশায় অল্প অল্প লেজ নাড়িতে থাকে। মনিব যতই তাহার কাছে অগ্রসর হয়, ততই সে অধিকতর লেজ নাড়িতে এবং গা দুলাইতে থাকে। মুক্ত করিয়া দিবার অভিপ্রায় মনিব তাহার শিকলে হাত দিলে এমন সে লাফালাফি আরম্ভ করে যে, তাহার বাঁধন খোলা বিষম দায় হইয়া উঠে। অবশেষে যখন সম্পূর্ণ ছাড়া পায় তখন খুব খানিকটা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া তাহার আনন্দের বেগ সামলায় এই রুপ আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীরই মাংসপেশীতে ও তার অনুভঞ্জনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মানুষও সুখে হাসে, যন্ত্রনায় ছটফট করে। অর্থাৎ শরীরের মাংসপেশী সমূহে মনোবৃত্তির প্রভাব তরঙ্গিত হইতে থাকে। মনোবৃত্তির অতিরিক্ত তীব্রতায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি বটে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ নিয়ম স্বরূপে বলা যায় যে শরীরের গতির সহিত হৃদয়ের বৃত্তির বিশেষ যোগ আছে। তাহা যেন হইল, কিন্তু সংগীতের সহিত তাহার কি যোগ আছে? আমাদের কণ্ঠস্বর কতকগুলি বিশেষ মাংসপেশী দ্বারা উৎপন্ন হয়; সে সকল মাংসপেশী শরীরের অন্যান্য পেশী সমূহের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের উদ্রেকে সংকুচিত হইয়া যায়। সংগীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে

স্পেনসর বলিতেছেন - আপাত মনে হয় যেন - সংগীত শুনিয়া যে অব্যবহিত সুখ হয়। তাহাই সাধন করা সংগীতের কার্য। কিন্তু সচরাচর দেখা যায়, যাহাতে আমরা অব্যবহিত সুখ পাই তাহাই তাহার চরম ফল নহে। আহার করিলে ক্ষুধানিবৃত্তির সুখ হয় কিন্তু তাহার চরম ফল শরীর পোষণ, মাতা স্নেহের বশবর্তী হইয়া আত্মসুখসাধনের জন্য যাহা করেন তাহাতে সন্তানের মঙ্গল সাধন হয়, যশের সুখ পাইবার জন্য আমরা যাহা করি তাহাতে সমাজের নানা কার্য সম্পন্ন হয় ইত্যাদি, সংগীতে কি কেবল আমোদ মাত্রই হয়? অলক্ষিত কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয় না? সকল প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা ভাবের চিহ্ন (Signs of ideas) আর ধরণ অনুভাবের চিহ্ন (Signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ পায়। 'ধরণ' বলিতে যদি সুরের বাঁকচোর উঁচু নিচু সমস্যাই বুঝায় তবে বলা যায় যে বুদ্ধি যাহা কিছু কথায় বলে। হৃদয় ধরন দিয়া তাহারই টীকা করে। কথাগুলি একটা প্রস্তাব মাত্র আর বলিবার ধরণ তাহার টীকা ও ব্যাখ্যা। সকলেই জানেন, অধিকাংশ সময়ে কথা অপেক্ষা তাহা বলিবার ধরণের উপর অধিক নির্ভর করি। অনেক সময়ে কথায় যাহা বলি, বলিবার ধরণে তাহার উল্টা বুঝায়। 'বড়োই বাধিত করলে' কথাটি বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করিলে কিরূপ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে সকলেই জানেন। অতএব দেখা যাইতেছে আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা বলিয়া থাকি, ভাবের ও অনুভাবের।"[৩৫]

---

[৩৫] রবীন্দ্রঠাকুর, সংগীতচিন্তাঃ সংগীত ও ভাব, বেথুন সোসাইটিতে বক্তৃতা, ১২৮৮ ৯ বৈশাখ, বিশ্বভারতী, ১৮৮১ ১৯ এপ্রিল, পৃঃ ১১-১৩।

এখানে রবীন্দ্রনাথের স্পেনসারের উল্লেখিত অনেকগুলি বাক্য লক্ষ্য করার মতো "'অলক্ষিত' কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।" এই অলক্ষিতই হচ্ছে সামাজিক অনুভূতির স্থান। আরও বৃহৎ দার্শনিকতা এর মধ্যে আছে। রণজিৎ গুহ 'ছয় ঋতুর গান', 'কবি ও কবির সর্বনাম' গ্রন্থে এ নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। আমাদের মূল লক্ষ্য ইতিহাসেরও যে 'হিস্টরিসিটি আছে তা রামমোহনের কাছে সংশয়মূলক বরং রামমোহন বিভিন্ন প্রকরণ (epistomological) জ্ঞানতত্ত্বের প্রকল্পে ইতিহাসকে ট্রান্সহিস্টরিসাইজ করেছেন। এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে ভাষা, ব্যাকরণ, মুক্তি, চেতনা, বৈজ্ঞানিক বা না বিজ্ঞান চেতনা প্রভৃতি, সন্ধর্ভ নির্ভর আকর। ধার্মিক সমাজের শ্রেণী কাঠামো ভাঙতে চাইলেও আধুনিক চিন্তকদের মতো রামমোহনকেও গভীর সত্য অথবা ডিপ স্ট্রাকাচার এর ভিতরে প্রবেশ করতে হয়েছিল, 'অর্থের' (Meaning) একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি রামমোহন-পন্থীদেরকেও চাইতে হয়েছিল।

রামমোহন রায় নিজে সংগীত চর্চা কীভাবে শুরু করলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। চল্লিশোত্তর প্রৌঢ় রামমোহন সমসাময়িক ওস্তাদ গায়ক ধ্রুপদী ও টপ্পা বিশেষজ্ঞ কালী মির্জা তথা কালী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গানের চর্চা করেছিলেন। তার কিছু পর থেকে তাঁর ভাবসমৃদ্ধ রাগাশ্রয়ী ব্রহ্ম সঙ্গীত জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। সেগুলো শ্রোতাদের মধ্যে মুগ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। ব্রহ্মসঙ্গীত নামটি রামমোহনেরই দেওয়া। অনুমান করা হয়, বৈষ্ণব মনোভাবাপন্ন পিতৃপরিবার এবং শাক্ত মতাবলম্বী মাতৃ পরিবারের উত্তরাধিকার বহনকারী আশৈশব কীর্তন, শ্যামা সঙ্গীত শুনেছেন, জমিদার বাড়ির পুরোনো প্রথামাফিক ওস্তাদি ঘরানার ও মার্গ সঙ্গীতের স্বাদ নিয়েছেন। গবেষকদের মতে তাঁর প্রথম লেখা গান ১৮১৬ তে, সিন্ধু ভৈরবী রাগে টুংরি তালে রচিত গানটি হল 'কে ভুলালো হায়'। ১৮১৬ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার এক অধিবেশনে এই গান গাওয়া হয়। তার দ্বিতীয় গান। "ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়" সাহানা রাগে, ধামার তালে নিবদ্ধ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে

প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'তে 'ব্রহ্ম-সংগীত' অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে তার রচিত বত্রিশটি গান। জীবনের শেষ গানটি লিখেছিলেন ব্রিস্টলে ১৮৩২ সালে। মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন আগে ব্রহ্মসমাজের জন্য লেখা এই গানটি জেষ্ঠপুত্র রাধা প্রসাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। প্রবাসে থেকেও বিস্মৃত হননি তাঁর উপাস্য থেকে -

"কি স্বদেশ, কি বিদেশ
যথায় তথায় থাকি তোমার দেখি
না থাকি একাকী।"

কিন্তু কেমন গান রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীত? বেদান্ত উপনিষদের অদ্বৈতবাদ আর ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের একেশ্বরবাদ সংশ্লেষে রামমোহনের মনে জগতের সৃষ্টি কর্তা বা পরমেশ্বর সম্বন্ধে অমূর্ত ধারণা গড়ে উঠেছিল, তিনি ভেবেছিলেন তাঁকে উপলব্ধির ও তাঁর উপাসনার জন্য ধ্যান বা মন্ত্রপাঠ যথেষ্ঠ নয়। বরং উপসনা সভার সাম্প্রদায়িক অথচ জ্ঞানসমৃদ্ধ গানের পরিবেশন অনেক কার্যকারী। গানের মাধ্যমে সহজেই বহু মানুষের মন স্পর্শ করা যায়। তাঁর গানের ভাষা যদিও বিবরণ অথবা উপদেশধর্মী, তবু লেখায় ছন্দ মিলিয়ে অন্ত মিল নিখুঁত করার তিনি প্রচেষ্টা করেছেন। আর এভাবেই ভারতীয় রাগ-রাগিনীর আধারে ব্রহ্মবিষয়ক বাণী সংযুক্ত করে নির্মাণ করলেন এক নতুন ধারার গান বা ব্রহ্মসঙ্গীত।[৩৬]

[৩৬] কৃষ্ণা রায়, Raja Rammohan Roy: ধ্যান বা মানের চেয়ে গানে মন স্পর্শ করা সহজ, আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন, ২০২২ ৩০ শে জানুয়ারি।

আমাদের টুকরো হয়ে যাওয়া ভাষা (ধর্মীয়) ও আত্মগুলির মধ্যে সমন্বয়ের জন্য অনুভূতি সচেতন অভিজ্ঞতা, সংবেদশীলতা স্বর্বেশ্বর প্রতিকামী চিন্তার প্রয়োজন। 'সংগীত' রামমোহনের কাছে শুধুমাত্র বিনোদন নয় একথা বোঝা যাচ্ছে সংগীত কালীকতার উত্তরণের মাধ্যমে। রামমোহন ও সতীদাহ আলোচনা প্রসঙ্গে, একটি বিখ্যাত বাংলা চলচ্চিত্র এর কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। ছবিটির নাম আগুন্তুক (Agantuk)। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের নিজের গল্প 'অতিথি' অবলম্বনে আগুন্তুক ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছিল। সত্যজিৎ রায় নিজে ব্রাহ্ম পরিবারে বড় হয়েছিলেন। আলোচ্য চলচিত্রের গল্প আর আমাদের আলোচনার মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলেই এই প্রসঙ্গটি আনলাম। আলোচ্য চলচিত্রে মুখ্য চরিত্রের নাম মনোমোহন (অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত) জানি না রামমোহন এর ভাবছায়ায় সত্যজিৎ এই চরিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন কিনা। পুরো সিনেমাটার গল্প বলা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু সিনেমাটির মধ্যে একটি প্রচলিত ভদ্রলোক সমাজের আধুনিকতা বা শহুরে নাগরিক সমাজের আলোকিত যুক্তিবোধের যে চৈতন্য তাকে সত্যজিৎ রায় আপাদমস্তক কাটাছেঁড়া করেছেন। সভ্যতা, ভাষা, সমাজ, পরাধীনতা, আধুনিকতা, অনাধুনিকতা প্রভৃতি বিষয় খানিকটা রামমোহনের প্রবর্তকের নিবর্তকের সম্বাদ এর মতো উঠে এসেছে। দুপক্ষের চরম বা পরম যুক্তির মাঝখানে নির্মান হচ্ছে ভালোবাসা, স্নেহ, কামনা, বাসনা ইত্যাদি বিমূর্ত সামাজিক সম্বন্ধের আকরগুলি (বিমূর্ত)। এখানেও ভাষা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহন থেকে সত্যজিৎ 'ভাষা' হল 'মানুষে'র অস্তিত্বের প্রমাণ একথা জানতেন। রামমোহনকেও নব্যভাষায় সন্ধান করতে হয়েছিল। ধর্মীয় চালু আদিকল্পের বদলে নতুন আদিকল্পের সন্ধান করতে হয়েছিল। মনোমোহন বলেছেন "একটা পাশপোর্ট থেকে কি জানা যায়? নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে নাও, ছবির সঙ্গে মুখ মিলিয়ে নাও, তাতে মানুষটাকে চেনা যায় না। তার জন্য সময় লাগে, সেই সময়টার দরকার ছিল।" এই 'সময়' বোধ হয় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং

সত্যজিৎকেও এক পংক্তিতে এনে ফেলেছে। সতীদাহ প্রথা রদের প্রসঙ্গে রামমোহনও সময় নিয়েছিলেন। ১৮১২ সালে রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। ১৮২৯ খ্রীঃ আইন পাশ হয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন রামমোহন অনেক আগেই সতীদাহ বন্ধ করতে পারতেন সে সুযোগ তার ছিল একথা সত্য। কিন্তু রামমোহন রায় খুব ভালোভাবেই জানতেন সহমরণ, সতীদাহ রদ করা শুধুমাত্র তার কাজ নয়। সতীদাহের সঙ্গে 'মৃত্য', সম্পর্কিত একটি বিষয়। মৃত্যুর যে একটা সামাজিকতা প্রয়োজন। মরার পরও কী মরা যায়? যদি না সামাজিকতা থাকে। আর এই সামাজিকতা আসে শ্রদ্ধা, দয়া, ভক্তি, বাসনা থেকে, সমাজের শোকের যে একটা ভাষা আছে তাকে না ধরতে পারলে শুধুমাত্র সতীদাহ বিরোধীতা করে ঐতিহাসিকতার কালোর্ত্তীনতা সম্ভব নয়। বর্ণ, গোষ্ঠী পরিবারের চৌহদ্দি পেরিয়ে গ্রাম্যতা ও আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে সমগ্র হিন্দু সমাজের বিবেচ্য সার্বজনিক প্রসঙ্গে যৌক্তিকতার ব্যাপক ও আধুনিক ব্যবহার বোধ করি বাংলা ভাষাতে এই প্রথম। কিন্তু তার নূতনত্ব, ভাষ্যতেই শুধু নয়, মেজাজেও। শাস্ত্র ও যুক্তির বাদ-অনুবাদে এই রচনাবলীর যা বক্তব্য তার আবেদন, ভারে ও ধারে, প্রধানত বুদ্ধির কাছে। তবুও বিদ্যার গম্ভীর, তর্কলোকে উজ্জ্বল সেই কার্যকারণের সজ্জাতে ও মাঝে মাঝেই অতর্কিতে, যে একটা করুণার ছায়া পড়েছে, তা মনে রাখার মতো।[৩৭]

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ-এর মতামত উল্লেখযোগ্য। 'রামমোহনের যুক্তি নিষ্ঠা কেন যে এই "নিষ্ঠুর জীবন তত্ত্ব থেকে বেশ আলাদা তা বোঝা শক্ত নয়। তখন উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এদেশে যুক্তিবাদের কৈশোরকাল। সত্তার সবখানি তখনও যুক্তিবাদী বুদ্ধির মুষ্টিগত হয়নি।' ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহের মতে, 'আমরা জানতে চাই দয়ার কথা এই তর্কে হঠাৎ কী করে এসে গেল? হচ্ছিল লড়াই শাস্ত্রে আর যুক্তিতে জ্ঞানের মল্লভূমিতে, কেননা

৩৭. রণজিৎ গুহ, দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা, তালপাতা, ২০১০, পৃঃ ১৬।

উভয়ই জ্ঞানবিষয়ক। প্রতিপক্ষ নিঃসন্দেহে হেরে গেছে। তবুও বিজিত দল যে ধিকৃত হলো দয়ার নামে, তা কি অপ্রাসঙ্গিক নয়? যেখানে দাঁড়িয়ে তর্ক হচ্ছিল সেই জমিটাই তো বদলে গেল। না কি শাস্ত্র ও যুক্তির কিনারা ছাপিয়ে উদ্বেল যে-দয়া, তাও একপ্রকার জ্ঞান রামমোহনের চিন্তায়? উত্তরে, দিলীপ কুমার বিশ্বাসের একটি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। দিলীপ কুমার বিশ্বাসের মতে, পরিণত বয়সে রামমোহন Common Sense নামক আরো একটি প্রমাণ ব্যবহার করেছেন শাস্ত্র ও যুক্তির পাশাপাশি।'[৩৮]

শাস্ত্রপরিক্রমার প্রথম পর্বের যুক্তিবাদ থেকে উত্তর পর্বের প্রত্যাদেশবাদে উত্তরণ পর্যন্ত রামমোহন মানসের অভিব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করলে তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিণত জীবনে শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়কে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু 'তুহফাৎ' এ প্রত্যাদেশ, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ (miracle), মধ্যবর্তিবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর যে সুস্পষ্ট মত প্রকাশিত হয়েছিল, উত্তর জীবনের শাস্ত্রস্বীকৃতি দ্বারা তা কিছু পরিমাণে সংশোধিত হলেও খন্ডিত হচ্ছে না। এই প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞান যুক্তি ও বিচার বুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই তা গ্রহণযোগ্য একথা পরবর্তী জীবনেও রামমোহন খুব জোরের সাথেই বলেছেন। Presepts of Jesus এর ভূমিকায় যীশুর উদ্ধৃত উপদেশগুলি সংগ্রহের অন্যতম কারণ তিনি এই দেখিয়েছেন যে এগুলি হল "Most Consistent with laws of nature, and conformable to the dictates of reason and human revelation"। দেখা যাচ্ছে তিনি শাস্ত্রকে অতি প্রাকৃত বা অলৌকিকের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার ও যুক্তির আলোকে পরীক্ষা করবার পক্ষপাতী; এবং 'Nature' ও 'Reason' তার ক্রমবিন্যাসে 'revelation' বা প্রত্যাদেশের অন্তবর্তী। এই 'Reason' এবং 'Revelation' এর সঙ্গে তিনি অন্য একটি

[৩৮] রণজিৎ গুহ, দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা, তালপাতা, ২০১০, পৃঃ ৩৫।

প্রমাণের উল্লেখ করেছেন - যেটিকে তিনি বলতেন 'Common Sense' বা সহজ বুদ্ধি। শাস্ত্রালোচন ও ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে এই তিনটি বৃত্তির উপযুক্ত সংমিশ্রনই ছিল তাঁর মতে আদর্শ। ইংল্যান্ডে ইউনিটেরিয়ান এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সংবর্ধনার উত্তরে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : "The is a battle going on between reasons scripture and common sense and wealth, power and prejudice. There three has been struggling with the truth."[৩৯] লক্ষ্যনীয় এখানেও 'Reason' এর স্থান প্রথম।

রামমোহন রায় ইউরোপীয় দুই মনীষীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তারা হলেন ডেভিড হিউম ও জন লক। ডেভিড হিউম ছিলেন সংশয়বাদী, রামমোহন ছিলেন বিশ্বাসী। রামমোহনের ধর্মবিশ্বাসে অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতের কোন স্থান ছিল না। যুক্তির সঙ্গে শাস্ত্র বিশ্বাসের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে যে মনীষী তাঁকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছিলেন তিনি নিঃসংশয়ে ইংরেজ দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) । 'Final Appeal' গ্রন্থে লক কে তিনি "One of the greatest man that ever lived" বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।[৪০]

সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য রামমোহনের 'Common sense' বা সহজ জ্ঞান (দিলীপ বিশ্বাস কর্তৃক অনুবাদ) এক বিশেষ দার্শনিক অবস্থান। এই জ্ঞান অভিজ্ঞাত-জাত নয়। তা স্বভাব প্রাগভিজ্ঞ (A priori) । অভিজ্ঞতা-জাত নয় বলে অর্থাৎ উপস্থিত (আমি ও আমি নয় + প্রতিক্রিয়া) জ্ঞান বা বাংলায় একে লৌকিক বা সাধারণ জ্ঞান বলে ডাকা হয়।[৪১] অবশ্য,

[৩৯] দিলীপ কুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রবোধচন্দ্র সেন জন্মশতবর্ষ স্মাঁরক গ্রন্থ, সম্পাদক ভবতোষ দত্ত, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৭৪-৭৫।

[৪০] Final Appeal English Works (G) Vol. II, Pp. 321.

[৪১] Surendranath Dasgupta, A History of Indian philosophy, Delhi: Motilal Banarasi Das, 1991, Vol II: 2.

তাই যদি হয়, তাহলে অত না ঘুরিয়ে সরাসরি 'ব্যবহারিক জ্ঞান' বলতে বাধা কী? বাধা আছে। পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের প্রভেদ অদ্বৈত দর্শনের মূলগত। সেই তত্ত্ব অনুযায়ী যা পারামর্থিক তাই ধ্রুব (absolute), আর যা ব্যবহারিক তা প্রয়োগ নির্ভর সাধারণ অভিজ্ঞতা। মায়াময় জগৎ প্রপঞ্চে আমাদের সব সাংসারিক উদ্যোগের ভিত্তি এই যে ব্যবহারকেই বলে অভিজ্ঞতা।[৪২] পূর্ব অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির স্বয়ং সিদ্ধতা এবং অস্তিত্বের সংহতিকে সন্দেহ করে লৌকিক জ্ঞান অভিজ্ঞতার 'আমি' ও 'না আমি'র প্রক্রিয়ার বিকাশের সাথে অখণ্ডিত। এই প্রক্রিয়ায় 'ভাষা' নির্মাণের প্রক্রিয়ায় বলা যেতে পারে সেখানে রামমোহন স্বতন্ত্রভাবে আধুনিকতার সন্ধানী।[৪৩]

রামমোহন রায় সন্ধান করেছিলেন এমন কোনো নৈব্যক্তিক ভিত্তির অনুপস্থিতি যা দিয়ে সত্যকে অসত্য থেকে পৃথক করা সম্ভব। রামমোহনের রচনায় লৌকিক জ্ঞান কেবলমাত্র ইংরেজি নামেই পরিচিত। ইংরেজি কেন? কারণ এটি ব্যবহৃত হয় ইংরেজি ভাষাভাষী শ্রোতাদের কাছে, ইংরেজি বক্তৃতায়। কিন্তু দয়া এবং বৃহত্তর পরিসরে অনুভূতি যদি তার কাছে এতই মূল্যবান, আর যদি সঠিক অর্থেই তাকে 'Common Sense' বলে অভিহিত করা যায়। তাহলে ১৮৩১ সালের আগেকার এতগুলি রচনায় তার অনুবাদ নেই কেন? রামমোহন নিজেই মাতৃভাষাকে দার্শনিক চিন্তার যোগ্য বাহনরূপে তৈরি করে নিয়েছিলেন। আর আধুনিক বাংলা গদ্যকে তার প্রথম পর্বে ভাষা অনুবাদের দ্বারা আরো সমৃদ্ধ ও প্রশস্ত করা তাঁরই কীর্তি। সেই উদ্ভবনা থেকে 'Common sence' বাদ পড়ল কেন?

---

[৪২] Dasgupta তদেব, Pp. 446-487.

[৪৩] Umberto Eco, Post modernism, Irony the Enjoyable; Modernism / post modernism, ed peter Brooker, Longman, 1992, Pp. 226.

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী আমার তা জানা নেই। তবে লোকশিক্ষার মান ও প্রয়োজন সম্পর্কে রামমোহনের সূক্ষ্ম সদাজাগ্রত বিচারবুদ্ধির কথা মনে রেখে অনুমান করা যেতে পারে যে হয়তো তাঁর মতে বাঙালি পাঠক তখনও পাশ্চাত্য চিন্তার সঙ্গে যথেষ্ঠ পরিচিত নয়। সুতরাং ধারণাটিকে কলমকাটা করে জবরদস্তি ভাষা-শরীরে না বসিয়ে প্রথমে অনুভূতির পলি ফেলে দেশবাসীর মানসিকতাকে আরও উর্বর করে নেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য।[৪৪]

রামমোহন মনে করতেন সংবেদন অথবা ইন্দ্রিয় চেতনার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যা পাই তা বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে না, মস্তিস্ক ও ভাষা দিয়ে আমরা যে তাদের ক্রমাগত বদলে নিতে পারি তবে বুদ্ধির বিচারে চলে যায়। সেখানে মৃত্যু, বাসনা, ভালবাসা, বিচার করা 'বুদ্ধির' এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। তাই লৌকিক বা 'Common Sense' দিয়েই সতীদাহের বিরুদ্ধে মানবজাতির কাছে আবেদন রাখতে হবে। ইংরেজিও 'Common sense' জটিল প্রতিশব্দ হতে পারত কিন্তু রামমোহন ইংরেজি সহজ শব্দও ব্যবহার করেছেন। বিচারটা আবেগের ও অনুভূতির তাই ভাষার দরকষাকষির দিকে তিনি স্ব-ইচ্ছায় যাননি। দর্শনের রীতি, প্রকরণ চায় ভাষার অমিতাচারের ওপর এক ধরণের শাসন। চায় অর্থের স্থিতিগতির এক ধ্রুবত্ব। তাই রোজকার ভাষার সন্ধান করেছিলেন রামমোহন।

৪.৩. অক্ষয়কুমার দত্ত

বাংলায় যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান বুদ্ধি চর্চার অগ্রজ পথিক অক্ষয় কুমার দত্ত উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণের একজন অবিসংবাদিত মনীষী ছিলেন। মৃত্যু সম্পর্কে অক্ষয় কুমার দত্ত

[৪৪] রণজিৎ গুহ, দয়া রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা, তালপাতা, ২০১০, পৃঃ ৪০।

অত্যন্ত মূল্যবান মতামত রেখে গেছেন। অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ বইয়ে ‘মৃত্যুর বিষয়’ অধ্যায়ে আলোচনা করছেন- “আঘাত-ক্লেশ, শারীরিক পীড়া, অবৈধ বিবাহ দ্বারা সাংসারিক দুঃখের উৎপত্তি ও ভৃত্যাদির দোষে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা এই সমুদায় বিষয়ের বিবরণ করিয়া এক্ষণে আর এক ভয়ানক ব্যাপারের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ইহার নাম শ্রবণ মাত্রে সকলেই কম্পমান হয়,- ইন্দ্রিয় সকল অবশ হয়, - লোকের আশা ভরসা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার নাম মৃত্যু।" লক্ষণীয় অক্ষয় কুমার দত্তের মৃত্যু ভাবনা বিজ্ঞানভিত্তিক। তিনি মনে করতেন না মৃত্যু কোন অলৌকিক ঘটনা বরং তার মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করলে জানা যায় মৃত্যু একটি বিজ্ঞানভিত্তিক জৈবিক প্রক্রিয়া। তিনি আরো লিখছেন “ভূমন্ডল মনুষ্যের নিবাস-ভূমি হইবার পূর্ব্বেও মৃত্যুর অধিকার-ভূমি ছিল, এবং তখনও যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ এক্ষণকার ন্যায় যথাক্রমে বর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হইত। জগদীশ্বর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংহারের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। কি কারণে এই প্রকার ব্যবস্থা করিলেন, তাহা সম্যক্ অনুধাবন করা আমাদের সাধ্য নহে; যে পরাৎ পর পরমপুরুষ অনন্ত কাল, অনন্ত বিশ্ব ও অনন্ত জীবের মঙ্গলামঙ্গল একেবারেই অবলোকন করিতেছেন, তিনি তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন, এবং জীবের কল্যাণার্থেই তাহার বিধান করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই....... জন্ম ও বৃদ্ধির বিধান থাকিলে মৃত্যুর নিয়ম না থাকা কোনক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয় না...... মৃত্যু-কালে ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাঁহাও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। নির্জীব জড় পদার্থ আহত বা ভগ্ন হইলে তাহার আর স্বত: প্রতিকারের উপায় নাই। যদি শরাব বা দর্পণ হস্ত হইতে পতিত হইয়া ভগ্ন হয়, তবে তাহা চিরকালই ভগ্নাবস্থায় থাকে, তাহার আর আপনা হইতে কখন প্রতীকার হইতে পারে না। কিন্তু প্রাণি ও উদ্ভিজ্জের স্বভাব সেরূপ নহে, তাহারদের ভগ্ন প্রতিকার ও ক্ষতি পূরণের সুন্দর উপায় আছে। কোন সতেজ বৃক্ষ প্রবল বায়ুবেগে পতিত

হইলে তাহার ভূমিস্থিত সমুদায় মূল তাহার জীবন রক্ষার্থে পূর্বাপেক্ষা অধিক তেজ ধারণ করে। কোন শাখাচ্ছেদ করিলে তৎ স্থানে নবপল্লব সকল উৎপন্ন হয়...... জগদীশ্বর কৃপা করিয়া এই পরম শুভ দায়ক শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং আমরা এই করুণার উপর নির্ভর করিয়া অহিতাচার না করি এই বিবেচনায় যাবতীয় কায়িক নিয়ম লঙ্ঘনে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন । এইহেতু, কোন ক্ষত বা আহত অঙ্গ প্রকৃতস্থ হইবার সময়েই ক্লেশের অনুভব হয়; সেই ক্লেশকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রত্যক্ষ ফল জানিয়া তাহা হইতে সম্যক্ সাবধান হওয়া উচিত।"[৪৫]

৪.৩.১. অক্ষয় কুমার দত্তের মহাপ্রয়াণ

অক্ষয়কুমার দত্ত শেষ জীবনে কঠিন শিরোরোগের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আদি ব্রহ্ম সমাজের সমবেত সহসা সেই যে তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, সেই কামমূর্চ্ছাই তাহার কারণ শিরঃপীড়ার সূচনা করিল। সে পড়িয়া আর আরোগ্যে হইল না। আরোগ্য হওয়া দূরে থাকে, তাহাতেই সেই প্রকৃতির নগ্ন প্রাণ সুদীর্ঘকাল সমযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে, নীরবে কাতর প্রাণে, মহাপ্রকৃতি মহা শক্তিরূপিণীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই কঠিন রোগ শয্যায় থাকিয়া ও সাহিত্যের নিরব স্পর্শযোগী "উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগ" পরিসমাপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন। সাহিত্যের এই নিষ্কাম কর্মযোগ, অক্ষয় কুমারের মহান জীবনের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। জানি না, তাহার জীবন-চরিত লেখকরা আমাদের এই কথাটা কিভাবে গ্রহণ করিবেন।

---

[৪৫] শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত, শকাব্দ ১৭৭৩, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৮।

অক্ষয় কুমার দত্তের মহাপ্রায়ণ হয়েছিল ২৮ শে মে ১৮৮৬ সালে রাত তিনটের সময়। তার মৃত্যুতে শোকাহত *সোমপ্রকাশ পত্রিকা* লিখেছিল "এমনই একটি অমূল্য রত্ন হারাইয়া আমরা সকলেই তাহার জন্য কাঁদিতেছি, বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহার শোকে ম্রিয়মান। আমরা প্রস্তাব করি, কলিকাতা সেনেট হাউসে অক্ষয় কুমার দত্তের একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করিবার জন্য দেশের লোক সযত্ন হউন।" অক্ষয় কুমার দত্তের এক অসহনীয় কষ্টকর শিরঃপীড়া প্রকট রূপ ধারণ করে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে। এই পীড়া নিরাময় হওয়া তো দূরের কথা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিরঃপীড়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করতে এবং 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও ব্রাহ্মসমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে বাধ্য হন। এমনকি এরপরে পরমহিতৈষী সুহৃদ বিদ্যাসাগরের সুপারিশে তিনি যে নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পদে বৃত হয়েছিলেন তাও শিরঃপীড়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। এই অবস্থায় অক্ষয়কুমারের নিজেরই উক্তি লক্ষণীয়- "পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই, দুর্জয় রোগপ্রভাবে চিরদিনের মত অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম । যে সময় মনোমতো কার্য-সাধনের কেবল উদ্যোগ পাইতেছিলাম, সেই সময় চিরজীবনের মতো লঘু গুরু সকল কর্ম্মেই অক্ষম হইলাম।"[৪৬]

মৃত্যুর দু-তিন মাস আগে তিনি তার মৃতদেহ সৎকার সম্পর্কে এক আপাত দুর্বোধ্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। সারদাচরণ মিত্র তাকে দেখতে গেলে অক্ষয় কুমার বলেছিলেন- "বাবা, তুমিতো উইল অনুসারে আমার সম্পত্তির পর্যালোচনা করিবে, কিন্তু আমার মৃতদেহ সম্বন্ধে একটি কথা আছে; আমার মৃত্যুসংবাদ পাইলেই তুমি এখানে আসিবে, যতক্ষণ তুমি না আসিবে, আমার সৎকার হইবে না। ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া সৎকারের আদেশ দিবে,

---

[৪৬] বিনায়ক চক্রবর্তী, প্রয়াণ কথা স্মরণ কথা, অক্ষয় কুমার দত্তের মৃত্যু: কিছু ভাবনা কিছু তথ্য, তথ্যসূত্র, ১৫ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১৪১৭, পৃঃ ৩০।

কিন্তু মৃত্যুর পর অন্তত ছয় ঘন্টা সৎকার হইবে না।"[৪৭] এই বক্তব্যটি থেকে অক্ষয় কুমারের বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্যুকে তিনি দৈহিক ক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক স্তর রূপে দেখেছেন। মৃত্যুর পরক্ষণে মৃতের দেহ পেশী গুলি শিথিল হতে থাকে। তার তিন থেকে ছয় ঘন্টা পরে আবার দেহ শক্ত হতে আরম্ভ করে যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হয় rigormortis এবং তাকেই বলা হয় sign of death। অন্তত ছয় ঘন্টা অপেক্ষা করে সৎকারের নির্দেশ দিয়ে অক্ষয় কুমার সম্ভবত এই sign of death সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার কথাই বলতে চেয়েছেন।[৪৮]

অক্ষয় কুমার বিয়োগের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তার জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন- "সত্যপ্রিয়তা গুণ যাঁহার শিরোভূষণ, সেই পুরুষ-সিংহের বিরহে দেশ-মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।" তাঁর মৃত্যুর তিনদিন পরে বালিতে বহু সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে একটি বিরাট স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়; এই সভায় বালিতে অক্ষয় কুমারের স্মৃতিফলক স্থাপনার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সমিতিও গঠিত হয়। এর সপ্তাহ দুয়েক পরে শোভাবাজার রাজবাড়ির নাট মন্দিরে তৎকালীন বাংলার দিকপাল ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক বৃহৎ স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবক্রমে স্থির হয়, অক্ষয় কুমার দত্তের পবিত্র নাম ও কীর্তি চিরদিন জাগরুক থাকার উপায় স্বরূপ স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপিত করা কর্তব্য।[৪৯]

৪.৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[৪৭] চক্রবর্তী, তদেব, পৃঃ ৩৩।

[৪৮] আশিস লাহিড়ী, অক্ষয় কুমার দত্ত: আধার রাতে একলা পথিক।

[৪৯] মহেন্দ্র নাথ রায় বিদ্যানিধি, বাবু অক্ষয় কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য আধ্যাত্মিক মুহূর্ত হিসেবে ভাবা যেতে পারে। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা তিনি দেখিয়েছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে পাশ্চাত্য চিন্তায় যেভাবে শরীর, মন ও মৃত্যু উঠে আসে বঙ্কিমের মানসকল্পে তা ভারতীয়ত্বের আদিচেতনার যে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের হাতেই বাংলা উপন্যাস পূর্ণতা ও সৌন্দর্য লাভ করেছে। তাঁর রচিত উপন্যাসে মৃত্যুকে কিভাবে বিবৃত করেছেন। মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর মানসলোকে যে ভাবনার বিভিন্ন প্রত্যয়গুলি বিচরণ করেছে তার অবয়বের ভাষাই বা কি, তা নিয়েও বিশেষ আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। বঙ্কিম রচিত উপন্যাস মূলত তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। অতীত তথা ইতিহাস সন্ধান, পরিবার ও সমাজ ধর্মে রূপায়ন এবং স্ব-সৃষ্ট তত্ত্বাদর্শে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তিনটি ধারায়। রাজমোহনস্ ওয়াইফে স্ত্রী হত্যার উদ্যোগ, মাতঙ্গিনীর গৃহত্যাগ, রাজমোহনের সঙ্গে ডাকাত সর্দারের যুদ্ধ, মথুরের আত্মহত্যা, দুর্গেশনন্দিনীতে ডুয়েল লড়াইয়ের দৃশ্য, কপালকুণ্ডলায় বলিদানের ভয়াবহ দৃশ্য, কৃষ্ণকান্তের উইলে আত্মহত্যার চেষ্টা ও নারী হত্যার ঘটনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বঙ্কিমের মৃত্যুভাবনা যে বরাবরই একটি প্রধান বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে তা লক্ষ্য করা যায়।

৪.৪.১ মহাপ্রয়াণের পথে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমের কর্মক্ষেত্র থেকে অবসরের পর পরেই সান্ধ্য ভ্রমণের সুঅভ্যাসটা তাঁকে যেন নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। ঘড়ির কাঁটা যখন সূর্যের অস্তগমনের সময়টাকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে, জানালা দিয়ে ঘরে আসা আলো ক্রমশ ম্লান হতে শুরু করে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনটা যেন অনুত্তেজক পুলকে শিহরিত হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ছেলেবেলা

থেকেই মিষ্টিদ্রব্য ভীষণভাবে আকর্ষণ করত। আর তার পরবর্তী ফল হিসাবে বহুমূত্র রোগে তিনি আক্রান্ত হন। এই ব্যাধি তাঁকে ক্রমে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। কিছু নিয়ম মেনে চলে আর খাদ্যাভ্যাসের কিছুটা পরিবর্তন করে যে ভালো থাকা যায় সেটাই তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ছে না। মাঝে মাঝে শুধু একটা দুশ্চিন্তা, একটা মুহূর্তের মৃত্যুরেখা মস্তিষ্কে ঝটকা দিয়ে চলে যাচ্ছে না এমন নয়। তবে তাঁকে তিনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন না।[৫০]

৪.৫. কেশব চন্দ্র সেন

উনিশ শতকের ইতিহাসে সমাজ সংস্কার আন্দোলন যেমন নতুন নতুন চিন্তার ক্ষেত্র খুলে দিতে সাহায্য করেছিল, তেমনই আবার যাঁরা সমাজ সংস্কারক ছিলেন তাঁদের সমাজ সংস্কার করার যে মানসিক পটভূমি তা যেমন ঐতিহাসিকদের কাছে আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে, আবার এই মানসিক পটভুমি আলোচনা করার ক্ষেত্রে কিছু দার্শনিক বিষয় ঐতিহাসিকদের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য বা বোধগম্য হয়ে ওঠে না কেন? এটিও একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে। যেমন মৃত্যুচর্চা, পরলোক তত্ত্ব, আত্মার অনুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়গুলি ঐতিহাসিকদের কাছে সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে - মৃত্যু ও তার পরবর্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি যেভাবে প্রতিফলিত ও আলোচিত হয়েছে, মূল শ্রেণীর ইতিহাসে এই বিষয়গুলি ততটা প্রাধান্য পায় না। যেমন হুতুমের নক্সায় প্রেতচর্চাকে বুজরুকি বলে গাল পেড়েছিলেন কালিপ্রসন্ন সিংহ। আবার, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাস, এঁদের কাছে পরলোকচর্চা রীতিমত আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। আলিপুর মামলা নিয়ে কিছু আলোচনার জন্য ব্রাহ্ম

[৫০] শুভাশিস চক্রবর্তী, 'অস্তাচলে বঙ্কিমচন্দ্র', সুব্রত রায়চৌধুরী (সম্পা.), *প্রয়াণকথা স্মরণকথা*, কলকাতাঃ তথ্যসূত্র, পৃ. ৬৪-৬৫

বান্ধবের আত্মাকে ডেকে আনলেন দেশবন্ধু। আত্মা পেন্সিল দিয়ে বারবার লিখে দিল 'ইউ মাস্ট ডিফেন্ড অরবিন্দ'।[৫১] ১৯২৭ এ প্রকাশিত হয়েছিল কেশব চন্দ্র সেনের বই পরলোকের সন্ধানে। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় সংস্কার আন্দোলনগুলির যে দার্শনিকতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তাঁরই উত্তর সাধক হলেন কেশব চন্দ্র সেন। রামমোহন রায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন করতে গিয়ে 'কমন সেন্স' বা 'সাধারন জ্ঞান' এর উপর অধিক জোর দিয়েছিলেন এবং তার পশ্চাতে ছিল এক গভীর বাসনা, যা মূলত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। শাস্ত্রীয় যুক্তি কাঠামোর উপর স্থান পেয়েছিল করুণা, দয়া, মায়া ও সমূহের প্রতি শোক জ্ঞাপন । কেশব চন্দ্র সেনও পুরোপুরি রামমোহনীয় চিন্তার অনুকরণ না করলেও তাঁর সমাজ সংস্কারক চিন্তার ভিত্তির যে দার্শনিকতা সেখানে তিনিও 'কমন সেন্স' এর উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু তার সাথে যুক্ত হয়েছে কঠোরভাবে ব্রাহ্মসমাজের নিয়মগুলি মেনে চলা। তিনি দার্শনিক ছিলেন না, বরং দার্শনিক অপেক্ষা উচ্চতর আসন পরিগ্রহ করেছিলেন। দার্শনিকেরা মস্তিস্কগত চিন্তা বিধিবদ্ধ রূপে লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াসী, কিন্তু কেশব চন্দ্র সেন দার্শনিক চিন্তা ও ভাবনা নিজের জীবনেই সাধন করেছিলেন।[৫২] তিনি দর্শন ও ধর্মের মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে ভালবাসতেন। তিনি শুধুমাত্র উপাসনার মাধ্যমেই ঈশ্বর লাভ করার পথে না গিয়ে, কর্তব্য ও ধর্মের মাধ্যমে পরম ব্রহ্ম - এর উপলব্ধি করা সম্ভব বলে মনে করতেন। মহামানব শ্রী চৈতন্য, কেশব চন্দ্র সেনের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। কেশব চন্দ্র সেনের চিন্তার চারটি প্রণালি লক্ষ করা যায়। ১। চিন্তাশীলতা অথবা জ্ঞান, ২। কার্যশীলতা

---

[৫১] প্রেত বৈঠক, আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয়, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

[৫২] পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ডি, এস, সি, কর্ত্তৃক কলিকাতা তত্ত্ববিদ্যা সভাতে পঠিত, কেশব চন্দ্র সেন মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মমত, ইষ্টবেঙ্গল প্রেস, ঢাকা, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২।

অথবা কর্ম, ৩। ভক্তি এবং ৪। যোগ।[৫৩] দার্শনিকতার এই ক্রমবিকাশ নিয়ম কেশব চন্দ্র সেনের জীবনে প্রকাশিত হয়েছিল। কেশব চন্দ্র সেনের একটি বিশেষত্ব সামঞ্জস্য হল তিনি একটি ছেড়ে অন্যটি ধরেছেন, পরে সেটিও ছেড়েছেন এমন নয়। তিনি জ্ঞান ছেড়ে কর্মী হননি অথবা কর্ম ছেড়ে ভক্ত হননি। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ তাঁর জীবনে যথারূপ স্থান লাভ করেছিল। এই সামঞ্জস্য ও সম্মেলন ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে এক নতুন ব্যাপার ছিল। কেশব চন্দ্র সেনের ধর্ম জীবনের আর একটি মহৎ ব্যাপার হল, তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও স্বদেশ ভাবনার মধ্যে এক সেতুবন্ধ স্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রধানত ভাব প্রধান মানুষ ছিলেন, আর এই ভাবুকতা তাঁর জীবনে ক্ষতিও করেছিল, তা বলে তিনি সভ্য মানুষের ভাববাদী দর্শনকে পরিত্যাগ করেননি। ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমনকে তিনি বিধাতার বিধান বলে মনে করতেন। তিনি কেবল সভ্যতার মধ্যে সংস্থাপনের বীজ বপন করতেই ব্যস্ত ছিলেন না, বরং তাকে কিভাবে আধুনিক ভাবে মানুষের চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করানো যায় তা নিয়ে তাঁর নিরলস পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি এই দুই সভ্যতার ভাবের আদান প্রদানের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করেন নি, তার প্রমাণ তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'Jesus Christ' ইউরোপে এবং এশিয়ায় প্রকাশ পেয়েছিল।[৫৪]

৪.৫.১. কেশব চন্দ্র সেনের মৃত্যু ভাবনা

রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধের মাধ্যমে শুধুমাত্র একটি কুসংস্কারকে রোধ করেননি, বরং ভারতবর্ষের আধুনিকতার জন্য যে উপকরণগুলি প্রয়োজন সেই যাত্রা পথের সূচনা

---

[৫৩] চট্টোপাধ্যায় তদেব, পৃঃ ৪।

[৫৪] চট্টোপাধ্যায় তদেব, পৃঃ ৬-৯।

করেছিলেন। আমরা জানি পনেরো শতকে ইউরোপে নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য হল শুধুমাত্র অবাধ বাণিজ্য, কিছু আবিষ্কার বা কিছু নতুনত্বের ধারণার জন্ম দেওয়া নয়, বরং এই সমস্ত কিছুর পশ্চাতে মানুষের কল্যাণ কিভাবে করা সম্ভব তা মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠা, যা সামন্ত তান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তত ইউরোপে সম্ভব হয়নি। একবিংশ শতকে রামমোহনের সতিদাহ প্রথার রদ যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠন করানো হয়, তখন রামমোহন রায়কে একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে-ই দেখান হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য নামী দামি ঐতিহাসিকরাও এই বয়ানের বাইরে যেতে চাননি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন ইতিহাস চর্চার খোলনলচে বদলাতে শুরু করল এবং বিশ্বায়নের পর ভারতবর্ষেরও সমাজ সংস্কারক আন্দোলনগুলিকে নতুন ভাবে ভাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, তখন ভাষাদর্শন, ধর্মতত্ত্ব, উত্তরাধুনিকতা, উত্তরসত্য যুগে উনিশ শতকের মনিষীদের যে সমাজ সংস্কারের বাসনা, তার অন্তর্নিহিত মানসিক চেতনকে খণ্ড বিখন্ড করে দেখার তাগিদ আবার করে প্রয়োজন হয়ে উঠল। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় - সতের থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত আলোড়নকারী মনীষীদের লেখায় মৃত্যু একটি বিষয় হয়ে উঠেছিল, তার কারণগুলি পরে আলোচনা করা হবে, কিন্তু আমরা এখানে মূলত মনীষীদের মৃত্যু সংক্রান্ত লেখাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। পরবর্তীকালে তাঁদের নিজস্ব মৃত্যুর বর্ণনাগুলি আলোচনা করব, যাতে মৃত্যু ভাবনার চক্রবৃত্তান্ত পূর্ণ হয়।

কেশব চন্দ্রের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা রচনায় তিনি আলোচনা করছেন, "প্রধান বিচারপতি নরম্যান সাহেবের মৃত্যু ঘটনা হইতে আমরা কি উপদেশ লাভ করিতে পারি? মহাত্মা নরম্যানের হত্যাকান্ডের ন্যায় আশ্চর্য্য ঘটনা আমরা কখনও দেখি নাই। ভারতবর্ষের মান্যবর বিচারালয়ের সর্বোচ্চ বিচারপতি দিবা দুইপ্রহরের সময় বিচারাসনে উপবেশন করিবার জন্য বিচার মন্দিরে পদক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় একজন সামান্য লোকের হস্তে অসহায় হইয়া তাঁহাকে প্রাণদান করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি হইতে

পারে?..............এখন বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, আমরা এই অদ্ভুত ঘটনা হইতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে কি উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়াছি? জীবনের অনিত্যতা ও বৈরাগ্য সাধারনতঃ অনেকের মনে উদয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা আপনাদিগের মধ্যে বন্ধু বান্ধবদিগের মৃত্যু ঘটনাতে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর রূপে হৃদয়কে অভিভূত করিয়া থাকে। করিয়া কি হইবে, তাঁহা যে শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়, সংসারের পাঁচ কাজে পড়িয়া আবার সকলই সহজে ভুলিয়া যাওয়া যায়। যত দিন ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ না হয়, ততদিন বৈরাগ্যের ভাব কোন ফলদায়ক হয়না। বিচারপতির মৃত্যু হইতে আমরা দুইটী বিশেষ উপদেশ পাইতে পারি। প্রথম, আমরা যখন মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা কল্পনাতেও আনতে পারিনা, তখনও মৃত্যু অকস্মাৎ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, দ্বিতিয়তঃ মৃত্যুর জন্য এখনই প্রস্তুত থাকা আবশ্যক নতুবা অপ্রস্তুত অবস্থায় মরিতে হইবে”।[৫৫]

মৃত্যু নিয়ে কেশব চন্দ্র সেন অবিরত ভাবনা চিন্তা করে গেছেন। মৃত্যুর কারণ কি? মৃত্যুর জন্য কিভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে তাও তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। ‘প্রার্থনা’ গ্রন্থে ‘রোগে শান্ত ভাব’ অধ্যায়ে তিনি বলছেন “হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমসুন্দর, শাস্ত্র বুঝাইয়া দাও; কেন না, প্রায় আমরা সকলেই কোন না কোন প্রকার অসুস্থতায় দিন কাটাই.... রোগ কি মানুষের এতই শত্রু? তবে ধার্ম্মিকের কে রোগ হইবে কেন? হে দীনবন্ধু, আমাদের কাছে রোগ এলো কেন? আমরা যে তোমায় ডাকি, তোমার পুজো করি রোজ রোজ, তোমার পা ছুঁই রোজ, আমাদের কাছে রোগ এলো কেন? রোগকে শত্রু না বললেই বোঝা যায়। রোগ যে আত্মার মিত্র। রোগ হইলে মানুষ শান্ত নরম হয় ব্যবহার মধুময় হয়, তোমার প্রতি আত্মসমর্পণ অধিব হয়, যোগের প্রতি অনুরাগ হয়, ধর্ম্মজগতের সব লুকানো ছবি বাহির হইয়া পড়ে...... রোগ বড়, না হরি

৫৫. নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন, সঙ্গত, প্রথম সংস্করণ, ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী, ১৮৩৮ শক – ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১১৫- ১১৬।

বড়? সরল অন্তরে যেন বলিতে পারি হরি বড়। যেন অবসন্ন না হই.......এই কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তাবৎ রোগ শোক দুঃখ কষ্টের মধ্যে শান্ত ও শুদ্ধ থাকিতে পারি।”[৫৬]

অভূতপূর্বভাবে কেশবচন্দ্র সেনের উনিশ শতকীয় সামাজিক ধর্মীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তার এই প্রবন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র মৃত্যু চিন্তা নয়, মৃত্যুর কারণ হিসেবে রোগ কিভাবে মৃত্যুকে আহ্বান করে তা কেশবচন্দ্র সেনকে ভাবিয়েছিল। রোগের উপলক্ষে মৃত্যুর যে অনিবার্যতা তা থেকে কেশব চন্দ্র সেন উত্তরণের পথ খুঁজছিলেন, যা উনিশ শতকে ধর্মীয় চিন্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪.৫.২. কেশবচন্দ্র সেন এর প্রয়াণ

কেশবচন্দ্র সেনের শেষের দিনগুলিতে খ্রিস্টান সমাজের দলপতি কলকাতার বিশপ, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে দেখতে আসতেন। সবার সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক আলাপ-আলোচনা চলত। ৮ই জানুয়ারি ১৮৮৪ সালে কেশবচন্দ্র দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর পর মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত এইভাবে ব্যক্ত করেছেন- “কেশব বাবু দেহ রক্ষা করিলে পর যখন সমারোহ করিয়া তাহার শব লইয়া যাওয়া হইতেছিল। তখন আমরা সকলে ‘ব্রহ্মকৃপাহী কেবলম’ উচ্চারণ করিতে করিতে সাধারণ সমাজ এর সম্মুখে কৌচ নামাইলাম। একখানি কৌচে কেশববাবুর দেহ রাখা হইয়াছিল। শীতকাল, এই জন্য গায়ে একখানি সাদা আলোয়ান দেওয়া হইয়াছিল। মুখ অনাবৃত ছিল। ঠিক যেন নিদ্রা যাইতেছেন- স্থির প্রশান্ত

---

[৫৬] কেশবচন্দ্র সেন, দৈনিক প্রার্থনা, প্রথমভাগ, রোগে শান্ত ভাব, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭।

বদন কোনো বিকৃত ভাব নাই, কেবল চোখে চশমা ছিল না। সাধারণ অবস্থা হইতে এই যা তফাৎ। তাহার পর লোক বাড়িতে লাগিল। আমরা শব লইয়া ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বেথুন কলেজের পাশ দিয়া বিডন স্ট্রীট হইয়া বিডন গার্ডেন-এর কাছে যাইলাম। বেলা তখন সাড়ে তিনটা কি চারটে হইবে। লোকসংখ্যা ও গাড়ির সংখ্যা আরো অধিক হইল। আমি নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) কিন্তু বরাবর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল এবং শবদাহ শেষ হইলে রাত্রিতে ফিরিয়াছিল।”[৫৭]

৪.৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু চিন্তা

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চিন্তা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যেটি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন তা হলো রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যু ঠিক কিভাবে বিষয় হিসেবে ও চেতনা হিসেবে স্থান অধিকার করে আছে। বাঙালি জীবনে মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ভাবনা এসে পড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবনে সবচেয়ে বড় জীবনশিল্পী হিসেবে গণ্য হয়ে আছেন। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথই বোধহয় সবচেয়ে বড় মৃত্যুশিল্পী। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চিন্তা আলোচনা করতে গিয়ে কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সরাসরি মৃত্যু সম্পর্কে বিশদ প্রবন্ধ, কবিতা গান রচনা

[৫৭] ধীরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত মহেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত “শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান”, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৯৬ পৃষ্ঠা ৭৩।

করে গেছেন। যার ফলে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চিন্তা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেরই প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি করে মৃত্যু চিন্তা আলোচনা করা হয় । মৃত্যুমুখীনতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রবাহিনী অন্তর গুঢ় এক গভীর নির্লিপ্ত যা তাঁকে প্রানিত করেছে সমাহিত প্রশান্তির সঙ্গে মৃত্যু উপলব্ধিতে। লক্ষনীয় যে সেই 'শ্যামসমান' মরণ বা মৃত্যু যখন তাঁর জীবনের দুয়ারে এসেছে অন্তিম পরিণতির হাতছানি নিয়ে, তখনো তিনি বিচলিত হননি; বিপ্রতিপভাবে উপনিষদিক ভাব- ভাবিত কবি তন্নিষ্ঠ মগ্নতায় জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি রূপে মৃত্যুকে গ্রহণ করে দিন অবসানে ফুলের ঝরে পড়ার মতোই পঞ্চভূতে বিলয় খুঁজেছেন পরবর্তী পর্বের সূচনা রূপে, যার প্রতিধ্বনি শুনি কবি কণ্ঠে-

"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।"

মৃত্যু নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা শুরু কিশোর বয়সেই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের' পদাবলী সময় থেকে। তখনও পর্যন্ত তাঁর মনে মৃত্যু কোন তত্ত্ব হিসেবে জেগে ওঠেনি। বরং বলা যায়, আবেগের বশে তিনি লিখে ফেলেছিলেন 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' । কিন্তু পরক্ষণেই তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মৃত্যুর ভয়ংকর এবং বীভৎস রূপটিই ফুটে উঠেছে,

"মেঘববরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধরপুত।"

কিন্তু মৃত্যু কখনো শ্যাম সমান হয় না। কারণ জীবন কখনো মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করে না। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের কবিতাগুলোকে ছেলেমানুষী আখ্যা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়স থেকেই মৃত্যুকে একটু দূরত্ব থেকে দেখতে চাইছিলেন সেই দূরত্ব তাঁর চৈতন্য কালীকতার দূরত্ব ও একইসঙ্গে পরমবোধের সঙ্গে যে আমি'র দূরত্ব তার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ তাঁর যৌবনকালে চেতনা স্তরে উন্মোচিত হচ্ছিল। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে রবীন্দ্রনাথের

মৃত্যুবোধকে তাঁর বয়সের সঙ্গে বিচার করলে ভুল হবে বা তাঁর জীবনের মৃত্যু, শোক, যন্ত্রণা দিয়ে বিচার করলেও ভুল হবে। আসলে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চিন্তা কোনরকমভাবেই সম্পূর্ণ বিনাশ চিন্তা নয়; মৃত্যু চিন্তা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির এক ধরণের অবলম্বন, যা তাঁকে বারে বারে আশ্বস্ত করে তাঁর জীবনকে নির্দেশিত করার জন্য। সাধারণ জীবনে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মৃত্যু চিন্তা বা মৃত্যু সম্পর্কে গভীরতা বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে বলেই মনে করা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, অল্প বয়স থেকেই মৃত্যু সম্পর্কে তার অত্যন্ত সংবেদনশীল এক ধরনের মন লক্ষ্য করা যায় যা গভীরতা অর্থে বুঝলে ভুল হবে বরং মৃত্যু কে জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সাথে সম্প্রসারিত বহমান বোধই তিনি জাগিয়ে রেখেছেন অতলে নিঃশেষিত হওয়ার বদলে। কবির পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী নির্বাণ বইয়ে জীবনের অন্তিম পর্বে কবির এই আত্মবিলোপী, জীবজগতের পক্ষে স্বাভাবিক অবসানকামী মানসিকতার উল্লেখ করেছেন- “বাবা মশায়ের মনে মনে তার অবসানের একটি কাল্পনিক ছবি গড়ে উঠেছিল, সেই ভাবের কথাও তিনি বলতেন। যেমন করে ফুলপাতা খসে পড়ে, বৃদ্ধ গাছটি যেমন করে ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসে তিনি ভেবেছিলেন তেমনি করে একদিন প্রকৃতির কোলে ঝ'রে পড়বে। সেই হোক কবির যথার্থ স্বাভাবিক অবসান।[৫৮]

১৩৪৭ এর ৬ই মাঘ তারিখে লেখা একটি কবিতায় এই ‘স্বাভাবিক অবসানের’ জন্য কবির পক্ষপাত ধ্বনিত হয়েছে-

“আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি আপনারে দিতেছে
বিস্তারি আমার সকল কিছু মাঝে।”[৫৯]

---

[৫৮] প্রতিমা দেবী, নির্বাণ, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পৃষ্ঠা ৫৮।

[৫৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জন্মদিনে, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খন্ড, ১২ সংখ্যক কবিতা, ১৩৩৮, পৃষ্ঠা ৮১- ৮২।

জীবনের উপান্তিম ও অন্তিম পর্বে গুরুতর অসুস্থতা তথা প্রায় অচৈতন্য অবস্থার মধ্যেও মর্ত্যমৃত্তিকায় লীন হতে চেয়েছেন কবি শেষ পরিণতি রূপে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চিন্তা শুধুমাত্র কোন একক এক মনীষীর মৃত্যু চিন্তা নয়, তার শেষ যাত্রার বিবরণ তাঁরই মৃত্যু চিন্তারই প্রতিফলন বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু যাত্রার বর্ণনা শুধুমাত্র কিছু তথ্যের বর্ণনা দিলে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। তার ইতিহাস দর্শন, সংগীতচিন্তা, কবিতা, চিত্রভাবনা প্রভৃতি দার্শনিক প্রত্যয়গুলির মধ্যে দিয়েও তাঁর মৃত্যু ভাবনাকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক মহুয়া সরকার তাঁর প্রবন্ধ, 'উনিশ শতকের গানের ভুবন রবীন্দ্রনাথ: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' দেখিয়েছেন সংগীত চিন্তার মধ্যে কিভাবে তাঁর মৃত্যু ভাবনা ও ইতিহাস দর্শন ভাবনা একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ধ্রুপদী ইতিহাসের কাঠামোর বাইরে গিয়ে বর্তমানে ইতিহাসকাররা ঋতুর ইতিহাস, জলবায়ুর ইতিহাস, পরিবেশের ইতিহাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের দর্শনও 'Supernatural cross cultural' এবং 'Universal' - যেখানে বিশ্বের মানুষ ও প্রকৃতকে তিনি শব্দে ও সুরে মিলিয়ে দিয়েছেন। কবি তাঁর 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধে দিনের শেষ ও রাত্রির সুরকে একই সুরে গেঁথেছেন তেমনি সন্ধিপ্রকাশ রাগ, পূরবী, কাফি, ইমনের কথা দিয়ে তিনি নিয়ে আসছেন প্রেম, প্রকৃতি, বিরহ - সকল চেতনার উর্ধ্বে গিয়ে এক নিত্যময়তার আর্তি, যা সন্ধিপ্রকাশের জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের সুর। এখানে বিশেষভাবে কাফি রাগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কাফি রাগ সাধারণভাবে বিদায়ের সুর ধরে, সেখানে বিরহ অবশ্যই আছে, তবে অবসানের আশঙ্কা নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুর বাঁধবার গুনে কাফিতে আনেন করুণার আর্তি- যেখানে জন্ম মৃত্যু একই সুরে বাঁধা।

"শেষ বেলাকার শেষের গানে
ভোরের বেলার বেদনা আনে।

তরুণ মুখের করুণ হাসি গোধূলি আলোয় উঠেছে ভাসি
প্রথম ব্যাথার প্রথম বাঁশি বাজে দিগন্তে কি সন্ধানে।”[৬০]

প্রকৃতির জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে অনির্বচনীয় ঘটনা লক্ষ্য করা যায় সঞ্চারিতে।

“আজি দিনান্তে মেঘের মায়া
সে আঁখিপাতার ফেলেছে ছায়া।”

তারপরে, দিন ও রাত্রির, জীবন ও মৃত্যুর সেই চলমানতা -

“খেলায় খেলায় যে কথাখানি
চোখে চোখে যেত বিজলী হানি
সেই প্রভাতে প্রথম বাণী -
চলেছে রাতের স্বপন পানে।”

ইমন কল্যাণে কবির গান – “এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি –” জীবন ও মৃত্যুর আলো - অন্ধকার মিশে যায় এই গানে।[৬১]

---

[৬০] মহুয়া সরকার, রবীন্দ্র বীক্ষা, উনিশ শতকের গানের ভুবন ও রবীন্দ্রনাথ: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, সংকলন ৫৪, ১৪২০ ২২ শ্রাবণ, পৃঃ ৮০-৮১।

[৬১] মহুয়া সরকার, রবীন্দ্র বীক্ষা, উনিশ শতকের গানের ভুবন ও রবীন্দ্রনাথ: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, সংকলন ৫৪, ১৪২০ ২২ শ্রাবণ, পৃঃ ৮০-৮১।

মৃত্যু গুহা থেকে জীবনলোকে প্রত্যাবর্তনের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে কবি নববর্ষ প্রবন্ধে অপূর্ণ থেকে পূর্নের যাত্রাপথে সঞ্চারমান মৃত্যু- অতিত মহাসত্তার উল্লেখ করেছেন -

"..... আমার নিজের কাছে আমার প্রশ্ন, এই জীবনে এই যে রিক্ততার পর্ব নিয়ে এসেছি এ কি একটা নতুন পূর্ণতার ভূমিকা?... বোঁটার বাঁধন থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নব পর্যায়ে তাদের বন্ধন মোচন হয়। তেমনি দেহতন্ত্রে প্রাণের আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা বলেই জানব।... পশুর মরা তার স্বভাব ধর্ম, তার বেশি তার কিছু নেই; মানুষ যখন পশুর সামিল হয়ে দাঁড়ায়, তখনই মৃত্যুতে তার মহতি বিনষ্টি। আমরা সেই জীবন ধর্মকে বরণ করবো যা মরে না, মানুষের আত্মার ধর্ম- যেখানে ন জড়া ন মৃত্যুন শোকঃ।"[৬২] অর্থাৎ অজর, অমরণ ও অশোক এক অস্তিত্বে উত্তরণের চিন্তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ –

"মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচিন্তার মধ্যেই জীবনদেবতা কে আবিষ্কার করাও তাঁর এক অসীম জীবনবোধকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে জীবনের অপর নাম আখ্যা দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়াতীত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার আলোকেও তা স্পষ্ট। মৃত্যুকে তিনি অনন্ত জীবনের যাত্রাপথে পরম বন্ধুর মতো নতুন জীবন পথের অনুসন্ধানদাতা হিসেবে উপলব্ধি করেছেন। কবি জীবনস্মৃতিতে 'মৃত্যু শোক' পর্যায়ে অকপটে লিখেছেন, "জগতকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্ব প্রয়োজন, মৃত্যু দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকায় ওপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।" ১৯০৪ সালে 'বঙ্গভাষার লেখক' বইয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপরিচয়

[৬২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নববর্ষ, প্রবাসী, ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৭৭- ৭৮।

রচনা করলেন, সেখানে জীবনদেবতা সম্বন্ধে তিনি বললেন, "আমি জানি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃতি অবস্থার মধ্যে দিয়ে তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন। সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্ব ধারায় বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেই জন্য এই জগতের তরুলতা- পশু পক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি। সেই জন্য এত বড় রহস্যময় প্রকাণ্ড জগতকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।"[৬৩]

বিশ্বের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কবির অস্তিত্ব ধারার এই বৃহৎ স্মৃতিকে বলা যায় কবির ঐতিহাসিক স্মৃতি বা জন্মান্তর স্মৃতি। জীবনদেবতা থেকে অবলম্বন করেই এই ঐতিহাসিক বা জন্মান্তর স্মৃতি কবির সজ্ঞান মনের অগোচরে কবির মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে। জীবনদেবতার এই যেমন একটি বিশেষ আবির্ভাব কবির আত্মগত, তেমনিই জীবনদেবতার আরেকটি নির্বিশেষ আবির্ভাবও আছে যাকে বলা যায় সর্বজনগত। 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতা মালায় রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'সর্বমানুষের জীবনদেবতা'। ঐতিহাসিক রজতকান্ত রায় 'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ: জীবন দেবতার জীবনী' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন "সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনদেবতা নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু গুরুদেবের জীবনচরিত বা ধর্মীয় ইতিহাসের দিক থেকে তেমন আলোচনা হয়নি।" ঐতিহাসিক রজতকান্ত রায়ের মতে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সরাসরি জীবনদেবতা নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা রজতকান্ত রায় তাঁর উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। "গুরুদেব প্রসঙ্গটি প্রথম উত্থাপন করেন এদেশে নয়, বিলেতে বা পাশ্চাত্য নয়। চীনে প্রথম এই আধ্যাত্মিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন গুরুদেব। আবার পুনরায় ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচারস দিতে গিয়ে সামান্য

[৬৩] রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত জন্মবার্ষিকী সংস্করণ, ১৯৬২, পৃঃ ৬৩।

বিস্তৃত আকারে উল্লেখ করেন, কারণ বিষয় ছিল ‘রিলিজিয়ান অফ ম্যান’ অর্থাৎ তাঁর নিজের ধর্মমত ও আধ্যাত্মিকতা বোধ। মানে, জীবনদেবতার আবির্ভাব কথা। পরে দেশে ফিরে বক্তৃতাটি বাংলা প্রবন্ধ আকারে রূপান্তর করেন, ‘মানুষের ধর্ম’, এই শিরোনামে। তাতে আরও দু' একটি বেশি আকার ও ইঙ্গিত ছিল। এর প্রকাশকাল ১৯৩৩, তখন গুরুদেবের বয়স ৭২। মানুষের ধর্মের আবরণ ভেদ করে জীবনদেবতার জন্ম রহস্য বের করবে ও নিন্দায় মুখর হবে, এমন আর কেউ নেই। বাহাত্তুরে বুড়ো পার হয়ে গেলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের জীবনীকারদের হাতেও সহজে খুঁজে পাওয়ার চাবিটি ধরিয়ে দিয়ে গেলেন না।”[৬৪] উপনিষদ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মধর্ম পেয়েছিলেন, নতুন বৌঠানের ভয়ংকর আত্মহত্যার পর নতুন করে রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতাকে সন্ধান করেছিলেন। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। কবি অনুভব করলেন দুঃখ ছাড়া আনন্দ হয় না, মৃত্যু বাদ দিলে জীবন থাকে না। আসলে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ যেন একটি চিন্তা জগতের সম্পূর্ণতার অবয়ব। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণের মধ্যে দিয়ে আসলে মৃত্যুকে বুঝতে চাইছেন অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, করুণার মধ্যে দিয়ে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনকেই মৃত্যুর সম্মুখে বার বার দাঁড় করিয়ে বুঝতে চাইছেন উত্তরণ বা জীবনী শক্তি প্রকৃতপক্ষে ঊর্ধ্বমুখী না অন্তরমুখী। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চিন্তা বুঝতে গেলে শুধুমাত্র তার জীবনী শক্তি বা মৃত্যু থেকে কিভাবে উত্তরণ করলেন এই প্রকল্পে আধুনিক সময় রবীন্দ্রনাথকে বোঝা সবসময় সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাকে বুঝতে হবে তাহলেই তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক ধারণাটি অনুধাবন করা যাবে। আরেকটি বিষয় এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত ভাবনার মধ্যেও তাঁর জীবন-দেবতা ও মৃত্যু কিভাবে জীবনের ‘মানে’ কে নির্ণয় করে তাঁর উন্মোচনহীন ভাব, স্মৃতি, সুর ও কালের মধ্যে অন্তর্নিহিত করে গেছেন

[৬৪] রজতকান্ত রায়, প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ: জীবনদেবতার জীবনী, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১২, পৃঃ ৭-৮।

যা উন্মোচন করার মাধ্যম একমাত্র অনুভূতি বা আধ্যাত্মিকতা। রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনার মধ্যেও এক ধরনের স্মৃতির খেলা আছে। স্মৃতির সঙ্গে মৃত্যুর কি সম্পর্ক? মৃত্যুর সাথে ভাষার কি সম্পর্ক? আবার স্মৃতি বিস্মৃতি অন্তর দ্বন্দ্বের মধ্যেই এক ধরনের আন্তরিক মৃত্যুবোধ প্রকাশ পায়। এই স্মৃতি কে অতিক্রম করার মধ্য দিয়েই তাঁর মৃত্যু ভাবনা শুধুমাত্র কোন ভীতিকর ঘটনা হয়ে থাকে না বরং তা এক বৃহৎ বা ইউনিভার্সাল নলেজ এর দিকে যাত্রা করে। ইমানুয়েল কান্টকে অনুসরণ করে বলা যায় অনুভূতির তৃপ্তি বা অতৃপ্তি কখনোই অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ নয় বরং জানা বা জ্ঞান বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় তা অভিজ্ঞতার অনুভূতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[৬৫] আসলে মৃত্যু কি জীবনের শেকল ভেঙে ফেলে এই প্রশ্নটিই যেমন রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছে তেমনি বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক নীৎশেকেও ভাবিয়েছে। দার্শনিক হাইডেগার নীৎশের 'আত্মকথা' থেকে উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন, "এইভাবে, যা কিছু মানুষকে জড়িয়ে থাকে সে তাকে ছাড়িয়ে যায়। তার শেকল ভাঙ্গার কোন প্রয়োজন নেই, তারা অপ্রত্যাশিতভাবেই খসে পড়ে, যখন ঈশ্বর ইচ্ছা করেন; তাহলে সেই বেষ্টনী কোথায়? যা তাকে তবুও শেষ অবধি বেড় দিয়ে রাখবে। তা কি এই জগত? তাকি ঈশ্বর।"[৬৬]

৪.৭. স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু চিন্তা

[৬৫] Kant, Critiq of judgment, sixth chapter.

[৬৬] Martin Heidegger, What is called thinking? অনুবাদক এফ. ডি. উইক ও জে. জি. গ্রে, নিউইয়র্ক: হার্পার অ্যান্ড রো, ১৯৬৮, পৃঃ ৭২।

স্বামীজীর মৃত্যু চিন্তা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই সিস্টার নিবেদিতার ‘স্বামীজিকে যে রূপ দেখিয়াছি’ গ্রন্থটি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এছাড়াও দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের স্বামীজীর মৃত্যুভাবনা সম্পর্কিত যে কথোপকথন তাও ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। উনিশ শতকের সমাজ ইতিহাসে যেসব মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ। অন্যতম তার কারণ ধর্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতি গভীর প্রজ্ঞা লক্ষ্য করা যায় এবং অভূতপূর্বভাবে স্বামীজি জীবন ও মৃত্যুর যে ফর্ম বা প্রকল্প তা নিয়ে অবিরত আলোচনা করে গেছেন। ‘স্বামীজিকে যে রূপ দেখিয়াছি’ গ্রন্থের চতুর্বিংশ পরিচ্ছদে ‘স্বামীজীর মৃত্যু সম্বন্ধীয় শিক্ষা’ অধ্যায়ে সিস্টার নিবেদিতা বলেছেন, “আমাদের আচার্যদেব যে বিবিধ উপায়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন, তন্মধ্য একটি অতীব হৃদয়গ্রাহী উপায় এই ছিল যে, তাঁহার উপস্থিতিই নীরবে শিস্যর মধ্যে অজ্ঞাতাসারে একটা পরিবর্তন আনিয়া দিত। সে সকল জিনিস কে যে চোখে দেখিত, সেই দৃষ্টিটাই আমূল পরিবর্তিত হইয়া যাইত; সে যেন কোন একটি নির্দিষ্টভাবে একেবারে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইত, অথবা সহসা দেখিতো যে, তাহার কোন বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সমস্ত অভ্যাসটাই চলিয়া গিয়াছে এবং তৎস্থলে একটি নুতন মতের উদ্ভব হইয়াছে- অথচ ওই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটি কথারও আদান-প্রদান হয় নাই। লোকের মনে হইত, যেন শুধু তাহার নিকটে থাকা হে তুই কোন জিনিস তর্ক যুক্তি রাজ্য ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে এবং আপনা হইতে তৎসম্বন্ধ জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে। এইরূপেই রুচি ও মূল্য ঘটিত নানা প্রশ্ন আর মনকে আন্দোলিত করিতে পারিত না। তাহার নিকটে থাকিলে লোকের মনে মৃত্যু সম্বন্ধে যে ধারণা সঞ্চারিত হইত, তৎসম্বন্ধে কথা যেমন খাটে, এমন আর কিছুর সম্বন্ধেই নহে। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, যখন আমি স্বামীজিকে প্রথম দেখি, তখন অনেক বচ্ছর ধরিয়া আমার এই ধারণা প্রাণের ভিতর ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, আমাদের ইচ্ছা যাহাই হউক না

কেন, শরীর ত্যাগের পরও যে আমাদের ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে, এরূপ কল্পনা করিবার কোন বাস্তব কারণ নাই। এরূপ ব্যাপার হয় অসম্ভব, না হয় অচিন্তনীয়। যদি মন না থাকিলে আমাদের শরীরের অনুভূতি না হয় (কারণ, মন দ্বারাই আমরা ওই অনুভূতি লাভ করিয়া থাকি), তাহা হইলে ইহাও তেমনি সত্য যে, শরীর না থাকিলে আমরা মনের অস্তিত্ব আদৌ কল্পনা করিতে পারিনা। স্বামীজি যেমন নির্দেশ করিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য ভাষাগুলি বলে যে, মানুষ একটা দেহ, এবং তার একটা আত্মা আছে; কিন্তু প্রাচ্য ভাষাগুলি বলে যে, মানুষ আত্মা, এবং তার একটা দেহ আছে।"[৬৭]

দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু চিন্তা সম্পর্কে জানাচ্ছেন "কলেজে পড়তে আরম্ভ করে তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হলাম। বেলুড় মঠের দিকে ছুটতাম। আমার বলবার চাইবার বিশেষ কিছু ছিল না।। নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করে শুধু শুনবার জন্য নম্রহৃদয় বসতাম। এইরূপ সকাল সন্ধ্যায় অনেকদিন আনন্দপূর্ন হৃদয় মঙ্গল ইচ্ছাগুলি প্রাণে নিয়ে জাহ্নবী পার হয়ে কলকাতায় ফিরতাম। এভাবে আমি স্বামীজীকে জানি। অথবা তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানি না বলাই ভালো। একদিন বিভিন্ন কলেজের কয়েকজন যুবক বন্ধুর সঙ্গে স্বামীজীর কাছে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। কত কথা হচ্ছে। প্রশ্ন করা মাত্র আর কথা নেই, এমনই মুহূর্তের মধ্যে 'most conclusive' জবাব দিচ্ছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "তোরা তো কত ইউরোপিয়ান ফিলোসফি, মেটাফিজিক্স, পড়ছিস, কত কত দেশের নতুন কাহিনী জানছিস, আমাকে বল দেখি- what is the grandest of all the truth in life?"

আমরা মনে করলাম, তিনি না জানি কি প্রশ্ন করেছেন। সকলেই উত্তর বিমুখ, ভাবতে লাগলাম না জানি কি উত্তর তিনি অপেক্ষা করছেন। অমনি বহিঃপূর্ণ ভাষায় বলে

[৬৭] ভগিনী নিবেদিতা, স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি, অনুবাদক - স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৩৬৬- ৩৬৭।

উঠলেন: “দেখ শোন, we shall all die - আমরা সকলেই মরব। প্রতিদিন এই কথা মনে রাখিস, তবে প্রাণ জেগে উঠবে। তবেই নিশ্চয়তা দূর হয়ে যাবে, কার্যে সক্ষম হবি, শরীর মন সবল হবে। আর তোদের সংস্পর্শে যারা আসবে, তারা সকলেই তোদের কাছ থেকে কিছু পাবে।” আমি অমনি বলে উঠলাম, “স্বামীজী! মৃত্যুর কথা মনে এলে তো হৃদয় ভেঙে পড়বে, নিরাশা এসে হৃদয়কে অধিকার করবে”

স্বামীজী - তুই ঠিক বলেছিস, প্রথমে হৃদয় ভেঙে পড়বে, নিরাশা আসবে বটে। কিন্তু, যাক না দশ দিন। তারপর? তারপর দেখবি হৃদয়ে জোর এসেছে, মৃত্যুচিন্তা সর্বদা হৃদয়ে থেকে তোদের নবীন জীবন দান করেছে। প্রতিমুহূর্তে রক্তমাংসের নশ্বরতা জানিয়ে দিয়ে তোকে চিন্তাশীল করে তুলেছে। দুদিন থাক, দুমাস-দু'বছর থাক, দেখবি ভাই সিংহবিক্রমে জেগে উঠছিস। ক্ষুদ্র শক্তি মহৎ শক্তি হয়ে উঠেছে। মৃত্যু চিন্তা কর দেখি- দেখবি, তোরা নিজেরাই উপলব্ধি করবি। কথায় আমি আর কি বোঝাবো!"

স্বামী বিবেকানন্দর মৃত্যু চিন্তা কোন আশঙ্কা বা ভয়ের দিকে নিয়ে যায় না। মৃত্যু চিন্তার মধ্যে দিয়েই বর্তমান জীবনকেই উনি আরো শক্তিশালী করার কথা বলেন যা পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লববাদের অন্যতম প্রেরণা হয়ে উঠবে। সিস্টার নিবেদিতা ‘স্বামীজিকে যে রূপ দেখিয়াছি’ গ্রন্থে জানাচ্ছেন বিবেকানন্দ মৃত্যু নিয়ে কতরকম চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। বিবেকানন্দ বলছেন, “কিন্তু মৃত্যু জিনিসটাকে বাহির হইতে দেখিলেই তবে উহাকে ঠিক চিনতে পারা যায়। নিজ আত্মীয় বিচ্ছেদ আমরা এই চিরন্তন নিয়তির মহাসত্যগুলিকে তত স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই না, যেমন গভীর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা প্রণোদিত হইয়া আমরা অপরের দুঃখে আমাদের সহানুভূতিকে জ্বলন্ত ভাবে চিত্রিত করিতে গেলে দেখিতে পাই। যে সান্তনার উপর আমরা নিজেদের বেলায় নির্ভর করিতে সাহসী হই না, তাহা অপরের জন্য অন্বেষণ করতে গেলে মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় স্পষ্ট, দৃঢ় বিশ্বাস রূপে প্রতিভাত হয়।” স্বামীজিও

যে এই নিয়মের পার ছিলেন তাহা নয়, এবং সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে অনেকে এ সম্বন্ধে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তি একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। পত্রখানি তিনি যাহাকে ‘ধীরা মাতা’ বলিতেন, সেই আমেরিকান বাসিনী মহিলাকে তাঁহার পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে লিখিত। ইহাতে আমরা তাঁহার সার বিশ্বাসটুকু আত্মীয়তা ও সহানুভূতি দ্বারা সঞ্জীবিত দেখিতে পাই, এবং উহা হইতে আমাদের প্রিয়জনেরাও মৃত্যুর পর কিরূপ গতি লাভ করিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে ও কতকটা আভাস প্রাপ্ত হই।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে তিনি ব্রুকলিন হইতে এই শোকসন্তপ্ত মহিলাটিকে লিখিতেছেন, “আপনার পিতা যে জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিবেন, তাহা আমি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম, আর যখন কোন ভাবী অপ্রিয় মায়াতরঙ্গ কাহাকেও আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহাকে পত্রলেখা আমার রীতি নহে। কিন্তু এইগুলিই জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ, এবং আমি জানি আপনি বিচলিত হন নাই। সমুদ্রের উপরিভাগ পর্যায়ক্রমে উঠিতেছে ও নামিতেছে, কিন্তু যিনি সাক্ষী স্বরূপ, আনন্দময়ের সন্তান, তাহার নিকট প্রত্যেক পতন সমুদ্রের গভীরতা এবং তাহার তলদেশে যে অসংখ্য মণি মাণিক্য প্রবলাদি সঞ্চিত আছে, তাহাই অধিকতর রূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। আসা-যাওয়া নিরবিচ্ছিন্ন ভ্রম মাত্র। আত্মা কখনও যানও না, আসেনও না। যখন সমগ্র দেশই আত্মার ভিতরে, তখন এমন স্থান কোথায়, যেখানে আত্মা যাইতে পারেন? যখন তিনি শরীরে প্রবেশ এবং তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন? “পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাই ভ্রম হইতেছে যে, সূর্য পরিভ্রমণ করিতেছেন; কিন্তু সূর্য স্থির আছেন। সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়া গতিশীল, পরিবর্তনশীল- আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করিতেছেন, এই মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতেছেন, আর সাক্ষী স্বরূপ আত্মা স্থির অপরিবর্তিত থাকিয়া, জ্ঞানামৃত পান করিতেছেন। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সকল আত্মাই বর্তমানকালে, এবং একটা জড় উদাহরণ গ্রহণ করিলে - সকলে একই

জ্যামিতিক বিন্দুতে অবস্থিত। যেহেতু আত্মার দেশবোধ নাই, সেই হেতু যাহা কিছু আমাদের ছিল, আছে এবং হইবে, সমস্তই সর্বদা আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে, সর্বদা সঙ্গে ছিল এবং সর্বদা সঙ্গে থাকিবে। আমরা তাহাদের ভিতরে, তাহারা আমাদের ভিতরে। চাঁদের উপর দিয়া মেঘ চলিয়া যায়, ভ্রম হয় যেন চাঁদ চলিয়া যাইতেছে। সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ ও জড় পদার্থ গতিশীল, তাহাতেই ভ্রম হইতেছে যেন আত্মা গতিশীল। এইরুপে আমরা অবশেষে দেখিতে পাই যে প্রত্যেক জাতির কি উচ্চ, কি নীচ, সকল লোকই যে সহজাত সংস্কার (না দৈব প্রেরণা?) বসে মৃত ব্যক্তিগণ কখনো নিকটে আসিয়াছেন বলিয়া অনুভব করে তাহা বিচারের দিক হইতেও সত্য। প্রত্যেক আত্মা এক একটি নক্ষত্র, এবং সকল নক্ষত্র ঈশ্বর রূপী, সেই অনন্ত নীলিমায়, সেই অনাদি অনন্ত আকাশে খচিত রহিয়াছে। ঐখানেই প্রত্যেকের এবং সকলের মূল, যথার্থ সত্তা, এবং যথার্থ ব্যক্তিত্ব। এই নক্ষত্র সমূহের মধ্যে যেগুলি আমাদের চক্রবালের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে অন্বেষণ করাতেই ধর্মের সূত্রপাত, এবং তাহাদের সকলকে ঈশ্বরে এবং আমাদিগকেও সেই স্থলেই দেখিতে পাওয়া- ইহাই ধর্মের শেষ। সুতরাং সমগ্র রহস্য এই যে, আপনার পিতা পরিহিত জীর্ণ বস্ত্র খানি ফেলিয়া দিয়াছেন, এবং যেখানে তিনি অনাদি অনন্তকাল হইতে আছেন, সেইখানেই দন্ডায়মান আছেন। এই জগতে বা অপর কোন জগতে তিনি ঐরূপ আর একখানি বস্ত্র প্রকট করিবেন কিনা ? আমার আন্তরিক প্রার্থনা, তিনি যেন না করেন, যতদিন না তিনি উহা পূর্ণজ্ঞানের সহিত করেন । ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন কেহ নিজ কৃতকর্মের অলক্ষে শক্তি দ্বারা কোথাও বলপূর্বক নীত না হয় । প্রার্থনা করি, যেন সকলেই মুক্ত হয়, অর্থাৎ জানিতে পারে যে, তাহারা মুক্তই

আছেন। আর যদি তাহাদিগকে পুনরায় স্বপ্ন দেখিতে হয়, তবে আসুন আমরা সকলে প্রার্থনা করি, যেন তাহাদের স্বপ্ন শান্তি ও আনন্দেরই স্বপ্ন হয়।"[৬৮]

আসলে, উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে বিভিন্ন মনীষীর মৃত্যুচিন্তা যেন বিভিন্ন নক্ষত্রের যেমন স্বকীয়তা তেমনই তাঁদের মৃত্যুচিন্তাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বকীয়ভাবে উজ্জ্বল। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দর মৃত্যু চিন্তার ইতিহাসে যেন মৃত্যুরও একটি জীবন আছে, অর্থাৎ সতীদাহ থেকে যে মৃত্যু প্রকল্পটি রামমোহন বুনেছিলেন বিবেকানন্দ তাতেই নক্ষত্রের নীলিমায় আন্দোলিত করলেন। এটি একটি বিরাট ইতিহাসের অধ্যায় যা একক গবেষণায় বা এক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা অসম্ভব। তবু উনিশ শতকের শীর্ষ স্থানীয় চিন্তাবিদদের মৃত্যুচিন্তা ও তাঁদের প্রয়াণ যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহা সমুদ্রতটে কিছু নুড়ি কুড়িয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা করেছি।

[৬৮] ভগিনী নিবেদিতা, স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি, অনুবাদক - স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৩৮১- ৩৮৩।

পঞ্চম অধ্যায়

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্মশান

৫.১. পটভূমিকা

মৃত্যুর ইতিহাস অনুসন্ধানে শ্মশানের ইতিহাসও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষত সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে শ্মশানের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষভাবে তাৎপর্যবাহী। আলোচ্য অধ্যায়ে শ্মশানের ইতিহাসকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হল শ্মশানের সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক দিক, অন্যটি হল শ্মশান সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস। সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক দিকটিতে দেখানো হয়েছে শ্মশানের স্থাপত্য, শ্মশানের ভৌগোলিক অবস্থান ও শ্মশান সম্পর্কিত বিভিন্ন জড় উপাদান কিভাবে শ্মশান ব্যবস্থাটির সাংস্কৃতিক চিহ্ন বহন করছে। অপরদিকে প্রাচীন হিন্দু রীতিতে শ্মশানের যে সামাজিক, দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় দিক আছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্মশানসংলগ্ন কালী মন্দির বা শ্মশানকালীর কিভাবে ধর্মীয় চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত শবদাহের রীতিনীতির সঙ্গে প্রাচীন সমাজের শবদাহের রীতিনীতির বিস্তর তফাৎ লক্ষ করা যায়। বর্তমানে শবদাহের জন্য নির্মিত বৈদ্যুতিক চুল্লি বা বাঁধানো ঘাট ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানকে সুনির্দিষ্ট করে শ্মশান হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও প্রাচীন যুগে শ্মশান সম্পর্কে এই রকম ধারণা গড়ে ওঠেনি বলা চলে। শ্মশানের স্থান নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে শ্মশান সবসময় হবে গ্রামের উত্তরপ্রান্তে এবং তার জমির ঢাল হতে হবে দক্ষিণ দিকে। স্থান নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তার আশেপাশে নদী কিম্বা জলাশয়ের উপস্থিতি থাকে। আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন শ্মশানঘাটগুলির ইতিহাস মূলত কাশীশ্বর মিত্র শ্মশান ঘাট, নিমতলা শ্মশানঘাট ও কেওড়াতলা মহাশ্মশানের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এই ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের বিশেষত মধ্য উনিশ শতকে তাদের যে নব্য আধুনিকতার বর্গে দূষণ-রোগজীবাণু, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সপর্কে যে ধারণা গড়ে উঠছিল তার সঙ্গে ভারতীয় শ্মশান ব্যবস্থার যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তার বিরোধ লেগেছিল।

এই আলোচনার বর্গে ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ধর্মীয় চেতনার ধারণাটিকে ধরতে পারেনি, তার বদলে ভারতীয় শ্মশান সম্পর্কে তাদের এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। বাংলার স্যানিটারি কমিশনের সভাপতি জন স্ট্রাচি ১৮৬৪ সালে ৫ ই মার্চ লেখেন, যে নদী কলিকাতার অধিকাংশ লোককে পানের ও রন্ধন ইত্যাদি গৃহ কার্যের জন্য জল যোগায়, সেই নদীর জলে প্রতি বছর পাঁচ হাজারের উপর মানুষের মৃতদেহ নিক্ষেপ করা হয়। ১৮৭৫ সালে পোর্ট কমিশনার নালিশ করেন যে নিমতলা ঘাট থাকার জন্য তাদের রেল চলাচলের পথে বাঁধা তৈরি হচ্ছে। এই নালিশের ফলে ম্যাকিন্টস্ বার্ন কোম্পানিকে দিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে বর্তমান জায়গায় নিমতলা শ্মশান ঘাট তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিষয় হল, ইউরোপেও আধুনিক ক্রিমেশন পদ্ধতি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল যার অভিঘাত ঔপনিবেশিক বাংলা তথা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল। উন্মুক্ত অগ্নিসৎকারের বদলে ঘেরা জায়গায়, শহর থেকে দূরে, চিমনির মাধ্যমে ধোঁয়া নির্গমন ও যথেষ্ট বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ইত্যাদি সনাতন অগ্নিসৎকার ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল। এসম্পর্কে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন, সনাতন ও আধুনিক ব্যক্তি বর্গের মধ্যে যে যুক্তিতর্ক তা আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। শ্মশান ব্যবস্থাকে সরাসরি চাক্ষুষ করার জন্য হুগলী, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত শ্মশান পরিদর্শন করে ও সেখান থেকে এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাথে যুক্ত বিভিন্ন মানুষজনের সাথে কথা বলে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষত একটি ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। কাঠে পোড়ানোর বীভৎসতার মধ্যে দিয়ে উচ্চবর্গীয় বর্ণহিন্দুদের আধুনিক সময়ে একধরনের নেতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়, কিন্তু হুগলী জেলার ত্রিবেণী মহাশ্মশানের নিম্নবর্গীয় মানুষের মধ্যে কাঠে পোড়ানোর ঝোঁক প্রবল। তার কারণ হিসেবে তারা আমায় জানিয়েছেন কাঠে পোড়ালে আত্মার মুক্তি দ্রুত হয় ও পুণ্যলাভ এতে বেশী। ইতিহাসের সঙ্গে স্থান, কাল, পাত্রের যেমন যোগ আছে, তেমনই শ্মশানের ইতিহাসে শ্মশান স্থান হিসেবেই

বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শ্মশানে গেলে যেমন চিত্ত শুদ্ধি হয়, আবার তেমন ভয়ের সঞ্চারও করে এবং ভাষার ব্যখ্যার অতীত এমন এক অনুভূতির জন্ম দেয় যা ভবিষ্যতের চিন্তা চেতনাকে নির্দেশিত করে।

৫.২. শ্মশান সম্পর্কীয় সাংস্কৃতিক আলোচনা : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যম আর নচিকেতার সংলাপ

সত্যানুসন্ধানী নচিকেতা একদা যমরাজ এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, মৃত্যু কী? অমরতা কাকে বলে? তৈত্তিরিও ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের একাদশ প্রপাঠকে সেই নচিকেতার একটি উপাখ্যান আছে।। ঋষি বাজশ্রবশের পুত্র নচিকেতা নেহাতই ছেলেমানুষ। বিশ্বজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে বাজশ্রবশ তার যা কিছু বিষয়ে আশায় দিয়ে থুয়ে যাবেন। পুত্র নচিকেতা জানতে চাইলো, বাবা আমাকে তুমি কার কাছে দিয়ে যাবে? একবার বলল, দুবার বললো, তিনবারের বার বাজশ্রবশ বললেন বাছা তোকে দিয়ে যাব যমের কাছে। ঠিক হলো যম যখন বাড়ি থাকবেন না নচিকেতাকে থেকে সেই সময় যেতে হবে। সেখানে কিছু খাওয়া দাওয়া চলবে না। যম যদি জিজ্ঞেস করেন, ক'রাত এভাবে কাটালে? নচিকেতার জবাব হবে , তিন রাত। প্রথম রাতে কি খেলে? জবাব হবে, আপনার ছেলেপুলে। দ্বিতীয় রাত? আপনার যত পশু। তৃতীয় রাত? আপনার সুকর্ম।

যম বললেন , ব্রাহ্মণ তুমি নমস্য অতিথি, তোমাকে প্রণাম। আমি সন্তুষ্ট হয়ে বলছি, তুমি তিনটি বর প্রার্থনা কর। আমি পূরণ করব। নচিকেতার তখন মনে হল, তাকে হারিয়ে তার বাবার মন বোধ হয় অনুতপ্ত। তাই তার প্রথম প্রার্থনা: জীবিত অবস্থায় যেন বাবার কাছে ফিরে যেতে পারি। নচিকেতা দ্বিতীয় প্রার্থনা: স্বর্গলোক গমন- যেখানে ভয় নেই, জরা নেই। লোকে যেখানে

খাওয়া দাওয়া ভুলে পরমানন্দে শোকাতীত হয় সেই স্বর্গে যে অগ্নি উপাসনা করলে যাওয়া যায় - হে যমদেব, আমায় তার সন্ধান দিন।

যমদেব নচিকেতার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তথাস্তু। নচিকেতা এবার তার শেষ প্রার্থনা নিবেদন করলেন। মানুষ মারা গেলে কেউ বলে সে থাকে, কেউ বা বলে সে থাকেনা - এই দুটির মধ্যে কোনটা ঠিক আপনি তাই আমাকে বলে দিন এবং আপনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে আমি মৃত্যু জয় করতে পারি। জম নচিকেতাকে যাচাই করবার জন্য বললেন, মানুষের আর কথা কি, দেবতাদের ও এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। মৃত্যুঞ্জয় হওয়া বড় কঠিন কাজ। তুমি বরং অন্য কিছু চাও। শতায়ুপুত্র পৌত্র চাইতে পারো, ধনমান যৌবন ইত্যাদি ও চাইতে পারো, কিন্তু দোহাই তোমায়, মৃত্যুঞ্জয় হতে চেওনা। নচিকেতা কিন্তু প্রলোভনে পা দিলেন না। নচিকেতা বলল, ধনমান যৌবন ওসব ঠুনকো জিনিস আমি চাই না, আমি চাই অমরত্ব। নচিকেতার কথায় যমরাজ তুষ্ট হলেন। বললেন, পৃথিবীতে দুটি জিনিস আছে। একটি শ্রেয় আরেকটি প্রেয় । শ্রেয় আমাদের ভালো করে, আর প্রিয়দেয় প্রীতি। এদের প্রয়োজন আলাদা আলাদা। এই দুটি জিনিসই মানুষের কাছে আসে। যে মানুষ এদের মধ্যে শ্রেয় কে গ্রহণ করে তার ভালো হয়, আর যে প্রায় ওকে বরণ করে সে প্রায়শ্চী লক্ষ্য থেকে চুত হয়।

কঠোপনিষদেও নচিকেতার বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে। তবে তফাৎ এই যে সেখানে নচিকেতার যমালয়ে রাত্রি বাসের প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে সারা হয়েছে।। বরং জোর দেয়া হয়েছে বরদানের ব্যাপারটিতে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে পাওয়া এই উপাখ্যানটির বীজ কিন্তু লুকিয়ে আছে ঋক সংহিতার একটি সূক্তে। অনুক্রমনিকারের মতে সুক্তটি ঋষি যমগোত্রীয় কুমার। দেবতা যম। সুক্তোটি রূপকের ভাষায় রচিত। এই রূপকের পিছনে আচার্য সারণ নচিকেতা উপাখ্যানের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। সুক্তটির নিহিতার্থ এই রকম : ব্রহ্ম- বৃক্ষের

তোলে যমের সভা বসেছে। দেবতাদের নিয়ে যম আনন্দ করছেন সেখানে। মানুষ মৃত্যুর পড়ে সেইখানে যায়। আপনাদের পিতৃপুরষগণও সেখানেই আছেন । মৃত্যুর দ্বারা তারা অমরত্ব লাভ করেছেন।

১৮ শতকের শেষের দিকে শ্রদ্ধা ও নীতিবোধের অনন্যতা যখন পাশ্চাত্য দর্শনের স্বীকৃতি অর্জন করেছে কান্ট ও তার সমসাময়িক মনীষীদের চিন্তায়, তখন ইউরোপের যুগসন্ধি লগ্ন। ভারতবর্ষে শ্রদ্ধার ধারণা উপনিষদের সমবয়সিত বটেই, হয়তো তার চেয়েও পুরনো। সারা উনিশ শতক ধরে ঐতিহ্যগত ও প্রথা সম্মত অনেক সত্যই আবর্তিত হচ্ছে সেকাল ও একালের ধারাসংগমে। আধুনিকতার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্কটা কী, প্রশ্নের ঘূর্ণিপাকে সনাতন শ্রদ্ধা কেও তাই আবার নতুন করে আদিকল্পের মধ্যেই ভারসাম্য খুঁজতে হয়েছে। শ্রদ্ধা থেকে শ্রাদ্ধ এটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে শুধু নয় মানসিক চিন্তা চেতনা জগতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। সমগ্র উনিশ শতকের যে আলোকায়ন সেই আলোকায়নের যে আলোর ধারণা বা উপাদান তা শ্রদ্ধা, নৈতিকতা, যুক্তিবোধ এরমাধ্যমে নির্মিত হচ্ছে। যম আর নচিকেতার সংলাপ বা নচিকেতার প্রশ্ন বান শুধুমাত্র আদি চেতনার কথা বললে বা ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিচার করলে ভুল হবে। বরং উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের যে নৈতিকতার মানদণ্ড তৈরি হচ্ছে তার প্রেক্ষাপটে যে নুতনকে প্রশ্ন করা সেই প্রশ্নের খাঁচাটি যম আর নচিকেতার সংলাপ থেকে অনেকটা অনুপ্রাণিত বলে মনে করা যেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দর পাঠে নচিকেতা-যম সংবাদের মুখ্য পাত্র উত্তরপক্ষ নয়, পূর্বপক্ষ- যম নয়, নচিকেতা। পরিচিত ব্যাখ্যা রীতি ও প্রচলিত তর্করীতির ব্যতিক্রম এই পাঠের তাৎপর্য কী। তার গ্রন্থাবলীতে এই ব্যতিক্রমী চিন্তার

পৌনঃপুনিকতা কি কেবলই শাস্ত্রীয় অনুশীলন, না কি আত্মজিজ্ঞাসার নতুন কোন ইঙ্গিত? অভিনবত্ব কি পালাবদলের সূচনার ক্ষেত্রে?

নচিকেতা যে শ্রদ্ধার প্রতীক সে কথা বিবেকানন্দ বারে বারেই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এইটুকুতেই তার উপদেশের সবকিছু বলা হয় না। এ বিষয়ে তার বক্তব্যের মূল কথা এই যে শ্রদ্ধার উৎস অনুভূতিতেই

"সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রদ্ধা' কথাটি বোঝাবার মত শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয় প্রবেশ করেছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দাড়াও শ্রদ্ধা-কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধহয় 'একাগ্রনিষ্ঠা' বললে সংস্কৃত শ্রদ্ধা-কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়। ...মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অনুভূতির দিকে যাচ্ছে।" (স্বামীজীর গ্রন্থাবলী এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে অদ্বৈত আশ্রম থেকে কর্তৃক প্রকাশিত complete works of Swami Vivekananda এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা থেকে। পৃষ্ঠা ৯১)

এই সুপ্রাচীন শব্দটির সঙ্গে অনুভূতির সম্পর্ক যে ব্যাকরণসম্মত, তার প্রমাণ পাণিনির সূত্র। শ্রদ্ধা শব্দটি যে অনুভূতি বিশেষ এবং ভারতীয় মনস্তত্ত্বের অভিধানে তার স্থান যে বহু যুগ ধরেই স্বীকৃত তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের মতেও তাই একাগ্রনিষ্ঠা বললে সংস্কৃত শব্দ শ্রদ্ধা কথাটি কিছুটা কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। সশ্রদ্ধ একাগ্র নিষ্ঠার অনুভূতিই নচিকেতার চরিত্রায়নে বিবেকানন্দর সমস্ত বক্তব্যের মূল কথা।

নচিকেতার যে প্রশ্ন মৃত্যু কি এবং সেই প্রশ্নের সূত্রে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা ধাপে ধাপে সে পৌঁছে গেছে আত্মজ্ঞানে। স্বামীজীও তার উপদেশে জ্ঞানতত্ত্বের এই দিকটাতে যথেষ্ট জোর দিয়েছেন। তার কাছে সত্যকে বড় করে দেখাতে গিয়ে সন্ধানকে তিনি হেয় করেননি। সাহস

বিবেকানন্দের কাছে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক চেতনার অবলম্বন বলে মনে করেছেন। কারণ, কিশোর নচিকেতা মহাকালকেও প্রশ্ন করতে ভয় পায়নি; তার আগ্রহ পরম সত্যর প্রতি, তার বিনিময়ে স্বর্গমর্ত্যর সবচেয়ে কাম্যবস্তুকেও সে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সাহস, বৈরাগ্য, বিচার ও একনিষ্ঠা - এগুলি ব্যক্তিত্বের এক-এক দিক, এক- এক প্রত্যঙ্গ। সবকটির সমাহার শ্রদ্ধায়, তাই শ্রদ্ধাতেই ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশসম্ভব হয়। সেই বিকাশ একাধারে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী। এই শ্রদ্ধা রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ সমগ্র উনিশ শতকে যে নবজাগরণ বলে চিহ্নিত হয়েছিল তার অন্যতম একটি মৌলিক উপাদান শ্রদ্ধা । পরবর্তীকালে আমরা যখন দেখব সিপাহী বিদ্রোহের পর যে নব্য জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লববাদের জন্ম ভারতবর্ষে হচ্ছে এবং সেখানে প্রতিনিয়ত মৃত্যুই আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হয়ে উঠছে সেখানেও বিবেকানন্দের এই শ্রদ্ধা ভাবই যেন নব্য জাতীয়তাবাদের নতুন চেতনার এক বাহন। বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলছেন, " নিজেরা শ্রদ্ধাবান হয়ে দেশে শ্রদ্ধা নিয়ে আয়। নচিকেতার মত যমলোকে চলে যা- আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য, আত্ম উদ্ধারের জন্য, এই জন্ম মরণ প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য যমের মুখে গেলে যদি সত্যলাভ হয়, হলে নির্ভীক হৃদয় যমের মুখে যেতে হবে " (বি ৯: ৩১)

বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞানের প্রস্তুতি হিসেবে দেশবাসীকে আত্মবিশ্বাসের নৈতিকতার শিক্ষিত করে তোলা। তাই কঠোপনিষদের সেই উপাখ্যানটির অনুকীর্তনে তিনি নচিকেতার আদর্শকে ব্যবহার করেছেন জাতীয় চরিত্রে ত্রিবিধ অভাবের সমালোচনায়।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব:

রঘুনন্দনের 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব'এর মতে শ্রাদ্ধ কথাটির সংজ্ঞা হলো, মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভরে কোন কিছু দান করা। কিন্তু সংজ্ঞাটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকারেরা সর্বদা সেই ব্যাপক মানসিকতার ছাপ রাখতে পারেননি।। নানাবিধ বিধানের কূটকলায় তারা সংজ্ঞার ব্যাপক অর্থ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। শ্রাদ্ধ কাকে বলে এই নিয়ে যেমন নানা মুনির নানা মত তেমনি এর প্রকারভেদ নিয়েও তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। শলপানি তার 'শ্রাদ্ধ বিবেক,' গ্রন্থে যেসব স্বাস্থ্যকারদের মতামত আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে বিশ্বামিত্রের মতে শ্রাদ্ধ মোট বারো রকমের। ভবিষ্যপুরাণ ও সংখ্যার দিক থেকে শ্রাদ্ধ কে অনুরূপ ভাগে বিভক্ত করেছেন, কার কার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে সে বিষয় উভয় মতে বিস্তর ফারাক আছে। বৃহস্পতি আবার সংখ্যার দিক থেকে শ্রাদ্ধকে কমিয়ে পাঁচ প্রকারে ভাগ করেছেন - ১. নিত্য, ২. নৈমিত্তিক, ৩. কাম্য, ৪. বৃদ্ধি, ৫. পার্বণ।

সুলপানি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থল সম্পর্কে তার শ্রাদ্ধ বিবেক গ্রন্থে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। কার মতে নিম্নলিখিত স্থানগুলি শ্রাদ্ধ কার্যের জন্য প্রশস্ত - ১. পুষ্কর নামক স্থান, ২. সকল তীর্থস্থান, ৩. , ৪. নদীর সঙ্গমস্থল, ৫. নদীর উৎপত্তিস্থল, ৬. , ৭. নিকুঞ্জ, ৮. প্রশ্রবণ, ৯. উদ্যান বাটিকা, ১০. গো ময় লিপ্ত ঘর ১১. মনোজ্ঞ স্থান, ১২. গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর তীরবর্তী স্থান, ১৩. গয়া, ১৪. কুরুক্ষেত্র, ১৫. প্রয়াগ, ১৬. পর্বত বা তার সানুদেশ।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের যেমন উপযুক্ত স্থল আছে তেমনি নিষিদ্ধ স্থান ও বিদ্যমান। যেসব স্থানে সাধ্য কার্য নিষিদ্ধ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১. চতুর বর্ণের লোক যেখানে বাস করে না। ২. ত্রিশঙ্কুদেশ, ৩. কারস্কর দেশ, ৪. সিন্ধু নদের উত্তরস্থ দেশ, ৫. বালুময় স্থান, ৬. কীটপতঙ্গ

বহুল স্থান, ৭. কর্দমাক্ত স্থান, ৮. সংকীর্ণ স্থান, ৯. অনিষ্ঠগন্ধিক স্থান, ১০. অপর ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত স্থান। এইরকম স্থানে যদি শ্রাদ্ধকার্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে তবে ভূস্বামী জীবিত থাকলে তাকে ভূমি মূল্য দিতে হবে, মৃত হলে তার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধিয় দ্রব্য অগ্রভাগে দিতে হবে।

যেদিন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় সেদিন শ্রাদ্ধকারীর কতকগুলি বিশেষ কর্তব্য থেকে যায়। কর্তব্যগুলি মোটামুটি এইরকম:

১. প্রাত:স্নানের পরে ধৌতবস্ত্র পরিধান

২. শ্রাদ্ধের অন্ন রন্ধন।

এর আগে শ্রাদ্ধের যোগ্য স্থান এবং নিষিদ্ধ স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবার তার যোগ্য সময় অসময় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রথমেই জানার যে প্রয়োজন শ্রাদ্ধের সময় অসময় বিষয় সকল স্মৃতি কার গণ একমত নন। তাও তাদের মতামতে সারাংশ থেকে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায় তা নিম্নরূপ।

১. মাতৃক শ্রাদ্ধ পূর্বাহ্ন

২. পৈত্রিক শ্রাদ্ধ অপরাহ্ন

৩. একদ্দিষ্ট মধ্যাহ্ন

৪. বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ - প্রাতঃকাল।

শ্রাদ্ধের জন্য নিম্নলিখিত সময় গুলি বর্জনীয় যেমন রাত্রি, ঊষা, সূর্যোদয় ঠিক পরক্ষণ। বিশেষ করে 'রাক্ষসী বেলা'বেলা বলে রাত্রিবেলা অবশ্যই নিষিদ্ধ।

৫.২.১. শ্মশানের সেকাল- পুরাণ, ইতিহাস, মিথ

অথর্ববেদ-এ মৃতদেহের মুখাগ্নিসহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মৃতদেহ অগ্নিসংস্কারের প্রমাণ আরও সুপ্রাচীন। আদিবেদ ঋগবেদ-এ অগ্নিদেবকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—

মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাস্য ৎবচং চিক্ষিপো মা শরীরম্ ।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমেনং প্র হিণুতাৎপিতৃভ্যঃ ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.০১

অর্থাৎ, হে অগ্নি, মৃত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত কোরো না। একে যন্ত্রণা দিয়ো না, চামড়া শরীর ছিন্নভিন্ন কোরো না। হে জাতবেদা, যখন এর শরীর উত্তমরূপে পরিপক্ক হবে তখনই একে পিতৃলোকের নিকট পাঠিয়ে দিয়ো।

শবদাহের জন্য এই পরিমাণ জ্বালানীর সামগ্রী হওয়া উচিত যাতে শব কাঁচা না রয়ে যায় আবার জ্বালানী বেশি পরিমাণে হলেও অগ্নি এদিক-ওদিক চারিদিকে জ্বলে শবদেহ রয়ে যাবে, সেজন্য ভালো মানের জ্বালানী প্রয়োগ করা উচিৎ তথা অঙ্গার চট-পট করে এদিক-সেদিক না উড়ে যায় কিংবা পড়ে না যায়, চট-পট করেনা এমন জ্বালানীতে শব জ্বালানো উচিৎ, যাতে অগ্নির দ্বারা সব সূক্ষ্ম হয়ে সূর্যকিরণে প্রাপ্ত হতে পারে ।।১।।

শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথেমেনং পরি দত্তাৎপিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.০২

অর্থাৎ, আত্মার বিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই এই শরীর পৃথিবী আদি ভূতের সাথে মিলিত হতে আরম্ভ করে। অগ্নিতে জ্বলার কারণে সূর্যরশ্মি শবদেহকে উক্ত ছেদন-ভেদন দ্রুত করে দেয়।।২।।

সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.০৩

অর্থাৎ, দেহান্তরের পর দেহ অনন্তর নিজ নিজ কারণে পদার্থে বিলীন হয়ে যায় এবং জীব স্বকর্মানুসারে প্রকাশময়, জলময়, পৃথিবীময় লোকে তথা বৃক্ষাদি, জড় যোনি পর্যন্তও প্রাপ্ত হয়ে থাকে।।৩।।

অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্ ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.০৪

অর্থাৎ, দেহান্তরের সাথেই অগ্নিতত্ত্ব যে সকল স্থানে তেজরূপে বর্তমান, যেমন পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং ক্রমে দ্যুস্থানে নিয়ে যায় ।।৪।।

অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ।
আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.০৫

অর্থাৎ, দেহান্তরের পর মৃত ব্যক্তির দুই প্রকারের পরিণাম অগ্নি দ্বারা হয়ে থাকে। এক, অগ্নিতে শবদহন হয়ে মৃতের শরীর সুক্ষ্ম কণারূপে সূর্যরশ্মিকে প্রাপ্ত করে। দ্বিতীয়, সর্বত্র বিদ্যমান সূক্ষ্মাগ্নি তেজ দেহান্তরের সাথে সাথেই জীবকে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত করানোর জন্য প্রেরক বানিয়ে থাকে ।।৫।।

যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.০৬

অর্থাৎ, অগ্নি ও সোম বিশ্বভৈষজ এবং সর্বভয় নিবারক পদার্থ। একথা এক আয়ুর্বেদিক ও রক্ষা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে বর্ণিত। মনুষ্য জীবনে ভয়ানক পক্ষী, কৃমি, সর্প ও ব্যাঘ্রাদি প্রাণি হতে প্রাপ্ত

ভয় ও পীড়ার নিবারণ অগ্নি এবং সোম দিয়ে করা উচিৎ। তথা উক্ত জন্তু দ্বারা আক্রমিত হয়ে মৃত মনুষ্যকে অগ্নি সোম দ্বারা শবদহন করানোর ফলে রোগ সংক্রমণের প্রতিকার হয়ে থাকে, কেননা এরূপ না করে অন্য প্রাণী ওইসকল প্রাণীর বিষক্রিয়াদি থেকে বাঁচতে পারেনা।।৬।।

অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যযস্ব সং প্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ।
নেত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্বিধক্ষ্যন্পর্যঙ্খয়াতে ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.০৭

অর্থাৎ, শবদহন বেদীর পরিমাপ এরূপ হতে হবে যেন মৃতের শরীর অনায়াসে পুরোপুরি বেদীতে এসে যায় এবং মৃতের প্রত্যেক নোখ, নাড়ী, মাংস, চর্বিয়াদি অংশে অগ্নি ভালভাবে প্রবেশ করতে পারে। যে ব্যক্তি শবদহন করাবেন তাকে খেয়াল রাখতে হবে, চিতায় অগ্নি এভাবে জ্বলবে যেন তা আবার অতিতীক্ষ্ণ ও বলবান হয়ে জ্বলন্ত শবকে এদিক-ওদিক না ফেলে দেয়।।৭।।

ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাম্।
এষ যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ন্তে ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.০৮

অর্থাৎ, শবগন্ধ প্রতিকারার্থে অন্ত্যেষ্টিকর্মের সময় অগ্নিতে ঘৃত এবং সুগন্ধ পদার্থের আহুতি দিতে হবে। এই আহুতি শবদোষ দূর করে সূর্য তথা চন্দ্রমার কিরণের ন্যায় অনুকূলতা প্রদান করে, বিশেষতঃ সূর্যরশ্মিকে সুখকারক বানিয়ে থাকে।।৮।।

ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.০৯

অর্থাৎ, ঘৃত ও সুগন্ধি কর্পূরাদি বস্তুর আহুতিতে শব দূর্গন্ধ বাহক অগ্নিজ্বালার শান্তি হয় এবং সুগন্ধিত হব্যপ্রসারক অগ্নিজ্বালা উৎপন্ন হয়।।৯।।

যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎপ্রবিবেশ বো গৃহমিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসম্।
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং স ঘর্মমিন্বাৎপরমে সধস্থে॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.১০

অর্থাৎ, চিতাগ্নিতে প্রদত্ত হোমাহুতি মৃতের ভিতরে থাকা শবগন্ধ দূর করে, যার দ্বারা তার জীবন, প্রাণে খারাপ আসে না, সূক্ষ্ম হয়ে উপরে আকাশে শবগন্ধ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যায়।।১০।।

যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৄন্যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.১১

অর্থাৎ, শবাগ্নিতে ঘৃতাদি হব্য দেওয়ার কারণে শবমাংসের চটপটা শব্দ দূর করে হব্যের সরসর ধ্বনির সাথে উক্ত অগ্নি দেবযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞের রূপ ধারণ করে।।১১।।

উশন্তস্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্হবিষে অত্তবে॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.১২

অর্থাৎ, সংস্কার কার্য (ষোড়শ সংস্কার তন্মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা শবদাহ অন্তর্ভুক্ত) এবং মাঙ্গলিক কার্যে অগ্নিহোম করা উচিত।।১২।।

যং ৎবমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
কিয়াম্বত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল্কশা ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.১৩

অর্থাৎ, শবাগ্নিতে দগ্ধ স্থানকে প্রথমে অগ্নি থেকে রহিত করতে হবে, পুনঃ সেস্থানে পর্যাপ্ত জলসিঞ্চন করতে হবে যাতে সেখানে দূর্বাঘাস উৎপন্ন হতে পারে।।১৩।।

শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মণ্ডুক্যা সু সং গম ইমং স্বগ্নিং হর্ষয় ॥
ঋগ্বেদ ১০.১৬.১৪

অর্থাৎ, শবদাহ পশ্চাৎ সেস্থানের ভূমির উপচার এরূপ হতে হবে যেন সেখানে সুশীতল দূর্বা এবং সুগন্ধলতা জন্মে ভূমি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং মন্ডকপর্ণের (এক প্রকার শীতলতা প্রদায়ী উদ্ভিদ) সাথে সুন্দর দেখতে লাগে, শবাগ্নির কোন প্রকার প্রভাব বা চিহ্নও যেন না থাকে।।১৪।।

ভাষ্যঃ স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজক বিদ্যা মার্তন্ড[১]

বেদে আরও বলা হয়েছে, সেই সময় শবদাহের সঙ্গে পশুদাহও করা হত। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় এই সময়পর্ব বা তার পূর্ব থেকে বৈদিক সমাজে অগ্নিতে মৃতদেহ সৎকারের প্রথা প্রচলিত

[১] https://www.agniveerbangla.org/2019/05/blog-post_69.html?m=1

ছিল। কিন্তু ঠিক কবে থেকে শবদাহ শুরু হয়েছিল সাল তারিখের নিরিখে সেই বিচার করা দুরূহ। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নস্থান খুঁড়ে দাহ পরবর্তী সমাধির অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন অর্থাৎ সে যুগেও দাহ প্রথা বর্তমান ছিল। বৈদিক যুগ বা তার পূর্ব থেকে সনাতনীরা অগ্নি-উপাসক। অগ্নিকে প্রিয়, পবিত্র এবং সর্বশুদ্ধির দেবতা মনে করে বৈদিক ঋষিরা আজীবন যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দিয়ে এসেছেন। তাঁদের কাছে মৃত্যু মহাযজ্ঞ এবং চিতাগ্নি যজ্ঞের হোমাগ্নি সদৃশ। অতএব, চিতার আগুনের মধ্যে নিজেদের দেহকে সমর্পণ করে পূর্ণাহুতি দিয়ে দেবতার কোলে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। হোমের সঙ্গে শবদাহের এতটা সাদৃশ্য যে অগুরু, চন্দন, ঘি, মর্তমান ইত্যাদি উপাচার যেমন হোমযজ্ঞে ব্যবহৃত হয় তেমনই চিতার আগুনে সমর্পণ করার আগে এই উপাচারগুলো দিয়ে মৃতদেহের অঙ্গলেপন করা হয়। আজকের মতো মৃতদেহ অগ্নিসংস্কারের পাশাপাশি সমাধি দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল তৎকালে।

এই মহাযজ্ঞের কুণ্ড ও প্রজ্জ্বলিত আগুনকে যথাক্রমে বলা হয় চিতা ও চিতাগ্নি। যে ভূমিতে চিতার অবস্থান তাকে বলা হয় শ্মশান। শ্মশান দু-প্রকারের—সাধারণ শ্মশান এবং মহাশ্মশান। যে মহাদরজা অতিক্রম করে গেলে ফিরে আসার কোনো বিকল্প পথ থাকে না, মহাশূন্যের প্রতীক সেই মহাভূমি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। হাজার হাজার বছর ধরে জীবনের অন্তিমে যে অগ্নিসংস্কারভূমি স্থির দাঁড়িয়ে আছে স্বাভাবিকভাবে তার একটা নিজস্ব ইতিহাস গড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে তাকে আশ্রয় করে থাকা মানুষের মধ্যে তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা-দর্শন, গল্প, গড়ে উঠবে জনশ্রুতি, মিথ, গুজব..

'শ্মশান' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে। বৃহৎ পুরাণ স্কন্দ পুরাণ-এ শ্মশান সম্পর্কে বলা হয়েছে—

শ্মশব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে।

নির্ব্বচন্তি শ্মশানার্থং মুনে শব্দার্থকোবিদাঃ।।

(কাশী খণ্ড, ত্রিশতম অধ্যায়, একশো দুই শ্লোক)

অর্থাৎ, শ্মশান = শ্ম + শান। সংস্কৃত শব্দ ‘শ্ম’ শব্দের অর্থ ‘শব’ (মৃতদেহ) এবং ‘শান’ শব্দের অর্থ ‘শূন্য’ (বিছানা) অর্থাৎ শ্মশান অর্থ যেখানে মৃতদেহকে শায়িত রাখা হয়। শব্দার্থজ্ঞ পণ্ডিতেরা শ্মশান শব্দের এইরূপ অর্থ করে থাকেন।

কেবল সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নন—শ্মশানে মৃতদেহ সৎকার করেন শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষেরাও। এছাড়া ভারতবর্ষের বাইরে চিন, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মৃতদেহ অগ্নিসংস্কারের বিধি প্রচলিত ছিল, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৫.২.২. শ্মশানের একাল

বর্তমানে প্রচলিত শবদাহের রীতি-নীতির সঙ্গে প্রাচীন সমাজের শবদাহের রীতি-নীতির বিস্তর তফাৎ লক্ষ করা যায়। বর্তমানে শবদাহের জন্য নির্মিত ইলেকট্রিক চুল্লি বা বাঁধানো ঘাট ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে সুনির্দিষ্ট করে শ্মশান হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও প্রাচীন যুগে শ্মশান সম্পর্কে এই রকম ধারণা গড়ে ওঠেনি বলা চলে। শ্মশানের স্থান নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে, শ্মশান সব সময় হবে গ্রামের উত্তরপ্রান্তে এবং তার জমির ঢাল হতে হবে দক্ষিণ দিকে। স্থান নির্বাচন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তার আশেপাশে নদী কিংবা জলাশয়ের উপস্থিতি থাকে। জনবসতি থেকে দূরে লোকচক্ষুর আড়ালে।

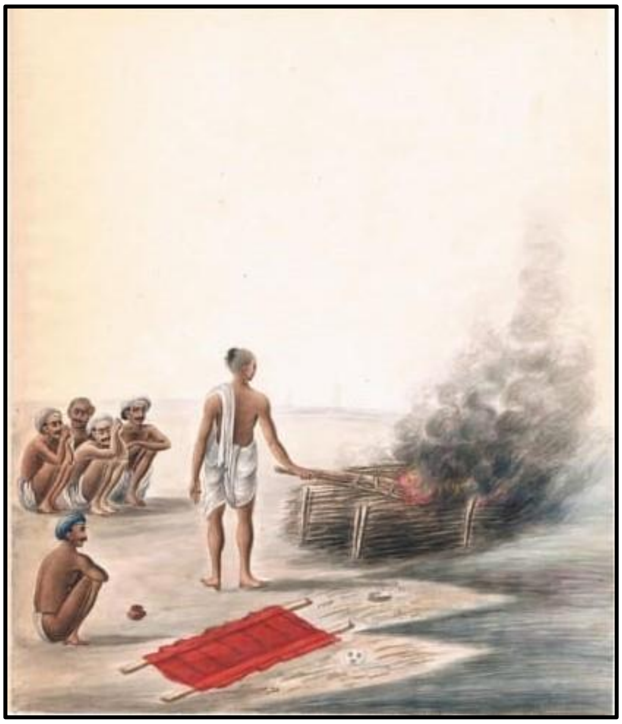

চিত্রঃ নদীর পাড়ে হিন্দু সৎকার ক্রিয়া[২]

সেই সময়ের শ্মশান আবহ, পরিবেশ ছিল রীতিমতো তমসাচ্ছন্ন এক অজ্ঞেয় রহস্যময়-পোড়া কাঠ, কয়লা, মৃতের অস্থিভস্ম, তার পরিত্যক্ত পোশাক, বালিশ, বিছানা, চশমা, থালা, লাঠি, পরিত্যক্ত কাঁথা-কম্বল, মৃতের ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা, শিয়াল-কুকুর-শকুন সংকুল ঘন গাছগাছালি ভরা অধিভৌতিক অতিলৌকিক এমন একটি স্থান যার সম্পর্কে সাধারণ মনুষ্য সমাজে ভীতিকর অবহ গড়ে উঠেছিল। শ্মশানে একলা যেতে ভয় পেত মানুষ। সন্ধে, রাতে সচেতনভাবে তারা এড়িয়ে চলত এই মৃত্যু উপত্যকা।

নির্দিষ্ট শ্মশানের চারিত্রিক ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করলে দেখা যায়, সম্ভবত কলকাতার প্রাচীনতম বাঁধানো শ্মশান কাশী মিত্র শ্মশানঘাট। তার পূর্বে কলকাতায় কোনো নির্দিষ্ট স্থায়ী শ্মশানঘাট ছিল না। গঙ্গার ধারে যেখানে-সেখানে মড়া পোড়ানো হত।

[২] A Company School watercolor painting, Patna, 1824. Source: ebay, Mar. 2013, https://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/hinduism/burningghats/burningghats.html

বস্তুত তখনকার শ্মশান আক্ষরিক অর্থেই ছিল শ্মশান। কেউ বা দাহ করতে না পেরে মৃতদেহ বস্তা ভর্তি করে কিংবা তার গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গা নদীতে ডুবিয়ে দিত। পাশাপাশি জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে উজান ভাটায় ভেসে বেড়াত মানুষের পচা গলা দেহ।

এই ঘাটে শ্মশান প্রতিষ্ঠা করেন কাশীশ্বর মিত্র। তার নাম অনুসারে পরবর্তীকালে শ্মশানটি কাশী মিত্রের শ্মশানঘাট নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে তাঁর নাম নিয়ে পণ্ডিত ও গবেষক মহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে, ১৭৮৪-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে মার্ক উড এবং ১৭১২-১৩ সালের এ. আপজনের ম্যাপে একে "কাশীরাম মিত্রের ঘাট" হিসেবে উল্লেখ করা হয় আবার ১৮৫২-৮৬ সালে পি. ডব্লিউ সিমসের ম্যাপে এবং ১৮৫৬ সালে হেশ্যামের ম্যাপে এই ঘাটটির নাম দেখা যায় 'কাশী মিত্র ঘাট'। আজ পর্যন্ত সেই নামে প্রচলিত রয়েছে। তবে তার প্রকৃত নাম কাশী মিত্র কিম্বা কাশীরাম মিত্র নয়—কাশীশ্বর মিত্র। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম অবতারণা করেন রাধারমণ মিত্র তাঁর কলিকাতা দর্পণ গ্রন্থে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, ম্যাপে ভুল রয়েছে। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্রের প্রপিতামহ রুদ্রেশ্বর মিত্রের ছোটো ভাই কাশীশ্বর মিত্র প্রভূত ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। চারজন পত্নী থাকা সত্তেও তার কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর যাবতীয় অর্থ মানবকল্যাণে সৎ কাজে ব্যয় করে যান তিনি। সেসময়ে কলকাতার স্থায়ী কোনো শ্মশানঘাট না থাকায় শ্মশান যাত্রী এবং তাদের নিত্য দুর্ভোগ কমাতে তাঁর বাড়ির অদূরে গঙ্গার তীরে তিনি একটি শবদাহের ঘাট এবং একটি গঙ্গাযাত্রীদের জন্য বিশ্রামালয় নির্মাণ করে দেন ১৭৭৪ সালে। শুরুতে মাত্র নয় কাটা জায়গার উপর নির্মিত এই শ্মশান কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন মানুষেরা ব্যবহার করত। গরিব-দুস্থদের জায়গা ছিল গঙ্গার চর অথবা সলিল সমাধি। অবশ্য বর্তমানে সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষেরাও এই শ্মশান ব্যবহার করে থাকেন। কাশীশ্বর

মিত্রের শ্মশান স্থাপনের প্রায় একশো আট বছর পর ১৮৮২-৮৩ সালে বাবু অক্ষয়চন্দ্র গুহ শ্মশানে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য আলাদা আবাস নির্মাণ করে দেন।

কাশী মিত্রের শ্মশানঘাটের দক্ষিণ দিকে প্রায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে নিমতলা মহাশ্মশান। কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্মশান। নিমতলা ঘাটে কত মহামানব চিতার ধোঁয়ায়, ভস্মে মিলিয়ে গেছেন তার কোনো হিসেব নেই। বর্তমানে এটি একটি বাঁধানো স্থায়ী আধুনিক মহাশ্মশানে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে প্রথমদিকে এই শ্মশানের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। মহেন্দ্রনাথ দত্তের কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা গ্রন্থের শহরের অবস্থা' অনুচ্ছেদে এই শ্মশানের প্রাথমিক অবস্থার প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাওয়া যায়। লেখকের শৈশবাবস্থায় নিমতলায় বাঁধানো ঘাট ছিল না। সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন—

“গঙ্গার কিনারাটা গড়েন ছিল। ইট, পাটকেল ও মড়ার হাড় চারিদিকে ছড়ান থাকিত এবং অনেক শকুনি, হাড়গিলে আশে পাশে বসিয়া থাকিত। অসাবধানে চলিলে পায়ে মড়ার হাড় ফুটিয়া যাইত। আমার পায়ে একবার ফুটিয়া ঘা হইয়াছিল। তখন কাঠ, বাঁশ দিয়া মড়া খানিক পোড়ান হইত, বাকিটা শকুনি খাইত। সে অতি ভীষণ দৃশ্য ছিল, এখনও মনে করিলে ভয় হয়।”

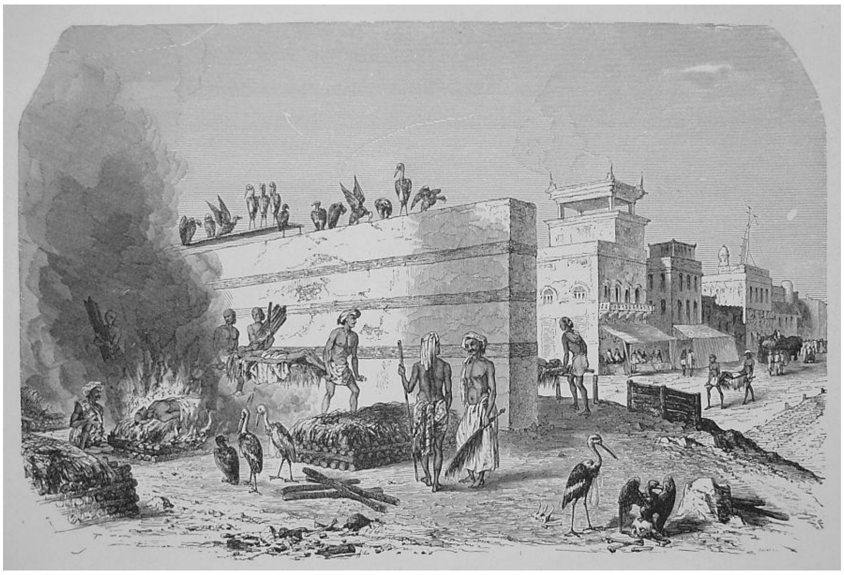

চিত্র: The Cremation Ghat at Calcutta, a wood engraving[৩]

আজ নিমতলা শ্মশানের যেখানে অবস্থান, দু-বার স্থানান্তরের পর এটি শ্মশানের তৃতীয় জায়গা। কলিকাতা দর্পণ-এর বর্ণনা মতো, আগে গঙ্গা নদী আরও অনেক ভেতরে ছিল। স্ট্র্যান্ড রোড এবং নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের সংযোগস্থলে যেখানে আনন্দময়ী মন্দির রয়েছে প্রথমে সেখানেই শ্মশান ছিল। তখন মা আনন্দময়ী দেবীর মন্দির ছিল না, শ্মশানে অধিষ্ঠান করতেন দেবী। এইজন্য ইনি শ্মশানকালী নামেও পরিচিত। এই শ্মশানের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত পবিত্র গঙ্গা নদী। তখন অবশ্য স্ট্র্যান্ড রোড তৈরি হয়নি। পরবর্তীকালে গঙ্গা নদীপ্রবাহ কিছুটা পশ্চিমে সরে গেলে লটারি কমিটির টাকায় তৈরি হয় স্ট্র্যান্ড রোড। তখন হিন্দু সমাজে অন্তর্জলি যাত্রার প্রচলন ছিল, ফলে নতুন রাস্তা তৈরি হওয়া এবং গঙ্গার প্রবাহ পশ্চিমে সরে যাওয়ায় শবদাহের সুবিধার্থে শ্মশানের পূর্বের অবস্থান থেকে কিছুটা সরিয়ে পশ্চিমে বর্তমান নিমতলা ঘাটের কিছুটা দক্ষিণে স্থাপন করা হয়। ১৬০ ফুট লম্বা এবং ৯০ ফুট চওড়া স্থানটিকে ১৫ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে তিনদিক ঘিরে ফেলা হলেও নদীর দিকে ছিল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। এই শ্মশান স্থানান্তর

[৩] Selmar Hess, New York, 1877 / Public domain

করা হয় ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে এবং এই মাসের ১৭ তারিখ সোমবার থেকে এই ঘাটে শুরু হয় মড়া পোড়ানো। সব মড়া যে পোড়ানো হত এমন নয়। শাস্ত্রীয় কারণে, বৈষ্ণব ইত্যাদি ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়, ভূমিষ্ঠ মৃত শিশু বা দু-বছরের কম বয়সি শিশু, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগগ্রস্ত, সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি, আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি, সন্ন্যাসী ইত্যাদি সম্প্রদায় বা শ্রেণির মানুষকে সমাধি অথবা নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। এর বাইরে অধিকাংশ স্বাভাবিক লোকের মৃত্যুকাল আসন্ন মনে হলে তাকে অন্তর্জলি যাত্রা করানো হত এবং অন্তর্জলিতে সে মারা গেলে অনেক মড়া গঙ্গার জোয়ারের জলে আপনা আপনি ভেসে চলে যেত।

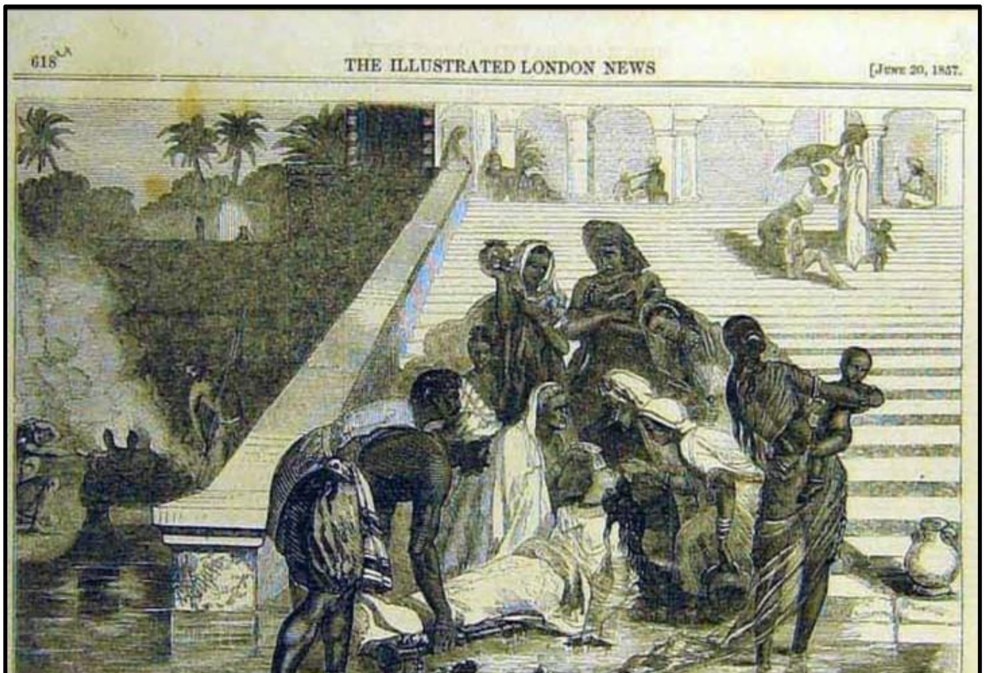

চিত্রঃ সেকালের গঙ্গাযাত্রীর অন্তর্জলি যাত্রা[8]

[8] "A Scene at a ghaut on the Banks of the Ganges," Illustrated London News, 1857, https://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/hinduism/burningghats/burningghats/iln1857b.jpg.

আবার অনেক আত্মীয়রা দারিদ্র্যতার কারণে মৃতের মুখে আগুন ঠুকে নদীতে ভাসিয়ে দিত। তখনও কিছু কিছু মানুষের জন্যে শ্মশান এক মহার্ঘ বস্তু। নিমতলা শ্মশানের পাঁচিলে শকুন, হাড়গিলে বসে থাকতে দেখা যেত এবং নিচে কুকুর-শিয়ালের আনাগোনা ছিল নিয়মিত। তারা পরস্পর নিজেরা কামড়াকামড়ি করে মানুষের, জন্তুর মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে—এ দৃশ্য হরহামেশাই দেখা যেত। ১৮৭৭ সালে সেলার হেশের আঁকা দ্য ক্রিমেশন ঘাট অফ কলকাতা ছবিতে নিমতলা মহাশ্মশানের সেদিনের দৃশ্য নিপুণভাবে উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, নিমতলা মহাশ্মশান প্রথম থেকেই অঘোরী, তান্ত্রিক, যোগী ইত্যাদি শ্রেণির শ্মশানচারী সাধকের কাছে ছিল ইপ্সিত স্থান। বিভিন্ন সময়ে বহু যোগীরা এই শ্মশানের মাটি মেখে দীর্ঘদিন সাধনা করেছে তাদের নিজস্ব তন্ত্রশাস্ত্র মতে। গৃহস্থ মানবসমাজে দৃষ্টিকটু এমন অসংখ্য অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাদের। ১৮৩৭ সালের ১৩ই জুন সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, ৪ঠা জুন দুপুরের আগে হাটখোলার থানাদার পুলিশের সুপারিনন্টেন্ডেন্টের কাছে এক ফকিরকে নিয়ে নালিশ করেন যে, সে সেই ফকিরকে নাকি নিমতলা শ্মশানে শবের মাংস খেতে দেখেছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট তৎক্ষণাৎ সেই ফকিরকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

নতুন শ্মশান এবং প্রাচীর তৈরি সম্পন্ন হলে ১৮৩৬ সালের ১লা আগস্ট সমাচার দর্পণ পত্রিকায় সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে এক জনৈক পাঠক চিঠি লেখেন। তাতে শ্মশানযাত্রীদের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরেন তিনি। তিনি লেখেন, চার জন মানুষ একটি শবকে দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে আসে। তার পূর্বে থেকে ভারী বৃষ্টি হওয়ায় তাদের পক্ষে চিতা জ্বালানো দুঃসাধ্য হয়। কেননা, সেখানে বৃষ্টি আটকায় এমন কোনো ছাঁদ বা আচ্ছাদন ছিল না। লেখক অপরাহ্নে কাজ সেরে ফিরবার সময়ও দেখেন তাদের তদ্রুপ অবস্থা। প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় তারা শব

তখনও দাহ করতে পারেনি বা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তার পূর্বে চাঁদা করে সরকারিভাবে শ্মশানের পাঁচিল এবং শ্মশানের দক্ষিণে গঙ্গাযাত্রীদের থাকবার জন্য একটি পাকা ঘর তৈরি করে দেন রানি রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস। ফলে প্রাচীর কিম্বা বিশ্রামাগার থাকলেও চিতার উপর আচ্ছাদন তখনও তৈরি হয়ে ওঠেনি।

যেহেতু অধিকাংশ দরিদ্র পরিবার এবং এতটাই দরিদ্র ছিল যে, টাকার অভাবে কাঠ তেল অন্যান্য দ্রব্য যোগাড় করে না উঠতে পেরে প্রিয়জনদের মৃতদেহ দাহ করতে পারত না। বাধ্য হয়ে ভাসিয়ে দিতে হত গঙ্গার জলে। দাহজনিত এই সমস্যা মেটানোর জন্যে সেইসব মড়া পোড়ানোর জন্য একটি ফান্ড তৈরি করার প্রস্তাব উঠলে হিসেব করে দেখা যায় মোটামুটি দু-টাকায় একেকটি মড়া স্বচ্ছন্দে পোড়ানো যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব ফলপ্রসূ হয়নি। শব গঙ্গার জোয়ার ভাটায় খেলে বেড়াতে লাগল। অথচ এই নদীর জল পান করে দুই তীরের অসংখ্য মানুষ। বাংলার স্যানিটারি কমিশনের সভাপতি জন স্টাচি ১৮৬৪ সালের ৫ মার্চ লেখেন—“যে নদী কলিকাতার অধিকাংশ লোককে পানের ও রন্ধন ইত্যাদি গৃহকার্যের জন্য জল যোগায় সেই নদীর জলে প্রতি বছর ৫ হাজারের ওপর মানুষের মৃতদেহ নিক্ষেপ করা হয়। মাত্র সরকারি হাসপাতালগুলি থেকে এক বছরে ১৫০০ মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ সরকার অবশ্য এই জলদূষণ বন্ধ করার জন্য ১৮৫৪ সালে উদ্যোগ নেন। কিন্তু হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতায় উদ্যোগটি বাতিল হয়। সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যে কলকাতা পুলিশ কমিশনার কতকগুলো নৌকা এবং ডোম রাখেন যাতে তারা গঙ্গায় টহল দিতে দিতে ভেসে যাওয়া মড়া দেখে ডুবিয়ে দিতে পারে। তবুও এতে বিশেষ কিছু কাজ হয়নি। ডোমের নজর এড়িয়ে যখন-তখন মড়া ভাসতে দেখা যেত।

এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার উপলক্ষে তৎকালীন বাংলার ছোটোলাট স্যর সিসিল বিডন গঙ্গার তীরবর্তী নিমতলা এবং কাশী মিত্র শ্মশান দুটিকে টালির নালার দিকে স্থানান্তর করতে চেয়েছিলেন। তখন হিন্দুপণ্ডিত ও বিদ্বজন সমাজ তার ব্যাপক বিরোধিতা করে। এ বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের মতামত জানার জন্য ৭ মার্চ তারিখে টাউন হলে এক সভা ডাকে সরকারের অনুরোধে জাস্টিস অফ দ্য পিস। সভার পাঁচটি আলোচ্যসভার বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি—'গঙ্গাজলে মৃতদেহাদি নিঃক্ষেপ করণের নিষেধ বিধান এবং নিমতলার শবদাহের ঘাট স্থানান্তরে স্থাপনার্থ লেফটেনান্ট গবর্নর বাহাদুর যে পত্র লেখেন', সভার এই অংশে বক্তৃতা রাখেন বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ। তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও তেজস্বী বক্তৃতার কাছে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। সরকারের তরফ থেকে দেখানো কারণের কিছু অংশ তিনি সমর্থন করেন, যেমন— নিমতলা শ্মশানে পশুপাখির ছাল চামড়া ফেলা বন্ধ করা কিংবা গঙ্গায় মৃতদেহ নিক্ষেপ বন্ধের পক্ষে সহমত হন। কিন্তু শ্মশান স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তিনি প্রবল যুক্তিপূর্ণ বিরুদ্ধতা তৈরি করেন। কিন্তু এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত জাস্টিস অফ পিস এই সমস্যা নিরসনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। রামগোপাল ঘোষ এই কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। মাত্র এক বছরের মধ্যে রামগোপালের চেষ্টায় কমিটি জনসাধারণের কাছ থেকে ৩৫০০০ টাকা চাঁদা তুলে দেন জাস্টিস অফ পিসের চেয়ারম্যানের হাতে। শ্মশান আরও বড়ো করা হয়, এই টাকায় শ্মশানের নদীর দিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয় এবং প্রাচীরের চৌহদ্দিতে ডোমদের থাকবার ঘরও তৈরি হয়।"

চিত্রঃ কলিকাতার একটি হিন্দু অগ্নিসৎকার প্রথার দৃশ্য[৫]

৫.২.২.১. একালের মৃতদেহ সৎকার ব্যবস্থা

- **অগ্নিসৎকারের উপকরণ সমূহ**

কাষ্ঠ (পূর্ণ অথবা অর্ধ), পাটকাঠি, মাটির কলসি, মাটির সরা, কাঁঠালি কলা, আতপ চাল, ঘি এবং কালো তিল।

[৫] Hindu cremation Calcutta, Welcome Library no. 664508i

চিত্রঃ ত্রিবেণী মহাশ্মশানে উল্লিখিত অগ্নিসংকারের উপকরণ সমূহ

চিত্রঃ অগ্নিসংকারের প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ

- **মৃতদেহকে বয়ে আনার জন্য প্রস্তুত বাঁশের পাটাতন**

এক্ষেত্রে দুটি বাঁশ সমান্তরাল রেখে সম আকৃতির ছোট বাঁশগুলিকে অর্ধেক চিরে ওই সমান্তরাল বাঁশদ্বয়ের উপর রেখে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য পাটাতন প্রস্তুত করা হয়।

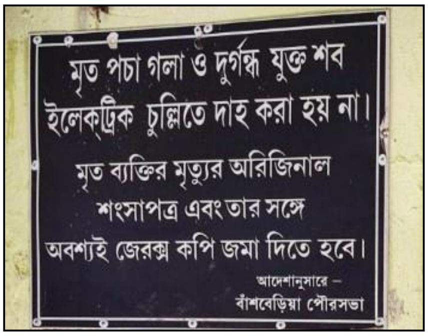

- **চিতা যার উপর প্রস্তুত করা হচ্ছে**

এক্ষেত্রে রেলের লাইনকে সমান্তরাল ভাবে রাখা হচ্ছে এবং এই সমান্তরাল পাত দুটিকে মাটি থেকে খানিক উপরে রাখার জন্য ছোট ছোট লোহার পাত সমকোণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

চিত্রঃ ত্রিবেণী মহাশ্মশানে চিতা সাজানোর প্রারম্ভিক স্থায়ী উপকরণ

৫.৩.৪. চিতার কাঠ সাজাবার পদ্ধতি

নীচে চিতার কাঠ সাজাবার পদ্ধতি চিত্রে ক্রমিক সংখ্যার মাধ্যমে পরপর উল্লেখ করা হল-

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

শ্মশানের শাস্ত্রীয় আচার

সাধারণত মৃত্যুর একদিনের মধ্যে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যদিও প্রথাগুলি পরিবর্তিত হয়। সাধারণত যে মূল শাস্ত্রীয় আচারগুলি পালন করা হয় তা হল, মৃতের শরীরকে ধৌত করা, সাদা কাপড়ে আবৃত করা যদি মৃত পুরুষ বা মৃতা বিধবা স্ত্রীলোক হয়, অথবা লাল কাপড়ে আবৃত করা, যদি মৃতা সধবা স্ত্রীলোক হয়ে থাকে[6], মৃতের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলগুলিকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় এবং কপালে লাল, হলুদ বা সাদা তিলক স্থাপন করা হয়[৭]। প্রাপ্তবয়স্কের মৃতদেহ পরিবার এবং বন্ধুদের দ্বারা নদী ধারের শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটি চিতার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ করে রাখা হয়[৫]।

এরপর একজন প্রধান শোক পালন গ্রস্ত পুরুষ, যিনি এই আচার ক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেবেন (জ্যেষ্ঠ পুত্র বা শোক পালন করবেন একজন পুরুষ অথবা একজন পুরোহিত), তিনি নিজে স্নানাদির পর শুকনো কাঠের চিতাকে প্রদক্ষিণ করবেন, মৃত ব্যক্তির মুখে তিল ও চাল রাখবেন, স্তোত্র পাঠ করবেন, মৃতের শরীরে ও চিতায় ঘি ছিটিয়ে দেবেন ও পরিশেষে তিনটি রেখা আঁকবেন, যা মৃত্যুর দেবতা যম, সময় ও শ্মশানের দেবতা কাল এবং স্বয়ং মৃত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে[৬, ৮]।

---

[৬] J Fowler (1996), Hinduism: Beliefs and Practices, Sussex Academic Press, আইএসবিএন ৯৭৮-১৮৯৮৭২৩৬০৮, pp. 59-60

[৭] Carl Olson (2007), The Many Colors of Hinduism: A Thematic-historical Introduction, Rutgers University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৮১৩৫৪০৬৮৯, pp. 99-100

[৮] Carrie Mercier (1998), Hinduism for Today, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯৯১৭২৫৪২, p. 58.

চিতা জ্বালানোর আগে, একটি মাটির পাত্র জলে ভরে তা কাঁধের উপর নিয়ে প্রধান শোককারী মৃতের শরীরকে প্রদক্ষিণ করেন এবং মৃতের মাথার কাছে এটি ভেঙে ফেলেন। চিতা জ্বলে উঠলে, প্রধান শোক পালন গ্রস্ত পুরুষ ও নিকটতম আত্মীয়রা জ্বলন্ত চিতাটিকে এক বা একাধিকবার প্রদক্ষিণ করেন। এরপর মৃতের আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি লাঠি দিয়ে মৃতের জ্বলন্ত মাথার খুলি ছিদ্র করার আচার রয়েছে যাকে কপাল ক্রিয়া বলা হয়ে থাকে।[৯]

যারা শ্মশান যাত্রী তাদের গঙ্গাস্নান করার নিয়ম আছে, কারণ শ্মশানের ক্রিয়া কর্মাদি অশুচি ও দূষিত বলে বিবেচিত হয়।[১০] শ্মশান থেকে সংগৃহীত ঠান্ডা ছাই পরে নিকটবর্তী নদী বা সমুদ্রে ফেলা হয়ে থাকে।[৭] শোক পালনের একটি নির্দিষ্ট সময় কাল পড়ে মৃতের পুরুষ আত্মীয়রা নদীতীরে মস্তক মুন্ডন করে থাকেন ও নতুন বস্ত্র পরিধান করে গৃহে ফেরেন, এরপরের দিন মৃত ব্যক্তিকে অনুষ্ঠান সহযোগে শ্রদ্ধা জানানো হয়, একে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বলা হয়।[১১]

---

[৯] Rajbali Pandey (2013), Hindu Saṁskāras: Socio-religious Study of the Hindu Sacraments, 2nd Edition, Motilal Banarsidass, আইএসবিএন ৯৭৮-৮১২০৮০৩৯৬১, page 272

[১০] George Castledine and Ann Close (2009), Oxford Handbook of Adult Nursing, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯৯২৩১৩৫৫, pages 757-758

[১১] Colin Parkes et al (2015), Death and Bereavement Across Cultures, Routledge, আইএসবিএন ৯৭৮-০৪১৫৫২২৩৬৬, pp. 66-67.

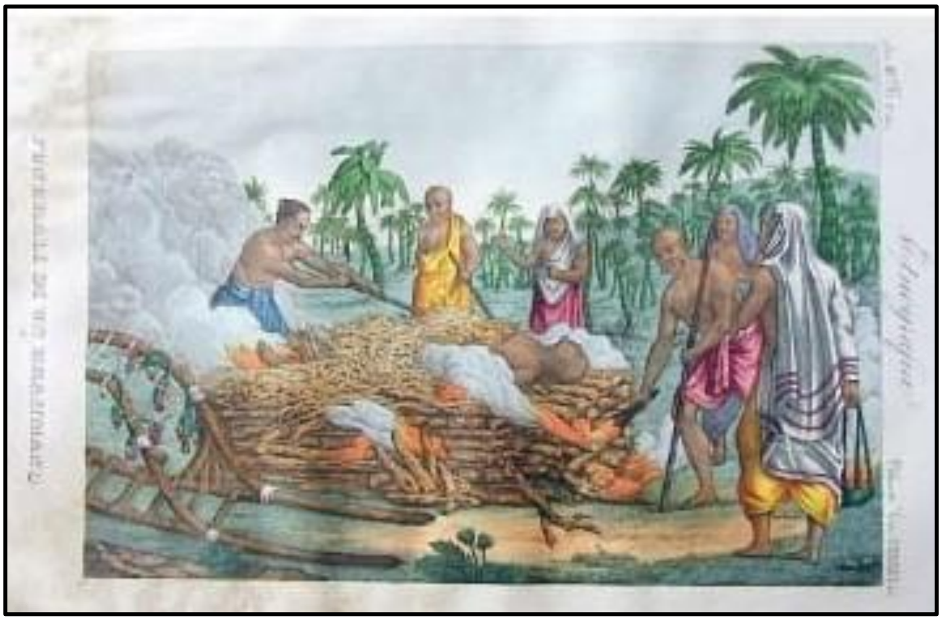

চিত্রঃ শ্মশানের আচার পদ্ধতির একটি দৃশ্য[১২]

চিত্রঃ শ্মশানের আচার পদ্ধতির একটি দৃশ্য[১৩]

[১২] "Funerali di un Brahmano," from 'Atlante Illustrato,' Florence, 1845. Source: ebay, June 2007, https://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/hinduism/burningghats/burningghats.html

[১৩] A view from 'Voyage aux Index orientales' by Pierre Sonnerat, Paris, 1782. Source: ebay, Apr. 2009, https://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00routesdata/1800_1899/hinduism/burningghats/burningghats.html

৫.২.৩. বাংলার শ্মশান

এখানে বাংলার বিশেষ বিশেষ কয়েকটি স্থানের শ্মশান ও মহাশ্মশানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। বিশেষত বাংলার কয়েকটি জেলার শ্মশান নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫.২.৩.১. কলকাতা

'গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল' – একথা সুবিদিত। পশ্চিমতীরে দাহ করলে স্বর্গে যাওয়ার সুবিধা। হিন্দুদিগের এমত সংস্কার সত্ত্বেও কলকাতার বেশীরভাগ শ্মশান কিন্তু পূর্বতীরে। কলকাতার উল্লেখযোগ্য শ্মশানঘাটগুলি হল-

ক) নিমতলা (১৮২৮)

খ) কেওড়াতলা (১৮৬০)

গ) কাশীমিত্র ঘাট (সবচেয়ে পুরনো- ১৭৭৪)

ঘ) কাশীপুর (১৮৭৪-৭৫)

ঙ) বেহালা সিরিটি (সাবর্ণ চৌধুরীর ব্যক্তিগত শ্মশান হিসেবে পরিচিত)

চ) বিরজুবালা শ্মশান (গার্ডেনরিচ)[১৪]

নিম্নে প্রধান প্রধান শ্মশানঘাটগুলির (নিমতলা, কেওড়াতলা, কাশীমিত্র ঘাট এবং কাশীপুর ঘাট) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল-

ক) নিমতলা ঘাট

রাধারমণ মিত্রের কলিকাতা দর্পণ থেকে জানা যায়, নিমতলা শ্মশান তৈরি হয় ১৮২৮ সনের মার্চ মাসে। ১৭ ই মার্চ থেকে এখানে মড়া পোড়ানো আরম্ভ হয়। আনন্দময়ী কালীর মন্দিরের

[১৪] কলকাতা শ্মশান ও কবরস্থান, মহুয়া ভট্টাচার্য, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মসমিতি।

স্থানেই নিমতলা ঘাটের অবস্থান ছিল, তখন মন্দিরটি স্থাপিত হয়নি। যেহেতু কালী মূর্তিটি শ্মশানেই ছিল তাই শ্মশানকালী নামেই তাঁকে অভিহিত করা হয়। শ্মশানের যে পাশটিতে এখন স্ট্র্যান্ড রোড, শোনা যায় গঙ্গা আগে সেখানেই প্রবাহিত হত। তারপর স্ট্র্যান্ড রোড তৈরি হওয়ার সময় শ্মশানটি উঠে যায় কালীমন্দিরের সোজা পশ্চিমে, গঙ্গার ধারে। বর্তমান নিমতলা মহাশ্মশানের দক্ষিণে। এই শ্মশানটি লম্বায় ছিল ১৬০ ফুট ও চওড়ায় ছিল ৯০ ফুট। এই শ্মশানের তিনদিক উচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। শুধুমাত্র গঙ্গার দিকটিই খোলা ছিল। রাণী রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস এই স্থানের দক্ষিণে গঙ্গাযাত্রীদের থাকার জন্য পাকা ঘরের ব্যবস্থা করে দেন। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সেকালে ঘরে মরতে দেওয়া হত না। তাই মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে তখনকার দিনে গঙ্গাযাত্রা করনো হত। এদের আশ্রয়ের জন্য গঙ্গার ধারে কোন পাকা ঘর থাকলে সেই ঘরে তাদের রাখা হত, যতদিন না তাদের মৃত্যু হয়। সেকালের অনেক পুণ্যলোভী বড়লোক গঙ্গার ধারে এইরূপ গঙ্গাযাত্রীদের জন্য ঘর তৈরি করে দিতেন।

এই নিমতলা শ্মশানঘাটে মানুষের মৃতদেহের সাথে সাথে জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহও এনে জড়ো করা হত। ১৮৩৭ সন থেকে কলকাতার প্রত্যেক বিভাগে কয়েকটি ডোম নিযুক্ত করা হয়েছিল, যারা নিজ নিজ এলাকা থেকে জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহ গরুর গাড়ি করে এনে নিমতলা শ্মশানঘাটের সামনে এনে জড়ো করত। ১৮৫৬ সনে ৩২৬৩ টাকা খরচ করে নিমতলা ঘাটের উত্তরে গোলাবাড়ি ঘাট তৈরি করা হয়। পরবর্তিকালে নিমতলা ঘাটের পরিবর্তে এই ঘাটেই জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহ এনে জড়োকরা হত। ১৮৫৭ সনে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা ৬১৮০ টাকা খরচ করে নিমতলা শ্মশান ঘাটের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন, তন্মধ্যে বাবু রাজনারায়ণ দত্ত ২৫০০ টাকা দেন। মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা ও গঙ্গা দূষণ সমস্যা রোধ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তিকালে ১৮৬৫ সনে জনসাধারণের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা তুলে তা দিয়ে নিমতলা শ্মশানকে আরও বড় করা হয়। নদীর দিকটা দেওয়াল

দিয়ে ঘিরে ভিতরে ডোমদের থাকার জন্য ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়। এর পরবর্তিকালে ১৮৭৫ সালে পোর্ট কমিশনারদের নালিশে বর্তমান জায়গায় নতুন করে ত্রিশ হাজার টাকা খরচা করে ম্যাকিন্টশ বার্ন কোম্পানীকে দিয়ে নতুন নিমতলা শ্মশান তৈরি করা হয়, যেহেতু পূর্ববর্তি স্থানে শ্মশান থাকায় রেল চলাচলের পথে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছিল। এই টাকার মধ্যে ২৫ হাজার টাকা দেন পোর্ট কমিশনাররা আর বাকি ৫ হাজার টাকা দেন জাস্টিসেরা। এটি নিমতলার তৃতীয় শ্মশান। এরপর, ১৮৯১-৯২, ১৮৯২-৯৩, ১৮৯৪-৯৫, ১৯০৫-০৬, ১৯১২-১৩ ও ১৯১৩-১৪ সনে মোট ১৭ হাজার টাকা খরচ করে শ্মশানের উন্নতি সাধন করা হয় এবং শ্মশানের আয়তন বেড়ে দাঁড়ায় এক বিঘে। দর্মাহাটা স্ট্রিটের এক কাঠ ব্যবসায়ী বাবু গিরীশচন্দ্র বসু ১৮৯৫ সনে বর্তমান নিমতলা শ্মশান ঘাটের দক্ষিণে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য পাকা দোতলা বাড়ি নির্মাণ করে দেন। এইভাবে শ্মশান ঘাটের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার ক্রমে উন্নতিসাধন করা হয় ও গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়।

চিত্রঃ ১৮৮০ সালের নিমতলা শ্মশানঘাট এর একটি অংশ[১৫]

---

[১৫] https://www.pinterest.fr/pin/hindu-burning-ghat-in-calcutta-kolkata-c1880s--509399407822663966/

খ) কেওড়াতলা মহাশ্মশান

'অষ্টাদশ শতাব্দীতে কালীঘাট অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এই অঞ্চলে একটি শ্মশানঘাটের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই সময় কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন একটি ঘাটে শবদাহ করা হত। বর্তমানে এই ঘাটটিই তর্পনঘাট নামে পরিচিত। কিন্তু এখানে শবদাহ করা ছিল অত্যন্ত অসুবিধা জনক। শবদাহের সময় কালো ধোঁয়ায় মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন অঞ্চল ভরে যেত। কলকাতা পৌরসংস্থা স্থাপিত হওয়ার পর এই ঘাটে শবদাহ বন্ধ হয়ে যায়। দাহকার্যের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে ১৮৬২ সালে কালীঘাট মন্দিরের অদূরে দুই বিঘা জমির উপর বর্তমান শ্মশানঘাটটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যস্থলে কালীমন্দির, ঈশান কোণে নকুলেশ্বর ভৈরব মন্দির ও নৈঋত কোণে শ্মশানঘাটের অবস্থিতির কারণে এই অঞ্চলটি পবিত্র বলে পরিগণিত হয়।

তবে কেওড়াতলা শ্মশানের অবস্থা এককালে অত্যন্ত খারাপ ছিল। দাহকার্যের পোড়া কাঠকয়লা ও ভস্ম জমে জমে জায়গাটি অপরিচ্ছন্নতার চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছায়। শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামেরও উপযুক্ত জায়গা ছিল না। কালীমন্দিরের সেবায়েত গঙ্গানারায়ণ হালদারের স্ত্রী বিশ্বময়ী দেবী সর্বপ্রথম শ্মশানের উন্নয়নে মনোযোগ দেন। তিনি প্রথমে শ্মশানঘাটটি বাঁধিয়ে দেন এবং পরে শ্মশানযাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার ও শ্মশানের একটি সুদৃশ্য প্রবেশদ্বার নির্মাণ করিয়েছিলেন। শ্মশানের উন্নয়নে কলকাতা হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক বরিশালনিবাসী শশিভূষণ বসুর ভূমিকাও স্মরণীয়। তিনি পিতার স্মৃতিতে শ্মশানে একটি বিরাট বাড়ি নির্মাণ করে দেন। রাতে শবদাহের সুবিধার জন্য গ্যাসের আলোর ব্যবস্থাও করেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের তদনীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই শ্মশানের আধুনিকীকরণে উদ্যোগী হন।

২০০৪ সালে কলকাতা পৌরসংস্থা কেওড়াতলা মহাশ্মশান সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই প্রকল্পে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে সাজানো হয় বৈদ্যুতিক চুল্লি ও উদ্যান। ২০০৫ সালের গোড়ার দিকে শ্মশানের নতুন তোরণ নির্মিত হয় ও ঘাটগুলির সংস্কার করা হয়। নবপর্যায়ে সৎকারের জন্য চারটি চিতা নির্মিত হয়। শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে পরিত্যক্ত কাঠের চুল্লির শ্মশানটি এখন অযত্ন ও অবহেলার শিকার[১৬]।' এই শ্মশানে কলকাতার প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অগ্নিসৎকার হয়। তাঁর সমাধিসৌধটি কলকাতার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এখানে রানী রাসমণি-কে দাহ করা হয়। এছাড়াও সমগ্র শ্মশানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ছোটো বড়ো স্মৃতিফলক ও স্মৃতিসৌধ। কেওড়াতলা মহাশ্মশানের সার্বজনীন শ্মশানকালীর পূজা প্রসিদ্ধ[১৭]।

চিত্রঃ কেওড়াতলা মহাশ্মশান[১৮]

[১৬] *কালীক্ষেত্র কালীঘাট*, সুমন গুপ্ত, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৪৫-৪৬

[১৭] https://bn.wikipedia.org/wiki/কেওড়াতলা_মহাশ্মশান

[১৮] https://www.google.com/localservices/prolist?spp=CgsvZy8xdHFuazBqZg%3D%3D&scp=CgAaH0tlb3JhdG9sYSBNYWhhc2FzaGFuIChLYWxpZ2hhdCkqH0tlb3JhdG9sYSBNYWhhc2FzaGFuIChLYWxpZ2hhdCk%3D&q=Keoratola+Mahasashan+(Kalighat)&src=2&slp=UhMIARIPEg0iCy9nLzF0cW5rMGpm#ts=4

গ) **কাশীমিত্র ঘাট**

রাধারমণ মিত্রের কলিকাতা দর্পণ থেকে জানা যায়, ঘাটটির আসল নাম কাশীশ্বর মিত্রের ঘাট। রুদ্রেশ্বর মিত্র ছিলেন টালার বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার স্বর্গীয় নীলমণি মিত্রের প্রপিতামহ। এই রুদ্রেশ্বর মিত্র এর ছোট ভাই হলেন কাশীশ্বর মিত্র। মহা ধনী কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের চার পত্নির কারুরই সন্তান না হওয়ার দরুণ তিনি তাঁর সব অর্থ সৎকাজে ব্যায় করতেন। ১৭১৪ সনে তিনি গঙ্গার ধারে একটি শবদাহ ঘাট তৈরি করিয়ে দেন। গোড়ার দিকে অবস্থাপন্ন হিন্দুরা এই ঘাট ব্যবহার করতেন। পরের দিকে গরীব মানুষ ও হাসপাতালের কাটা ছেঁড়া মরাও এই ঘাটে পোড়ানো হয়েছে। এই ঘাটের কাছেই পূর্ব দিকে তাঁর বড় বাড়ি ছিল ও কাছেই একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুরুতে এই ঘাটের আয়তন ছিল নয় কাঠা। ১৮৮২-৮৩ সনে বাবু অক্ষয়চন্দ্র গুপ্ত নিজখরচে এখানে গঙ্গাযাত্রীদের জন্য একটি আবাস তৈরি করে দেন। শোনা যায় এই ঘাট থেকেই ১৮৫৪ সনে ৩৯৮২ টি মানুষের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়[১৯]।

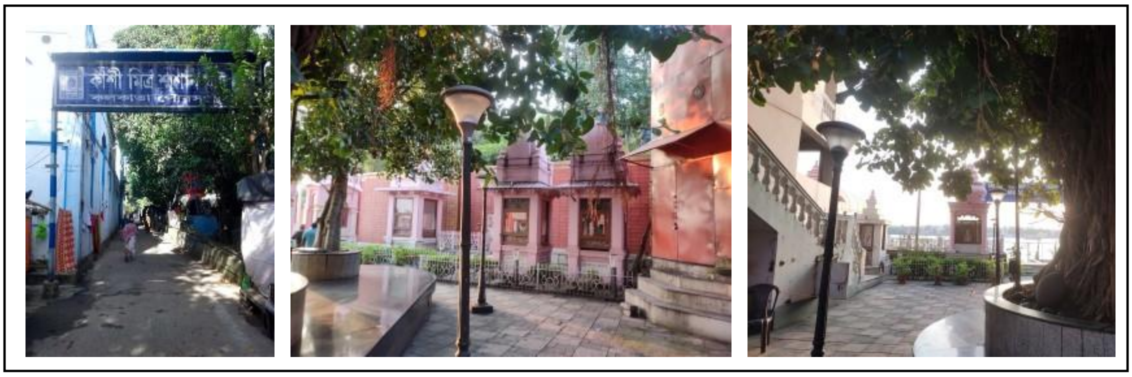

চিত্রঃ কাশী মিত্র শ্মশানঘাট[২০]

[১৯] রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা দর্পণ, প্রথম পর্ব, সুবর্ণরেখা, পৃষ্ঠা ২৬৫।

[২০] https://www.google.co.in/search?hl=en-in&cs=1&output=search&q=Kashi+Mitra+Burning+Ghat&ludocid=15045821809778348994&gsas=1&client=safari&lsig=AB86z5Wjm5gX1L79QuwQAu4G9_OV&shem=lsslc&kgs=06f789f5c6e13b24&shndl=-1&source=sh/x/kp/local/3&entrypoint=sh/x/kp/local#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D,ik:CAoSLEFGMVFpcFBzODNjNVBwYlpKLWFBcEZEOVVFZElKN21PNEhsdlJCOGN4Xzhz

ঘ) কাশীপুর শ্মশানঘাট

রাধারমণ মিত্রের কলিকাতা দর্পণ থেকে জানা যায়, কাশীপুর শ্মশানঘাট এর অবস্থান প্রামাণিক ঘাটের দক্ষিণে। প্রামাণিক ঘাটটি কাশীপুরের সর্বোত্তর রাস্তা প্রামাণিক ঘাট রোডের শেষে অবস্থান করছে। এই শ্মশানের দেওয়ালে লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে কাশীপুর শ্মশানঘাটটি নড়ালের জমিদার বাবু ও তার ভ্রাতা কর্তৃক বিনামূল্যে প্রদত্ত জমিটির উপর নির্মিত। নির্মাণ করেছেন কলকাতা শহরতলির মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ ১৮৭৪-৭৫ সনে, হিন্দু সম্প্রদায় গণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে[২১]। যে সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিগণকে এই শ্মশানে দাহ করা হয় তাদের স্মৃতি ফলকগুলি এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। নিচে সেগুলি উল্লেখ করা হল।

॥ ক ॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।
(সন ১২৪২-১২৯৩)
ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়
কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশ্মশান
তীর্থ-বন্দনা
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি
১৯ ফাল্গুন, ১৩৬৩
৩রা মার্চ, ১৯৫৭
রবিবার

॥ খ ॥ স্বামী অভেদানন্দ
In Memory of
Srimat Swami Abhedananda
Direct disciple of
Sri Ramakrishna Paramahamsa
Advent October 2, 1866, Ascension September 8, 1939
Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta.

[২১] রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা দর্পণ, প্রথম পর্ব, সুবর্ণরেখা, পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮।

॥ গ ॥ Swami Krishnananda
Disciple of
Sri Ma Sarada Devi
(1890-1963)
শ্রীমা সারদাদেবীর শিষ্য
স্বামী কৃষ্ণানন্দ (জঙ্গলীবাবা)
১২৯৭-১৩৭০

॥ ঘ ॥ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
সন্ন্যাসিনী শিষ্যা
গৌরীমাতা
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের উদ্যোগে স্থাপিত — ১৩৪৫

Gouri-Mata
Disciple of Sri Sri Ramakrishna Deva
And
Founder of Saradeshwari Asram
মহাসমাধি
১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ সাল, মঙ্গলবার
অমাবস্যা।

॥ ঙ ॥ Durga Mata
Disciple of Sri Sri Saradeshwari Devi
জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীর
সন্ন্যাসিনী শিষ্যা
দুর্গামাতা
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের উদ্যোগে স্থাপিত — ১৩৭২।
মহাসমাধি
২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৭০ (১৯৬৩)
বৃহস্পতিবার, শ্যামা চতুর্দশী

॥ চ ॥ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা সহচর
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
"শ্রীম" (মাষ্টার মহাশয়)

জন্ম	মহাসমাধি
৩১শে আষাঢ়	২১শে জ্যৈষ্ঠ
১২৬১ সাল	১৩৩৯

'OM'
Sri Mahendra Nath Gupta
"M"
The Evangelist
Apostle of Sri Ramakrishna Avatar
Birth July 14th 1854 Passed Away June 4th 1932

॥ ছ ॥ নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী
স্মৃতিরক্ষা কমিটি নিবেদিত,
সঙ্কাবী (নাট্যসংস্থা) আয়োজিত
উম্মোচক—মাননীয় শিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি.)
৩০শে জুন ১৯৭৭
—ওঁ নমো নটনাথায়—

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী
জন্ম—২রা অক্টোবর ১৮৮৯। মৃত্যু—৩০শে জুন ১৯৫৯
প্রতিষ্ঠাদিবস ২রা অক্টোবর ১৯৬৯
কলিকাতা পৌরসভা

॥ জ ॥ ৺শিশির আচার্য্যের মহাপ্রয়াণে শেষবাণী—
"মোর যত সাধনা এ জীবনে,
শেষ হল শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে।"
জন্ম ১৮৯৩ মৃত্যু ১৯৭০
রাজসাহী সোদপুর

॥ ঝ ॥ অগ্নিযুগে আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট সভ্য,
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী,
স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্ভীক যোদ্ধা—নিত্যানন্দ অবধূতের
মন্ত্র-শিষ্য বীরবিপ্লবী খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মরণে
জন্ম ১২৯৬ সাল মৃত্যু ১৩৪৬ সাল
১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে পৌষ

চিত্রঃ দেশবরেণ্য নর নারীগণ, যাঁদের কাশীপুর শ্মশানঘাট এ দাহ করা হয়েছিল (ক-ঝ)[২২]

[২২] রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা দর্পণ, প্রথম পর্ব, সুবর্ণরেখা, পৃষ্ঠা ২৫৮-২৬০।

চিত্রঃ কাশীপুর শ্মশানঘাট[২৩]

“পরিবেশের দূষণের হাত থেকে বাঁচতে, কাঠের অপচয় রোধে শবদাহের ভাল ব্যবস্থা ইলেক্ট্রিক চুল্লি। এ ব্যবস্থা চালু হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ১৯৫৬ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর। উদ্বোধন করেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ১১ ও ১২ তারিখে হিন্দু সৎকার সমিতি আনীত বেওয়ারিশ লাশ দাহ করা হয়। ১৩ ই সেপ্টেম্বর, ১০ নং রাজা বসন্ত রায় রোড নিবাসী জনৈকা উষাপ্রভা ব্যানার্জ্জীকে প্রথম ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে দাহ করা হয়। নিমতলা ঘাটে প্রথম ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে দাহ করা আরম্ভ হয় ১৯৭৫ সালে ১৪ ই জানুয়ারী। প্রথম দাহ করা হয় কানাইলাল গোস্বামীকে, ঠিকানা ২৬/৭, দমদম রোড, কলকাতা-২। কাশীপুর চুল্লিতে (বৈদ্যুতিক) দাহ করা আরম্ভ হয় ১৯৮৯ সালে ২২ এ ফেব্রুয়ারী। কাশীমিত্র শ্মশান ঘাটে ১৯৯০ সালে ৯ ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিক ভাবে ইলেক্ট্রিক চুল্লির উদ্বোধন করা হয়। বেহালার সিরিটি শ্মশানে এ ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৯০ সালের ২০ এ জুন। ”

[২৩] https://www.google.co.in/search?hl=en-in&cs=1&output=search&q=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0+%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A8&ludocid=12884054192658402821&gsas=1&client=safari&lsig=AB86z5XyjfqHncOTygACvrpFhGz9&shem=lsslc&kgs=228b78838f95311b&shndl=-1&source=sh/x/kp/local/3&entrypoint=sh/x/kp/local#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D,ik:CAoSLEFGMVFpcE1uZ0p5LUx1MWtFUU0zbWtkVkl6Y1hEa1NiTXRFUU9XMkRDZmJC

৫.২.৩.২. উত্তর ২৪ পরগণা

ক) বসিরহাট শ্মশান

খ) বাদুড়িয়ার শ্মশান

গ) টাকীর শ্মশান

ক) **বসিরহাট শ্মশান**

বসিরহাটে একাধিক কবর খোলা থাকলেও শ্মশান কিন্তু একটি। যেহেতু মুসলিম অধ্যুষিত শহর ছিল তাই এর কারণটা না বোঝার কোন অসুবিধা নেই। যদিও আশে পাশে আরও কতকগুলি শ্মশানের অস্তিত্ব আছে। যেমন ইটিন্ডার শ্মশান। কিন্তু বাস্তবে এটা ধৈলতিথা মৌজায় অবস্থিত। এরপর উল্লেখ্য শহর বসিরহাটের উপকণ্ঠে অবস্থিত ধান্যকুড়িয়া শ্মশান। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গ্রন্থাগারিক ছিলেন পুরন্দর মন্ডল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পুরন্দরের কর্মদক্ষতায় খুশী হয়ে তাকে ধান্যকুড়িয়ার পত্তনি দান করেন। মূলত মন্ডল, গাইন ও বাইন পরিবার অধ্যুষিত ধান্যকুড়িয়ার নেহালপুর মৌজার বিদ্যাধরী শাখা নদীর ধারে ১৮৭০ এর দশকের প্রথমভাগে গাইনদের জমিতে এবং বাইনদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা হয় ধান্যকুড়িয়া শ্মশান। জনশ্রুতি, এখানে এখনও বেওয়ারিশ লাশ গোপনে পোড়ানো হয়। বসিরহাট অঞ্চলের অধিকাংশ শ্মশান দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত, তার কারণ, জনশ্রুতি অনুযায়ী ইছামতির বাম প্রান্তে যমুনার জল বয়ে যায়, আর দক্ষিণপ্রান্তে গঙ্গানদী অবস্থিত। সেই কারণেই নাকি দক্ষিণপ্রান্তে শ্মশানের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।[২৪]

---

[২৪] বসিরহাটের কবরস্থান ও শ্মশান, চয়ন দেব, প্রথম পর্ব, জেলা পরিক্রমা স্বদেশর্চচা লোক, পৃঃ ২৭২-২৭৪।

চিত্রঃ বসিরহাট শ্মশান[২৫]

খ) **বাদুড়িয়ার শ্মশান** (বাদুড়িয়া সীতানাথ শ্মশানঘাট)

বাদুড়িয়ার শ্মশানঘাটটির নির্মাতা ছিলেন ধান্যকুড়িয়া নিবাসী ব্যবসায়ী সীতানাথ মণ্ডল। বার্মা সেগুন, ধান, পাট ও গুড়ের ব্যবসায়ে ব্রিটিশ আমলে তিনি পূর্ব বাংলা ও বসিরহাট মহকুমা অঞ্চলে সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁর জনহিতকর কাজগুলির মধ্যে একটি হল ইছামতির তীরে শ্মশানঘাট নির্মাণ। সে সময়ে যত্রতত্র হিন্দু শবদেহ দাহ করা হত। আনুমানিক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে শ্মশান ঘাটটি নির্মাণ করা হয় বলে জানিয়েছেন সীতানাথ মণ্ডল এর নাতি প্রাক্তন নির্মলকুমার মন্ডল। শ্মশান ঘাটটি জে.এল.নং- ৬৮ ও আরশুলা মৌজায় অবস্থিত এবং এর আয়তন ২৫ শতক। বর্তমানে এই জমি ১নং খতিয়ান ভুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নথিভুক্ত হয়েছে ও সরকারি কাগজে লিখিত আছে, "শ্মশানঘাট হিন্দু ব্যবহার যোগ্য"[২৬]।

---

[২৫] https://www.google.co.in/search?hl=en-in&cs=1&output=search&q=Shoshan+Ghat(Burning+Ghat)&ludocid=15513522789420578474&gsas=1&client=safari&lsig=AB86z5WNWuSFZjq9TbZxEgBtEcqc&shem=lsslc&kgs=ef44e26c943b33c4&shndl=-1&source=sh/x/kp/local/3&entrypoint=sh/x/kp/local#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D,ik:CAoSLEFGMVFpcE1aRy1rbmhEaTloTDM0VGxKcWRfMEd2OUdod1F3OG9IT1VqSjVf

[২৬] বাদুড়িয়ার শশান-কবরস্থান-সমাধিক্ষেত্র, শৈলেন্দ্রনাথ কাবাসী, প্রথম পর্ব, জেলা পরিক্রমা স্বদেশর্চর্চা লোক, পৃঃ ২৮৭।

চিত্রঃ বাদুড়িয়া সীতানাথ শ্মশানঘাট[২৭]

গ) **টাকীর শ্মশান**

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত টাকী পৌরসভার পত্তন হয় ১৮৬৯ সালে। বাংলাদেশের প্রায় সীমানায় অবস্থিত এই পৌরসভার অন্তর্গত দুটি শ্মশান ও একটি কবরস্থান আছে।

- এর মধ্যে একটি শ্মশানঘাট স্বর্ণময়ী শ্মশানঘাট নামে পরিচিত। টাকীর জমিদার পরিবার নিজ প্রয়োজনে নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তিকালে এই শ্মশানঘাটটি তারা স্বতপ্রণোদিত হয়ে পৌরসভার হাতে তুলে দেন। এটি বর্তমানে ৫ নং ওয়ার্ডে ঘোষবাবুর পাড়ার শেষে অবস্থিত। জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল-

  জমির পরিমাণ- ৩১ শতক

  জমির রকম- শ্মশান, অত্রস্বত্বের নিজ দখলীর জমি

  মন্তব্য- দালান-১ প্রঃ স্বর্ণময়ী শ্মশানঘাট

[২৭] https://www.google.co.in/search?hl=en in&cs=1&output=search&q=Sitanath+Ghat+(Baduria+Shashan)&ludocid=8425463934189112542&gsas=1&client=safari&lsig=AB86z5UeFGoSxdMUmLbFwkZx7WMC&shem=lsslc&kgs=5a7b486989563854&shndl=-1&source=sh/x/kp/local/3&entrypoint=sh/x/kp/local#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D,ik:CAoSLEFGMVFpcE9iOWRrT1pwY1VEM1VLN3ZFc0lRUVcxYWNSM0xpN0x3MThRNWlk

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, টাকী পৌরসভা মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা ভেবে স্বর্ণময়ী শ্মশানঘাট এর লাগোয়া মানসিংহ রোডের ধারে একটি কবরস্থান নির্মাণ করেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বিশ্বাস করেন, কবরস্থানের পাশে মসজিদের অবস্থান ভীষণ ভাবে প্রাসঙ্গিক। মসজিদ থেকে আগত নামাজ অথবা আজানের শব্দে মৃতদেহ পবিত্র থাকে এবং আল্লার কৃপা পায়। কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু আল্লার এই কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই এই কবরস্থানটিতে দাবিহীন মৃতদেহ বা অপঘাত মৃত্যু ছাড়া সচরাচর কবরের কাজ হয় না। তবে স্বর্ণময়ী শ্মশানঘাটটিতে এর কোন প্রভাব পড়েনি।

- অপরটি বেঁওকাটি শ্মশানঘাট নামে পরিচিত। বহু পুরানো আমলের এই শ্মশান ঘাটটি অকেজো হয়ে পড়ে একসময়, পরবর্তিকালে টাকী পৌরসভার তৎপরতায় শ্মশানঘাটটির সংস্কার হয়। শ্মশানঘাটটির বর্তমান অবস্থান টাকী পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড, জে.এল.নং-৪৮, দাগ নং-২০৫,৩৪০[২৮]।

[২৮] টাকীর শ্মশান ও কবরস্থান, মৃন্ময় সমীরণ নন্দী, প্রথম পর্ব, জেলা পরিক্রমা স্বদেশ্চর্চা লোক, পৃঃ ২৮৯।

চিত্রঃ টাকী স্বর্ণময়ী শ্মশানঘাট[২৯]

৫.২.৩.৩. হুগলী

হুগলীর উল্লেখযোগ্য শ্মশানঘাটগুলি হল-

ক) ত্রিবেণী শ্মশান ঘাট

খ) বোড়াইচন্ডীতলা শ্মশান

নিম্নে ঘাটগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

---

২৯ https://www.google.co.in/search?hl=en-in&cs=1&output=search&q=Taki+Samshan+Ghat+(Crematory)&ludocid=16784937357420568928&gsas=1&client=safari&lsig=AB86z5U7yc81eziqQjeG50lJw07n&shem=lsslc&kgs=6f64a7074409e3b3&shndl=-1&source=sh/x/kp/local/3&entrypoint=sh/x/kp/local#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D,ik:CAoSLEFGMVFpcE01MTZhYUxZaXhCUmhUcVpDdTNGd2gzNEp4emZHR3VUOC02SUE2

ক) **ত্রিবেণী শ্মশান ঘাট**

'গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত এই ত্রিবেণী শ্মশান ঘাট। আনুমানিক ৩০০ বছরের পুরনো এই শ্মশানে শুধু শবদাহ নয়, পূণ্যার্জনে তীর্থ করতে আসেন বহু পূণ্যার্থী। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার অধীন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে এই শ্মশানঘাটে আগে চিরাচরিত পদ্ধতিতে কাঠের চিতায় মৃতদেহ সৎকার হতো। ১৯৭৬ সালে পুরসভার পক্ষ থেকে প্রথম একটি বৈদ্যুতিন চুল্লি বসানো হয়। তার ফলে দূর দূর থেকে আসা শবযাত্রীরা তুলনায় অল্প সময়ে মৃতদেহ সৎকার করে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু তাতেও চাপ সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা না করে অনেকেই কাঠের চিতায় শবদাহের কাজ সেরে ফিরে যেতেন। এই অবস্থায় একটি মাত্র বৈদ্যুতিন চুল্লির উপর চাপ কমাতে এবং শবযাত্রীদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে ২০০৩ সালে দ্বিতীয় চুল্লি তৈরি করে পুরসভা। সেই থেকে দু'টি বৈদ্যুতিন চুল্লি এবং সাধারণ কাঠের চিতায় শবদাহ চলছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়ছে, সারা দিনে ২৫ থেকে ৩০টি মৃতদেহ সৎকার হয় এখানে। বৈদ্যুতিন চুল্লিতে শবদাহের খরচ কম হলেও অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী তিন নদীর সঙ্গমস্থলে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বৈদ্যুতিন চুল্লিতে সৎকারের জন্য খরচ পড়ে ৬৫০ টাকা। কিন্তু কাঠের চিতায় খরচ প্রায় দ্বিগুণ, এগারোশো থেকে পনেরোশো টাকা। হুগলি ছাড়াও হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, আসানসোল, ধানবাদ, ঝাড়খন্ড, বিহার এমনকী অসম থেকেও মৃতদেহ সৎকারের জন্য এই শ্মশানে আনা হয়'[৩০]।

---

[৩০] https://www.anandabazar.com/west-bengal/howrah-hoogly/two-furnaces-out-of-order-in-tribeni-crematorium-creating-trouble-1.146911

চিত্রঃ ত্রিবেণী শ্মশান ঘাট ও তৎসংলগ্ন স্থান

খ) **বোড়াইচন্ডীতলা শ্মশান**

১৮৭০ সালে চন্দননগরে গঙ্গায় বাঁধা-ঘাটের সঙ্খ্যা ছিল ২৯ টি। সতীদাহের জন্য বিখ্যাত ছিল বোড়াইচন্ডীতলা শ্মশান। ১৭৮৫, ১৭৯০ এবং ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে শেষ সতীদাহ হয় বোড়াইচন্ডীতলা শ্মশানে। পাশাপাশি চলত দাস ব্যবসা। ফরাসীদের প্রচেষ্টায় চন্দননগরে বন্ধ হয় সতীদাহ প্রথা। গভীর অন্ধকারে বিপ্লবীদের আসা যাওয়ার পথ ছিল এই শ্মশান। পন্ডিচেরী যাবার আগে ঋষি অরবিন্দের নৌকা এসে ভিড়েছিল এই শ্মশানে। এসেছিল বরেণ্য দেশপ্রেমিকের দল।[৩১]

[৩১] বোড়াইচন্ডীতলা শ্মশান, কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রথম পর্ব, জেলা পরিক্রমা স্বদেশচর্চা লোক, পৃঃ ৫১০।

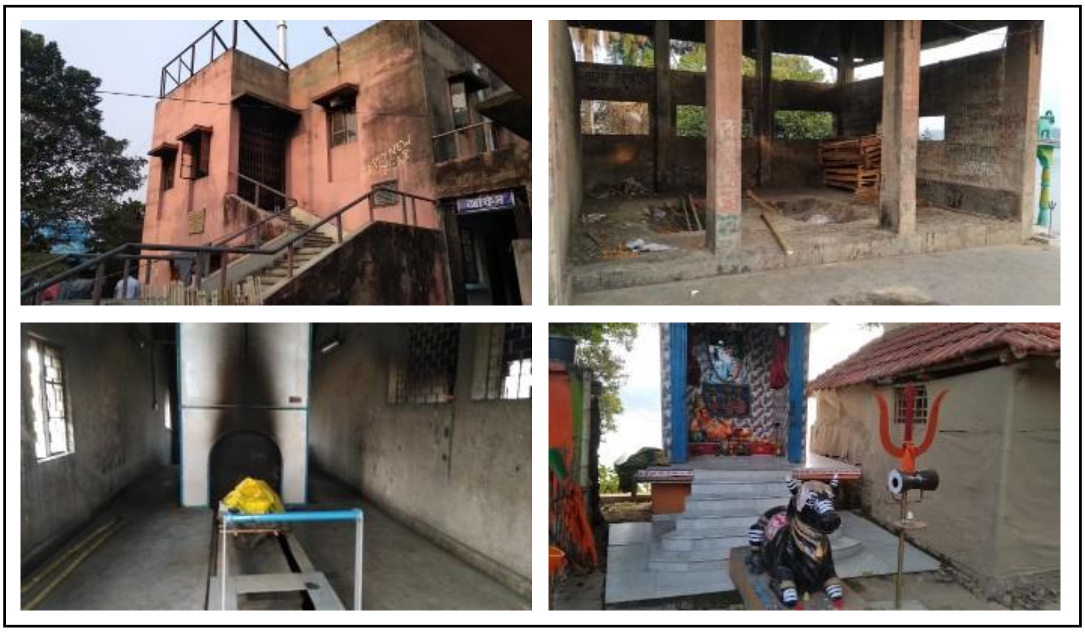

চিত্রঃ বোড়াইচন্ডীতলা শ্মশান [৩২]

৫.২.৪. শবদাহ ঘাটের বিবর্তন ও নান্দনিকতার বাস্তবতা

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, আধুনিক শবদাহ ঘাটের যে পরিকল্পানা (বা অনেক ক্ষেত্রে যা বাস্তবায়িত) তা শবদাহ ব্যবস্থার সমগ্র ভাবনাটিকেই নান্দনিকতা দান করেছে। যেমন আধুনিক স্থাপত্য নকশায় শবদাহ ঘাটের নির্মান চিন্তার মধ্যে মৃত্যুর দার্শনিকতার যে প্রভাব তা এই উক্তির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে, “lamenting the lost, the built forms are shaped in such a way that; Pavilions *embrace* to console the loved ones, waiting halls

[৩২] https://www.google.co.in/search?q=Borai+Chanditala+burning+ghat&client=safari&hl=en-in&cs=1&sxsrf=ALiCzsYFh-n7Vthpjv0TY5xj6YRGB2IGrA%3A1670187815461&ei=JwuNY4zkG4TM3LUPvMSS8AM&ved=0ahUKEwjMk8u77uD7AhUEJrcAHTyiBD4Q4dUDCA8&uact=5&oq=Borai+Chanditala+burning+ghat&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCCEQoAEQCjIHCCEQoAEQCjoICAAQgAQQsAM6CAgAEIYDELADOgUIABCABDoCCCY6BQgAEIYDOgUIIRCgAUoECEEYAUoECEYYAFCZCFiQMGCiNmgBcAB4AIAB-QGIAc8WkgEGMC4xLjEymAEAoAEByAEEwAEB&sclient=gws-wiz-serp#lpg=cid:CgIgAQ%3D%3D,ik:CAoSLEFGMVFpcFBDVlFzTlpEMzA1c0FxY1J6cm9jblQwWWVjNnk4S0t1VVpOQ1lz

silently bow in honour, & Pyres open up to *liberate* the lost in a farewell"[৩৩].

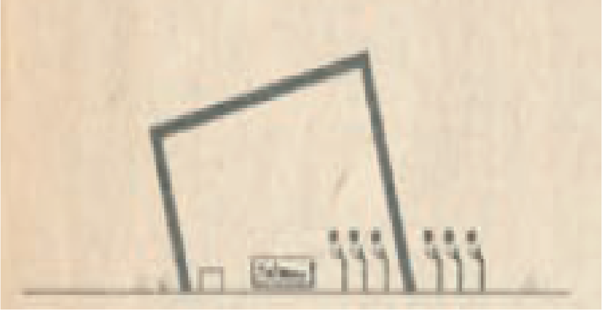

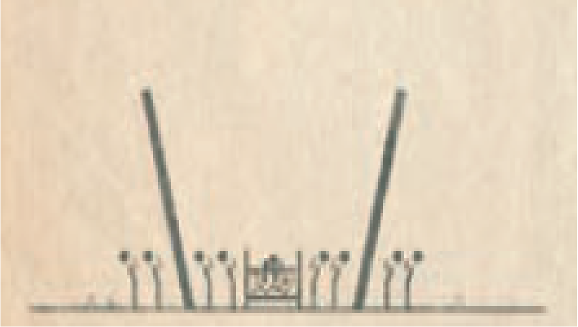

চিত্র ১৮: Prayaschitta Karma, Ekoddista-Sraddha, Sthalashuddhi places- iconic & actual view [৩৪]

[৩৩] Ar Krishna Chaitanya Dommu, MAHAPRASTHANAM,Journal of the Indian Institute of Architect, March 2017 Vol 82, Issue 02
[৩৪] Ar Krishna Chaitanya Dommu, MAHAPRASTHANAM, Journal of the Indian Institute of Architect, March 2017 Issue

এক সময় পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা ও ঔপনিবেশিক শাসকদের অভিযোগ ছিল ভারতীয় শবদাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও নান্দনিকভাবে বীভৎস। কিন্তু আধুনিকভাবে শবদাহ ঘাটগুলি সংস্কার করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ও বাস্তবায়িত করা হচ্ছে, তা শুধুমাত্র নান্দনিকভাবে স্থাপত্যা শিল্পকে উত্তরণ করে তাই নয়, দেশিয়ভাবে স্থাপত্য শিল্পের মাধ্যমে মৃত্যু উত্তরন পথকেও বিমূর্ত রুপকল্পনা দান করে।

৫.৩. শ্মশান সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস

উনিশ শতকের সমাজবীদরাও শ্মশানচিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। কালীপ্রসন্ন ঘোষ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাদের বিভিন্ন লেখায় কখনও সরাসরি কখনও পরোক্ষ ভাবে শ্মশান চিন্তার বা শ্মশানের মধ্যে দিয়ে যে দেহের অন্তিম সৎকার হয় তা তুলে ধরেছেন। আর এই দেহের অন্তিমতাকে নিয়ে উনিশ শতকের চিন্তা চেতনার ইতিহাসে বিশেষ স্থান বা বর্গের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শ্মশানের ইতিহাস এক ধরনের ঐতিহাসিক ‘Space and histiriocity’ এর জন্ম দেয়, যা বর্ণহিন্দুর পাবলিক, প্রাইভেট শোকের সংজ্ঞাটিকে প্রতিরোধ করে অর্থাৎ উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের কাঠামোতে বর্ণহিন্দু সমাজের যে নাগরিক চেতনা, শ্মশানের গল্প ও তার সম্পর্কিত অনুগল্প, তা সেই চেতনার পূর্ণতাকে বিচ্ছিন্ন পরিচিতির মাধ্যমে এক লৌকিক (general) বর্গ নির্মাণ করায় যা সামাজিকতার বৃত্তায়ণকেই পূর্ণতা দেয়।

এ প্রসঙ্গে শ্মশানকালী সম্পর্কে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। শ্মশানকালী পূজা সাধারণত শ্মশানঘাটে হয়ে থাকে। এই দেবীকে শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করা হয়। তন্ত্র সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীস রচিত বৃহৎ তন্ত্রসার অনুসারে এই দেবীর ধ্যানসম্মত মূর্তিটি নিম্নরূপ:

“শ্মশানকালী দেবীর গায়ের রং কাজলের মত কালো। তার চোখ দুটি রক্ত পিঙ্গল বর্ণের। চুলগুলি আলুলায়িত, দেহটি শুকনো ও ভয়ঙ্কর, বাঁ হাতে মদ ও মাংসে ভরা পানপাত্র, ডান

হাতে সদ্য কাটা মানুষের মাথা। দেবী হাস্যমুখে মাংস খাচ্ছেন। তাঁর গায়ে নানান রকম অলংকার থাকলেও তিনি উলঙ্গ এবং মদ্যপান করে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। শ্মশানকালীর আরেকটি রূপে তাঁর বা পা টি শিবের বুকে স্থাপিত এবং গলে মুন্ডমালা ও ডান হাতে ধরা খর্গ। মাতৃ মূর্তির এই রূপ দেখে স্বয়ং রামপ্রসাদও তার গানের মধ্যে প্রশ্ন করে বসেছিলেন বসন পর মা অথবা শীত কেন তোর পদতলে, মুন্ডমালা কেন গলে। তন্ত্র সাধকরা মনে করেন শ্মশানে শ্মশান কালী পুজো করলে শীঘ্র সিদ্ধ হওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ত্রী সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বরে শ্মশান কালীর পুজো করেছিলেন। কাপালিকরা শব সাধনার সময় কালীর শ্মশানকালী রূপটির ধ্যান করতেন। সেকালের ডাকাতেরা ডাকাতি করতে যাবার আগে শ্মশান ঘাটে নরবলি দিয়ে শ্মশান কালীর পুজো করত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রাচীন শ্মশানঘাটে এখনো শ্মশানকালীর পুজো হয় তবে গৃহস্থ বাড়িতে বা পাড়ায় সার্বজনীনভাবে শ্মশানকালীর পুজো হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন শ্মশানকালীর ছবিও গৃহস্থের বাড়িতে রাখা উচিত নয়। গুন ও কর্ম অনুসারে শ্রীকালী কালীর আরেক রূপ। অনেকের মতে এই রূপে তিনি দারুক নামক অসুর নাশ করেন। ইনি মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করে তাঁর কণ্ঠের বিষে কৃষ্ণবর্ণা হয়েছেন। শিবের ন্যায় ইনিও ত্রিশূলধারিনী ও সর্পযুক্তা। (তত্ত্ব শাস্ত্রে - মন্ত্রে রূপে কালী: আদি থেকে অধুনা।[৩৫]

উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসে নাগরিক চেতনায় শ্মশানের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিথি ভট্টাচার্য্য তাঁর ‘Deadly space; ghost, histories and colonial anxiety in nineenteen century Bengal’ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, কিভাবে সুখীঘর বা প্রাইভেট স্পেস,

[৩৫] Dr. Abhijit Gangopadhyay, International Research journal of interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS). Vol- iii, issue-ii, March2017, page no 13).

অন্যদিকে শ্মশান ঘাট, পুরনো বাড়ি, ভৌতিক ও অতিপ্রাকৃত স্থানগুলি বিকল্প আত্মচেতনার সন্ধানের স্থান হিসেবে গড়ে উঠছে। এ প্রসঙ্গে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আপন কথা' প্রবন্ধটি আলোচ্য আলোচনায় ব্যবহার করেছেন। আমার গবেষণার সন্দর্ভে শোক নিয়ে আমি বিস্তর আলোচনা করেছি কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের শ্মশানের ইতিহাসে যম ও চণ্ডালদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিষয় নজরে আসে, যে অগ্নিসৎকারের সাথে যুক্ত মানুষদের কি শোক হয় না? ছোটবেলা থেকেই শ্মশানে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এই মানুষগুলো মৃত মানুষের বালিশ, বিছানাকে বা সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেন এবং জিজ্ঞাসা করলে তারা জানান শোক করার সময় কোথায়? মৃত্যুতো অনিবার্য, অর্থাৎ শোকেরও শ্রেণী বিভাগ আছে আর এখানেই সামাজিক ইতিহাসের সামাজিকতার বহুমাত্রিক প্রশ্নের জন্ম নেয়।

৫.৩.১. শোক ও মৃত্যুর পারস্পরিক সম্পর্ক

পরিশেষে বলা যায় শোক কি? শোক কিভাবে মানুষকে ব্যক্তিগত করে তোলে এবং শোকের মধ্যে দিয়ে ভাষার সীমাবদ্ধতা কিভাবে প্রকট হয় ও একটি সমাজ কিভাবে বিকল্পতার সন্ধান করতে বাধ্য হয়। যে বাধ্যতা স্বইচ্ছার। এ প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উঠে আসে, তা হল- শোকের সাথে দেহ ও মনের সম্পর্ক কি? শোক আমাদের ভিতরের মধ্যে যে আমি তাঁর বিপরীতে এক অপর আমিকে বসায়, যার সঙ্গে নিরন্তর কথাবার্তা চলে এবং তা নিজের আমিত্বকেই বৃহৎ করে দেয়। আসলে ফ্রয়েডের মৃত্যু সম্পর্কিত শোকের যে চিন্তা সেখানে ফ্রয়েড মনে করেন শোকের মধ্যে দিয়েই শোকের উত্তরণ সম্ভব।[৩৬] কবি বুদ্ধদেব বসু মনে করতেন যাহাই ব্যক্তিগত তাহাই পবিত্র।[৩৭] এই 'ব্যক্তিগত' ও 'পবিত্রতা' এই দুটি শব্দেরই

---

[৩৬] Jacques Derrida, The work of mourning, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2001, pp 1-2.

[৩৭] আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপেশ চক্রবর্তীর সংলাপ, তবু অনন্ত জাগে, অনুষ্টুপ, ২০২২, পৃষ্ঠা ১২।

সামাজিক ও চলয়মান ঐতিহাসিক চালচিত্র আছে, যা রাষ্ট্র, সমাজ, গোষ্ঠী এবং অপরদিকে এক বিতর্ক ভাবনার প্রতিকল্পের জন্ম দেয়, যেখানে সমূহ নয়, সমূহের শোক নয়, ব্যক্তির যে ব্যক্তিগত মনন সেখানে শোকের এক শারীরবৃত্তীয় পক্রিয়া যার বিমুর্ত প্রকাশ আছে, তার জন্ম হয়। তখন তা ব্যক্তিগত ও পবিত্রতার মধ্যে এক আন্তরিক সহাবস্থান লাভ করে। ভিটগেন্সটাইন এর মতে এখান থেকে ভাষারও জন্ম হয়।[৩৮] শোক সম্পর্কে আলোচনায় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বাধ্যতামূলক ভাবে এসে পড়ে অর্থাৎ বর্ণ হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে ভারতীয় সমাজে যেভাবে মানুষের শোকের সামাজিক ইতিহাস আছে বা শোক বহিঃপ্রকাশের যে ভাষা, প্রতিধ্বনি বা প্রতিনিধিগত সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল যোগাযোগ আছে, তার ফলে শোকের সামাজিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব, যেমন কীর্তন , শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণসভা, স্মৃতিচারণ। কিন্তু এই বক্তব্যের একটি অপর চিত্রও আছে যেমন অতিমারী, মহামন্দা, দূর্ভিক্ষ, গণহত্যা তখন শোক এর পবিত্রতার যে আলঙ্করিক মাত্রা আধুনিক নাগরিক জীবন দেখতে অভ্যস্ত তা এখানে ব্যতিক্রম। এখানে মৃতদেহের বদলে লাশ, শোকের বদলে সংখ্যা, পবিত্রতার বদলে বীভৎসতা ইত্যাদি শব্দগুলি যেন এক একটি বিকল্পের প্রতিনিধি হয়ে তথাকথিত সামাজিক ইতিহাসকে মাত্রাহীন নগ্নতার সামাজিক আয়না হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরে, তখন পাবলিক, প্রাইভেট, ব্যক্তিগত, পবিত্রতা নিয়ে যে বিতর্কগুলি আমরা করি তা যেন অতিরিক্ত পার্থক্যের কারণে চিহ্নিত করণের যে সুবিধা তা প্রায়শই অচিহ্নিত ইতিহাস হিসেবেই রয়ে যায়।

[৩৮] Rupert Read, Can there be a logic of grief? Why Wittgenstein and Merleau Ponty say ‘yes’, Wittgenstein and Phenomology, Routledge, June 2018.

উপসংহার

Imperialism was a sentiment rather than a policy; its foundations were moral rather than intellectual...

D.C. Somervel

ঐতিহাসিকের যে কোন ধরণের সৃজনশীল ক্রিয়াকান্ড বা কারুকৃতি প্রথমে মননে জারিত হয়, পরে প্রয়োগে সিদ্ধি পায়। তবে সৃষ্টির এই দ্বিত্ব প্রক্রিয়াতে মাঝে মাঝে চুতি বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। ইতিহাসের মধ্যের 'তথ্যের' বর্গটিকে 'অর্থের' (meaning) বর্গে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোন না কোন আদিকল্পের প্রতি এক নিষ্ঠায় ও অভ্যাসের অনুজ্ঞায় আমরা এক ছকে পরে যাই। বিষয় প্রাচুর্য বা তথ্যের সমাবেশে ছকের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে কিন্তু বৃত্তের ধরাবাঁধা বেষ্টনীর বাইরে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। ঔপনিবেশিক ইতিহাসের আদিকল্পের প্রস্থানের বাইরে গিয়ে মৃত্যু, শোক, দুঃখ প্রভৃতি অনুভুতিগুলিকে বুঝতে হবে। জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতা, সামাজিকতা ও ঐতিহাসিকতার মতো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মতবাদ গুলিকে কোন এক আদি অকৃত্রিম আর্কাইভস্-এর অটুট বৃত্তান্তে বোঝা বা অতলান্তে পৌঁছানো অপ্রত্যাশিত ও সম্ভব নয়। ছড়ানো ছিটনো 'অর্থ' (meaning) বর্গের এক্তিয়ারে এনে অনেক গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনুষঙ্গতা লাভ করতে পারে, এখানে ইতিহাস ও সামাজিকতা অন্তরঙ্গতা পায়। শোক ও মৃত্যুর ইতিহাস এক বৃহৎ সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্দর্শনকে নির্দেশিত ও প্রাগভিজ্ঞতায় বৃত্তায়িত করে চিন্তার গোলকায়ন ঘটায়। উপনিবেশবাদের মরণসত্ত্বার কুমতির বিরুদ্ধে মৃত্যুর শোক দুঃখ প্রভৃতি বর্গগুলি কখনো

শাসিত মানুষের কখনো জ্ঞানের মাধ্যম বা প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। মৃত্যু শোক দুঃখ ভারতীয় ব্যক্তিক ও সমষ্টিগত মননের অঙ্গহীন চেতনার স্পর্শ 'ছোট আমিকে' 'বড় আমির' কাছে তুলে দেয়। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার যুক্তিভূমি ও কল্পভূমির সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে শোকের রাজনীতি বিপ্লবীদের মৃত্যুবরণ ঔপনিবেশিক শাসকের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা কে চিহ্নিত করে তার মধ্যে দিয়ে সামাজিক ইতিহাসের দুটি বর্গ সমানুভূতি ও সহানুভূতির জন্ম দেয়। উন্নিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের ঈপ্সাতে বৌদ্ধ করুণা, হিন্দু দয়া, খ্রিস্টানের কল্যাণকর দিকটি কখনো উপেক্ষা বা অপেক্ষার ছায়া অস্পষ্ট উত্তরের আধুনিক চেতনার কামনার অনুষঙ্গ লাভের অপেক্ষারত। হয়তো মৃত্যু শোক যাপনের ইতিহাসই বর্তমানের শরীরের মধ্যে দিয়ে অতীতের অপেক্ষারত চেতনারই বিশেষ বাসনার ফল।

ঔপনিবেশিক ভারতে ও বাংলার সামাজিক রাজনীতি ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মৃত্যুর চিন্তা চেতনার ইতিহাস গবেষণার প্রধান মল্লভূমিতে লেখা হয়নি। এখানে একটি বিষয় জোর দিয়ে বলতে চাই মৃত্যু কী? মৃত্যুর পর কী হয়? মৃতদেহ ও তার সৎকার পদ্ধতি প্রভৃতি প্রশ্নগুলোকে নিয়ে যত না ঐতিহাসিকদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে বিভিন্ন বর্গের ধর্মীয় গুরু ও জ্যোতিষ শাস্ত্র ও তান্ত্রিকদের মধ্যে। যার ফলে এটিও একটি গবেষণার মূল ও মৌলিক প্রশ্ন হতে পারে কেন মূল ও জনপ্রিয় ঐতিহাসিকরা উনিশ শতকের বা তারও আগে পরে সাধারণভাবে মৃত্যু নিয়ে জনপ্রিয় বা বলা যেতে পারে সাধারণ ইতিহাসের গল্পে 'মৃত্যু' প্রকাশ পেল না। কিন্তু পশ্চিমী দেশের বিষয়টা এক্ষেত্রে অন্যান্য বা ব্যতিক্রম। আঠারো শতকের আলোকায়নের ফলে প্রকৃতি থেকে এক ধরনের বিচ্যুতির ফলে মানুষের দেহ, স্বাস্থ্য ও বৃহৎ জীবনের সার্বিক মানসিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে মৃত্যুর বিষয় হিসেবে তাদের ধর্ম, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসে গভীর আস্থা তৈরি করেছিল।

ফিলিপ অ্যারিস (Philippe Aries) তাঁর ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত *Western Attitudes Toward Death from the middle ages to the present* নামক বিখ্যাত বইটি আমার গবেষণার প্রকল্পে অত্যন্ত মূল্যবান ও সক্রিয়ভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল। যদিও তিনি ভারতীয় এবং বাংলার মৃত্যু চিন্তা নিয়ে কিছু বলেননি কিন্তু তার একশো এগারো পাতার গ্রন্থ পাঠ করার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলাম চেতনা, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা, প্রভৃতি অনুভূতির বর্গগুলি কিভাবে ইতিহাস ও সাহিত্যের ফুটপাত বদল করে এবং তা দ্বিমাত্রিকভাবে সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে চেতনার আদান প্রদান সম্পন্ন করে। কারণ কোন মৌলিক প্রশ্ন বা যদিও প্রশ্ন মৌলিক নাও হয় একটিই প্রশ্ন বহু শতক ধরে তার ওপর অনুসন্ধিৎসা, শেষ কোথায়? জানি না, বাক্যগুলি প্রশ্নের ভিতর প্রশ্ন তৈরি করে ও তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে বা জট ছাড়াতে গিয়ে আরো জটিল হয়ে ওঠে। ফিলিপ অ্যারিস আলোচনা করেছেন সপ্তদশ শতকের আগে মানুষ তাদের নিজেদের আসন্ন মৃত্যুর সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিং বান, তৃষ্টান, ল্যানসেলোট চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখান 'তাদের সময় এসেছে,' জেনে মৃত্যুর জন্য তাদের প্রস্তুত করে তোলা হচ্ছে। একইরকম ভাবে হিন্দু সমাজে গঙ্গাযাত্রার মত যেখানে মুমূর্ষ রোগীকে গঙ্গার ধারে এনে রাখা হত ও প্রস্তুত করে তোলা হত আসন্ন মৃত্যুর জন্য।

এখন আমার সময় হল,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।।
হল দেখা, হল মেলা, আলোছায়ায় হল খেলা –
স্বপন যে সে ভোলো ভোলো।।
আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।

ওগো সুদূর, ওগো মধুর, পথ বলে দাও পরানবধুর-

সব আবরণ তোলো তোলো।।

(পূজা পর্যায়: ১৯২৩, স্থান: শান্তিনিকেতন, নোটেশন: দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ফিলিপ অ্যারিস ও তাঁর ঐতিহাসিকতা আমার গবেষণার প্রশ্নের অনেকটা জট খুলতে সাহায্য করেছে। তাঁর গবেষণার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল মৃত্যুকে মানুষ কেন ভয় পায়? এই প্রশ্নটি উনি প্রথাগত ইতিহাসচর্চার খাঁচার বাইরে গিয়ে করতে চেয়েছেন। উনি দেখিয়েছেন সপ্তদশ শতকের আগে মৃত্যুভয় দূর করবার বা শোকাহত না হবার এক ধরনের সংস্কৃতি ছিল কিন্তু উনবিংশ শতকে মানুষ মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে গিয়ে মৃত্যুকেই জীবনের শত্রু বলে মনে করল। তার গবেষণায় ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শনের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আঠারো শতকের আলোকায়ন ও পরবর্তীকালে শিল্প সমাজের মধ্যে জীবনের যে ধারাক্রম সেখানে মৃত্যুর যে স্থান তা নিয়ে তাঁর গবেষণার বিশেষ আলোচনা লক্ষ্য করা গেল না। সেজন্যই সময়ের সাথে সাথেই তাঁর গবেষণার সীমাবদ্ধতাকে আমার গবেষণায় নতুন করে দেখতে চাইলাম। পরবর্তী পর্যায়ে যার গবেষণা অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল, তিনি হলেন ঐতিহাসিক Jonathan p. Parry. তার *Death in Benaras* বইটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। জনাথন প্যারি সহজভাবে অথচ দাবার চালের মত অধ্যায় বিন্যাসে নাতি দীর্ঘ আলোচনায় ধর্মীয় ঢঙে ইতিহাসের প্রতিকল্পকে বারে বারে আঘাত করেছেন। গবেষণার প্রথমদিকে একদিকে অ্যারিস অন্যদিকে জনাথান প্যারীর গবেষণা আমায় মৃত্যু সম্পর্কেও চিন্তাভাবনাকে সাময়িকতার বৃত্ত থেকে চিরস্থায়ী বৃত্তের দিকে নিয়ে গেছে। মৃত্যুর সঙ্গে স্থানের কি সম্পর্ক? এই প্রশ্নটাকে তিনি বিভিন্ন বর্গে আলোচনা করেছেন। মৃত্যুর পরবর্তী যে সংস্কৃতি তার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন

প্রকল্পগুলি উঠে আসে, যেমন সৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের বর্গীয় শ্রেণী চেতনার একটি আভাস পাওয়া যায়। আবার একই সঙ্গে তীর্থস্থানগুলির মাধ্যমে একটি ধর্মীয় সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যায় আধ্যাত্মিক চেতনা কিভাবে ধর্মীয় চেতনাকে প্রভাবিত করছে। জোনাথন প্যারী পরবর্তীকালের আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যৌথ সম্পাদনায় সেখানে Maurice Bloch and Jonathan parry তাঁদের *Death and the regeneration of life* গ্রন্থে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আচার ও পুনর্জন্মের প্রতীকগুলির তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করেছেন।

সুইস নৃবিজ্ঞানী বাচো ফেন পর্যবেক্ষণ করেন যে উর্বরতা এবং যৌনতার ধারণা প্রায়ই অন্তোষ্টিক্রিয়া অনুশীলনের সাথে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ আদিম সমাজের যৌনতার ধারণা ও মৃত্যুচেতনা বা মৃত্যু গ্রহণ করার যে সংস্কৃতি তার সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। বাচো ফেন প্রধানত গ্রীক ও রোমান প্রতীকবাদের সাথে মৃত্যু চিন্তার কি সম্পর্ক ছিল সেটাই ছিল তাঁর গবেষণার মূল বিষয়। অনুরূপভাবে হিন্দু ধর্মেও তন্ত্রশাস্ত্রে মৃতদেহ সৎকার রীতি ও সংস্কৃতিতে নারীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার যে পৃথিবীর সব আদি সংস্কৃতিরই একটা কাঠামোগত মিল লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত 'মৃত্যু কি?' এই প্রশ্নটি যখন সম্বন্ধ যুক্ত তখন। David Arnold এর *Burning the Dead* গ্রন্থে মৃত্যু, হিন্দু সৎকার রীতি, জাতপাত ব্যবস্থার সাথে হিন্দু সৎকার রীতির সম্পর্ক ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ তা আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে একটা সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়, তা হল ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে যে এক ধরনের ‘আমাদের আধুনিকতা’ ছিল যেখানে মৃত্যু ও তার শোক, দুঃখ, করুণা, দয়া, অনুসঙ্গের সাথে যে এক প্রাচ্য আধুনিকতা ছিল তার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি তাঁর গ্রন্থে। ডেভিড আর্নল্ড ভারতীয় ঐতিহাসিকতার মধ্যে যে এক ধরনের আধ্যাত্মিকতা নিহিত আছে তাকে অনুধাবন করতে তিনি ব্যর্থ না হলেও

সক্ষম নন। ফলত এখানে রনজিৎ গুহর ঐতিহাসিকতার বোধ ও আধুনিকতার যে সন্ধান তিনি সাবলটার্ণ স্টাডিজের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তা আমার গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

ক) মুখ্য উপাদান

ইংরেজি গ্রন্থাবলী

1. Rebay-Salisbury, Katharina, Inhumation and cremation: how burial practices are linked to beliefs, Embodied Knowledge, 2012.
2. Sørensen, Tim Flohr and Bille, Mikkel, Flames of transformation: the role of fire in cremation practices, World Archaeology, 2008, vol. 40, no. 2.
3. Erichsen, Hugo, The cremation of dead, from aesthetic, sanitary, religious, historical, medical, and economical standpoint, Detroit, Do. Haynes, 1887.
4. Arnold, David, Burning issues: Cremation and incineration in Modern India, NTM, 2016 Dec, vol. 24, no. 4.
5. Klein, Ira, Imperialism, Ecology and Disease: Cholera in India, 1850-1950, The Indian Economic and Social History Review, 1994, vol. 31, no. 4.
6. Klein, Ira, Death in India, 1871-1921, Journal of Asian Studies, vol. XXXII, no. 4.

বাংলা নথিপত্র

১। ত্রিবেণী মহাশ্মশানের দেওয়াল চিত্র ও বিভিন্ন চিত্রে শ্মশান

রিপোর্ট

1. Indian Sanitary Proceedings, 1919, vol 10588.
2. Census of India 1921, I, Part I.
3. The Calcutta Municipal Report, “Report on Public Health”.
4. Indian Medical Proceedings, 1873-1875.
5. First Annual Report of the Sanitary Commission for Bengal 1864-1865. Calcutta Military Orphan press.

খ) গৌণ উপাদান

ইংরেজি গ্রন্থাবলী

1. Eassie, William, *Cremation of the dead, its history and bearings upon public health*, C.E., London, Smith, Elder & Co., 15 Waterloo place, 1875.
2. Bachelard, G, *The Psychoanalysis of Fire, Boston*, MA: Beacon Press, 1968.
3. Arnold, David, *Plague: Assault on the Body, in Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-century India*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1993.
4. Samanta, Arabinda, *Living with epidemics in colonial Bengal 1818-1945*, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2018.
5. Hays, JN, *Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History*, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2005.
6. Harrison, Mark, *A dreadful scourge: cholera in early nineteenth-century India*, Modern Asian Studies, vol. 54, no. 2.

7. Sarkar, Mahua, *The Gasping City: An Environmental History Of Calcutta (1817-1923)*,
8. Sen, Amartya, *Home in the World: A Memoir*, Penguin UK, 2021.
9. Sen, Amartya, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Oxford University Press, Chapter 1st Pp 1-8, 6th pp 52-85.
10. Ackerknecht, E. H. (1969) Death in the history of medicine, Bulletin of the *History of Medicine* 42(Jan–Feb)
11. Ackerman, R. (1987) *J. G. Frazer: His life and work*, Cambridge University Press, Cambridge.
12. Addy, J. (1992) *Death, Money and the Vultures: Inheritance and avarice*, 1660–1750. Routledge, London.
13. Agamben, G. (1998) *Homo Sacer: Sovereign power and bare life*, Trans. D. Heller-Roazen, Stanford University Press, Stanford, Calif.
14. Aker, F. & Cecil, J. C. (1983) *The influence of disease upon European history*, Military History 148(5): 441–6.
15. Allen, J. R. (1984) Epidemiology United States,
In Ebbersen, P., Biggar, R. J. & Melbye, M. (eds) *AIDS: A basic guide for clinicians*, Muuksgaard, Copenhagen, 15–28.
16. Anabwani, G. & Navario, P. (2005) *Nutrition and HIV/AIDS in sub-Saharan Africa: An overview*, Nutrition 21: 96–9.
17. Anonymous (2004) *Editors: Suicide huge but preventable public health problem says WHO*, Indian Journal of Medical Sciences Trust 58(9): 409–11.
18. Aries, P. (1974) *Western Attitudes toward Death*, Johns Hopkins University Press, London.
19. Aries, P. (1981) The Hour of our Death. Penguin, Harmondsworth.
20. Bahn, P. G. (1997) Dancing in the dark: Probing the phenomenon of Pleistocene cave art. In Bonsall, C. & Tolan-Smith, C. (eds) (1997) *The*

Human Use of Caves. BAR International Series 667, Archaeopress, Oxford.

21. Ballhatchet, K. & Harrison, J. (1980) *The City in South Asia: Pre-modern and modern*, Curzon Press, London.
22. Batchelor, J. & Chant, C. (1990) *Flight: The history of aviation*, Mallard Press, New York.
23. Bauman, Z. (1992) Mortality, *Immortality and Other Life Strategies*, Polity Press, Cambridge.
24. Beck, U. (1992) *Risk Society: Towards a new modernity*, Sage, London.
25. Becker, E. (1972) *The Birth and Death of Meaning*, Penguin, Harmondsworth.
26. Bensman, J. & Vidich, A. J. (1995) The new class system and its lifestyles. In Vidich, A. J. (ed.) *The New Middle Classes: Lifestyles, status claims and political orientations*, New York University Press, New York.
27. Berger, A., Badham, P., Kutscher, A. H., Berger, J., Perry, M. & Beloff, J. (eds) (1989) *Perspectives on Death and Dying: Cross-cultural and multidisciplinary views*, Charles Press, Philadelphia.
28. Berta, P. (2001) Two faces of the culture of death: relationship between grief work and Hungarian peasant soul beliefs, *Journal of Loss and Trauma* 6: 83–113
29. Bloch, M. (1988) Death and the concept of a person. In Cederroth, S., Corlin, C. & Lindstrom, J. (eds) *On the meaning of death: Essays on mortuary rituals and eschatological beliefs*, Almqvist & Wiksell International, Uppsala
30. Bloch, M. (1992) *Prey into Hunter: The politics of religious experience*, Cambridge University Press, Cambridge.

31.Bloch, M. & Parry, J. (eds) (1982) *Death and the Regeneration of Life*, Cambridge University Press, Cambridge.
32. Bradbury, M. (1996) Representation of ‘good’ and ‘bad’ death among death workers and the bereaved. In Howarth, G. & Jupp, P. C. (eds) *Contemporary Issues in the Sociology of Death, Dying and Disposal*, Macmillan, London.
33. Brock, D. B. & Foley, D. J. (1998) Demography and epidemiology of dying in the US with emphasis on deaths of older persons. In Harrold, J. K. & Lynn, J. (eds) *A Good Dying: Shaping health care for the last months of life*, Haworth Press, New York.
34. Brown, N. O. (1959) *Life against Death: The psychoanalytic meaning of history,* Routledge & Kegan Paul, London.
35. Bruce, S. (2002) *God is Dead: Secularization in the West*, Blackwell, Oxford.
36. In Nettleton, S. & Watson, J. (eds) *The Body in Everyday Life*, London, Routledge.
37.Cannadine, D. (1981) War and death, grief and mourning in modern Britain. In Whaley, J. (ed.) *Mirrors of Mortality: Studies in the social history of death*, Europa Publications, London.
38.Cohen, D. (1998) *The Wealth of the World and the Poverty of Nations*, MIT Press, Cambridge.
39.Corfield, P. J. (1995) *Power and the Professions in Britain 1700–1850*, Routledge, London.
40.Couliano, I. P. (1991) *Out of this World: Otherworld journeys from Gilgamesh to Albert Einstein*, Shambhala, London.
41.Counts, D. R. (1976) *The good death in Kaliai: Preparations for death in Western New Britain*, Omega.
42.Counts, D. A. & Counts, D. (2004) The good, the bad, and the unresolved death in Kaliai, *Social Science and Medicine* 58(5): 887–97.

43. Dansky, S. F. (1994) *Now Dare Everything: HIV-related psychotherapy*, Haworth Press, New York.

44. Davies, D. J. (1997) Death, Ritual and Belief. Cassell, London.

45. DelVeccheio Good, M.-J., Gadmer, N. M., Ruopp, P., Lakoma, M., Sullivan, A. M., Redinbaugh, E., Arnold, R. M. & Block, D. (2004) Narrative nuances on good and bad deaths: internists' tales from high-technology work places, *Social Science and Medicine* 58(5): 939–53.

46. DeSpelder, L. A. & Strickland, A. (2005) *The Last Dance: Encountering death and dying*, McGraw-Hill, New York.

47. Diamond, J. (1997) *Guns, Germs and Steel: The fates of human societies*, Jonathan Cape, London.

48. Durkheim, E. (1965) *The Elementary Forms of the Religious Life*, Free Press, New York.

49. Elias, N. (1985) *The Loneliness of Dying. Basil Blackwell*, Oxford.

50. Field, D. (1998) Palliative care for all? In Field, D. & Taylor, S. (eds) *Sociological Perspectives on Health, Illness and Health Care*, Blackwell Science, Oxford.

51. Fox, M. (2003) *Religion, Spirituality and the Near-death Experience*, Routledge, London.

52. Frazer, J. G. (1913b) *The Belief in Immortality and the Worship of the Dead*, vol. 2. Dawsons of Pall Mall, London.

53. Freud, S. (1927) *The Future of an Illusion*, Hogarth Press, London.

54. Freud, S. (1930) *Civilization and its Discontents*, Hogarth Press, London.

55. Ghosh, A. (1973) *The City in Early Historical India*, Indian Institute of Advanced Study, Simla, New Delhi.

56. Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1965) *Awareness of Dying*, Aldine, New York.

57.Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1968) *Time for Dying*, Aldine, Chicago.

58.Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1976) The ritual drama of mutual pretence, In Schneidman, E. S. (ed.) *Death: Current perspectives*, Mayfield, Palo Alto, Calif.

59.Goody, J. (1962) *Death, Property and the Ancestors*, Stanford University Press, Stanford, Calif.

60.Gottlieb, B. (1993) *The Family in the Western World from the Black Death to the Industrial Age*, Oxford University Press, New York.

61.Gubrium, J. F. (1975) *Living and Dying at Murray Manor*, St Martin's Press, New York.

62.Harlen, W. R. & Manoli, T. A. (1992) Coronary heart disease in the elderly. In Marmot, M. & Elliot, P. (eds) *Coronary Heart Disease Epidemiology*, Oxford University Press, Oxford, 114–26.

63.Hayes, J. N. (1998) *The Burdens of Disease: Epidemics and human response in Western history*, Rutgers University Press, New Brunswick, N. J.

64.Hopkins, D. R. (1983) *The Greatest Killer: Smallpox in history*, University of Chicago Press, Chicago.

65.Houlbrooke, R. (1998) *Death, Religion and the Family in England, 1480–1750*, Clarendon Press, Oxford.

66.Hybels, C. F. & Blazer, D. G. (2003) *Epidemiology of late-life mental disorders*, Clinics in Geriatric Medicine 19: 663–96.

67.Illich, I. (1976) *Limits to Medicine – Medical Nemesis: The expropriation of health*, Marion Boyars, London.

68.Inglis, B. (1981) *The Diseases of Civilization: Why we need a new approach to medical treatment*, Paladin, New York.

69.Jalland, P. (1996) *Death in the Victorian Family*, Oxford University Press, Oxford.

70.Kellehear, A. (1996) *Experiences Near Death: Beyond medicine and religion*, Oxford University Press, New York.

71.Kozlofsky, C. M. (2000) *The Reformation of the Dead: Death and ritual in early modern Germany*, 1450–1700. Macmillan, London.

72.Lancaster, H. O. (1990) *Expectations of Life: A study in the demography, statistics and history of world mortality*, Springer-Verlag, New York.

73. Landes, D. (1998) *The Wealth and Poverty of Nations. Abacus*, London.

74.Liddell, C., Barrett, L. & Bydawell, M. (2005) Indigenous representations of illness and AIDS in sub-Sahara Africa, *Social Science and Medicine* 60: 691–700.

75. MacKinley, E. (2005) Death and spirituality. In Johnson, M. L. (ed.) *The Cambridge Handbook of Age and Ageing*, Cambridge University Press, Cambridge, 394–400.

76. McManners, J. (1985) *Death and the Enlightenment*, Oxford University Press, Oxford.

77.McNeill, W. H. (1978) Disease in history, *Social Science and Medicine* 12(2): 79–81.

78.Makinen, I. H. (2002) *Suicide in the new millennium: some sociological considerations*, Crisis: Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention 23(2): 91–2.

79.Malinowski, B. (1948) *Magic, Science and Religion*, Souvenir Press, London.

80.Manchester, K. (1984) *Tuberculosis and leprosy in antiquity: an interpretation*, Medical History 28: 162–73.

81.Mann, M. (2005) *The Dark Side of Democracy: Explaining ethnic cleansing*, Cambridge University Press, Cambridge.

82.Merton, R. (1957) *Social Theory and Social Structure*, Free Press, Glencoe.

83. Morris, R. J. (2005) Men, *Women and Property in England, 1770–1870: A social and economic history of family strategies amongst the Leeds middle classes*, Cambridge University Press, Cambridge.
84. Nietzsche, F. (1999) *Thus Spake Zarathustra. Trans*. T. Common. Dover Publications, Mineola, N. Y.
85. Obayashi, H. (ed.) (1992) *Death and Afterlife: Perspectives of world religions*, Praeger, New York.
86. Pennington, R. L. (1996) Causes of early human population growth. *American Journal of Physical Anthropology* 99: 259–74.
87. Prioreschi, P. (1990) *A History of Human Responses to Death: Mythologies, rituals and ethics*, Edwin Mellon Press, New York.
88. Robertson, R. (1990) Mapping the global condition: Globalization as the central concept. In Featherstone, M. (ed.) *Global Culture: Nationalism, globalization and modernity*, Sage, London
89. Sandman, L. (2005) *A Good Death: On the value of death and dying*, Open University Press, Maidenhead, Berkshire, UK.
90. Seale, C. (1995) *Heroic death*, Sociology 29(4): 597–613.
91. Slack, P. (1988) *Responses to plague in early modern Europe: The implications of public health*, Social Research 55(3): 433–53.
92. Strange, J. M. (2005) *Death, Grief and Poverty in Britain, 1870–1914*, Cambridge University Press, Cambridge.
93. Turner, C. G. & Turner, J. A. (1999) *Man corn: Cannibalism and violence in the prehistoric American Southwest*, University of Utah Press, Salt Lake City, Utah.
94. UN-Habitat (ed.) (2004) State of the World's Cities 2004/05: *Globalization and urban culture*, UN-Habitat, Nairobi.
95. Waite, G. (1987) Public health in pre-colonial East-Central Africa, *Social Science and Medicine* 24(3): 197–208.
96. Walter, T. (1994) *The Revival of Death*, Routledge, London.

97.Walter, T. (1996) *The Eclipse of Eternity: A sociology of the afterlife*, Macmillan, London.
98.Watts, S. (2003) *Disease and Medicine in World History*, Routledge, New York.
99.Whiting, R. (1989) *The Blind Devotion of the People: Popular religion and the English Reformation*, Cambridge University Press, Cambridge.
100. Young, M. & Cullen, L. (1996) *A Good Death: Conversations with East Londoners*, Routledge, London.

বাংলা গ্রন্থাবলী

১. রাহা, জয়তী, *দাহ পুরানের বিবর্ণ অতীত বইছে শহরে*, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, শনিবার ২০১৯ ১০ আগস্ট।
২. 'বায়ুর সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ', http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/jspui/bitstream/10689/17392/5/Chapter%202_51-98p.pdf, পৃ: ৫৬-৫৭।
৩. সরকার, মহুয়া, 'উনিশ শতকের বাংলার জীবন ও জীবনচর্চা', মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান,* খণ্ড ২৬, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।
৪. দত্ত, শ্রী বিভুভুষন (সম্পাদিত), *ভারত সাধনা,* দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩৭ কার্ত্তিক প্রথম সংখ্যা।
৫. সেন, বিনায়ক, *সাহিত্য, অতিমারি ও সমাজ,* বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১৪২৭, খণ্ড ৩৮, বার্ষিক সংখ্যা।
৬. সেন, যতীন্দ্র কুমার, 'একটি বিগত স্মৃতি', *দেশ,* ২০২১ ১৭ই জুন।

রিপোর্ট

1. Indian official Records (British Library London, Bengal Judicial (Jails), nos. 2-4, 1815 11 August.